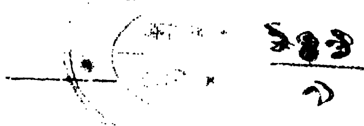
কুশদহ

সচিত্র মাসিক পত্র

াস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-সম্পাদিত



১৩২৪ সাল

নবম বর্ষ

কার্য্যালয়—২৮।১ শুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২৪ সালের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী

(লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)।

লেখক বা লেখিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ১৪১।৭
শ্রেণী সং

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার
সদ্ভাবসঞ্চার　　চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৪ { প্রথম সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

হে দীনশরণ—অধমতারণ দয়াল পিতা! আজ প্রারম্ভ দিনে প্রাণের সেই গভীর প্রার্থনা—দেশের কল্যাণ-বিধান এবং সর্ব্বকামনার সিদ্ধি একমাত্র তোমারই চরণে ভিক্ষা করি। তুমিই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

বন্ধুরা বলেন—"কুশদহ" পরিচালনায় সম্পাদকের আশ্চর্য্য শক্তি! কিরূপে যে কাজ চলে বুঝা যায় না। প্রভু, বড় দুঃখ হয়—বন্ধুগণ মানুষের কি শক্তি দেখেন, কেন তোমার হাত দেখেন না। হীনমতি মানুষকে তুমি তোমার স্পর্শ দিয়ে "নবজীবন" দান কর। যুগে যুগে তোমার এই কাজ। এ মলিন জীবনে তোমার স্পর্শ দিলে নবজীবন পেলে কি হয়—নবজীবন পাওয়া ব্যাপারটা কি, তাই দেশবাসীকে বলবার জন্য—এ অধমকে 'দাসত্ব' ব্রত দিয়ে ক্রমাগত শক্তি দিয়ে এ জীবন চালাচ্ছ। পত্রিকা প্রচার, ইহাও তাহার একটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু প্রভু আমি তোমার এমনই অযোগ্য দাস যে, নবজীবন পাওয়ার কথা বুঝি কাউকে বুঝাতে পারলাম না—বিশ্বাস করাতেও পারলাম না। নবজীবন পেলে কি হয় তা যাঁরা দেখচেন, তাঁরাও আসল কথাটা বুঝচেন না কেন! এ কি প্রহেলিকা! কিন্তু আশা তো ছাড়তে পারচি না. যতদিন যাচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষা ততো আরো প্রবল হয়ে উঠচে। দেখ প্রভু, ঘরে ঘরে কত দুঃখ অশান্তি—কত পাপাসক্তি—কত মোহের প্রাদুর্ভাব চলেছে। কেন মানুষ তোমাকে পাবার জন্য—নবজীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হচ্চে না। দয়াময়! এই দেখতে দেখতে কি এ জীবন শেষ হবে? তুমি যে প্রভু. আশা দিয়ে ঘরের বার করেছ তোমার দ্বারের ভিকিরি করেছ। তোমার কথা কি মিথ্যা হবে? না প্রভু, তাতো কখনো হবে না, তবে তোমারই নামের দোহাই দিয়ে বলি প্রভু, দেখাও বন্ধুদের জীবনে নবজীবনের সূচনা দেখাও। দাসের ক্ষীণ ভগ্নকণ্ঠে শক্তি দিয়ে বলাও—আর দেখাও নবজীবন পেলে মানুষের কি শক্তি পাওয়া হয়! ভক্তি-বিনম্র অন্তরে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

নববর্ষে

—*—

এক দল লোক বলেন, "জগতে নূতন কিছু নাই, সবই পুরাতন।" আর একদল বলেন, "সবই নূতন, পুরাতন লইয়া একদিনও চলে না। জগতে নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা নিত্য নূতন ভাবে জগতের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানের তুল্য চিরপুরাতন আর কিছুই নাই; লক্ষ-কোটী যুগ পূর্ব্বে তিনি যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন—ইহা অভ্রান্ত সত্য। তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, কোন প্রকারে তাঁহার উন্নতি সাধন করিতে হয় না, পূর্ণ—চিরপূর্ণ। কিন্তু জগতে—জীবে তাঁহার প্রকাশ নিত্য নূতন। ইহার উত্তরেও একদল বলেন "তিনি নিত্য ভাবে—পূর্ণরূপে প্রকাশিত অছেন। অল্পজ্ঞানী তাহা না জানিয়া তাঁহার খণ্ড প্রকাশ দেখে; ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ যোগী সিদ্ধগণ তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র দর্শন করেন। পূর্ণভাবে দর্শন করার নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান,' খণ্ড-জ্ঞান অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র।"

এ বিষয় বিস্তৃত মীমাংসার জন্ত এ প্রবন্ধ নহে। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানীগণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে—তাঁহাকে পূর্ণ ভাবেই ভাবিয়া থাকেন, যাহাতে কোন প্রকার অপূর্ণতা আছে এরূপ কল্পনাও করা চলে না। ফলত দেখা যাইতেছে এক কালের বা এক যুগের সাধকগণ—জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আদর্শ প্রকাশ করেন, পরযুগের সাধকগণ তাহার ক্রমবিকাশ রূপে ব্রহ্ম স্বরূপের আরো পূর্ণতা দর্শন করেন। উপনিষদ ও পুরাণ তাহার সাক্ষী। উপনিষদের ঋষি, ব্রহ্মের নিত্য অনন্ত এবং অখণ্ড অদ্বিতীয় ভাব যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মের লীলাভাব, পতিতপাবন ভাব-জগত-পালনী ভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই—যাহা পুরাণে ফুটিয়াছিল। একথা খুব তর্কের কথা নহে,— ঐ সকল শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। অবশ্য পুরাণের মূলসূত্র সকল উপনিষদে ছিল। আবার সেই পৌরাণিক ধর্ম্ম উপনিষদোক্ত উজ্জ্বল জ্ঞানের আদর্শ ছাড়িয়া কল্পনা এবং ভাবুকতার স্রোতে পড়িয়া ভ্রান্তি কুসংস্কারে জড়িত হইয়া উপধর্ম্মে পরিণত হইল। সে ভ্রান্তি বর্ত্তমান সময়ের সাধকগণ বুঝিতে পারিয়া আবার নূতন করিয়া ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এখন দেখা গেল যে, জ্ঞানী মহাপুরুষগণও অনন্ত ব্রহ্মের ভাব উপলব্ধি করিয়া

যাহা প্রকাশ করিয়া যান, তাহা অনন্তের এক পৃষ্ঠা। অপর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে ভিন্ন যুগ ভিন্ন সাধকদলের প্রয়োজন হয়, ইহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশেই হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবের নিকট ব্রহ্মের প্রকাশ নিত্য নূতন। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ সকল মানুষই কি দেখিতেছে? অন্তত ভগবানের প্রকাশ দেখা যায়, বুঝা যায়, একথা কি সকলেই স্বীকার করেন—বিশ্বাস করেন? অবিশ্বাস অন্ধতা যে মানুষের মধ্যে সে দৃষ্টি ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

এ দৃষ্টিহীনতা মানুষে কোথা হইতে আসিল? কথাটা আরো একটু সহজ করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করা যাক্। আমরা দুই চক্ষে জগতে কি দেখি! এবং তাহা দেখিয়া কি বুঝি? দেখি, নানা বিচিত্র দৃশ্য, বুঝি বস্তুর স্বভাব বা গুণ। শিশু জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পরম্পরাগত ভাবে বস্তুর জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয়বোধের আরম্ভ হইতে বস্তুর নাম শুনিয়া ও তাহার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা হয়। অথচ তখন হইতেই বস্তুর নির্ম্মাতাকে দেখিতে বা ভাবিতে অভ্যাস হয় না, সে শিক্ষা সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পরে স্বতন্ত্র ভাবে আরম্ভ করিতে হয়।

সৃষ্টিতে স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাও শিক্ষাসাপেক্ষ, সে জ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত স্থান পরিবার। বিশ্বাসী পরিবারে বিশ্বাসী সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হায়, আজ সকল পরিবারই সে আদর্শে উদাসীন! কেবল অন্ন-চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত। ধর্ম্ম-ক্ষুধা নির্ব্বাপিতপ্রায়—সে অন্নে কাহারও রুচি নাই। পরিবারের সন্তানগণ যে অন্নসংস্থান-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই জীবন শেষ করে। অন্ন-সংস্থানের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, সমস্ত সময়টা সেই ভাবে নিয়োগ করিলে ঈশ্বরবিশ্বাস লাভের সুযোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন বড় কঠিন হয় ঈশ্বর বিশ্বাস এবং নীতি জ্ঞান লাভ করা। বর্ত্তমান সমাজে সেই অবস্থা পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত।

তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই প্রকৃত পক্ষে মানব-জীবন। অজ্ঞান জীবনে ও পশু জীবনে অল্পই প্রভেদ। তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবানকে না পাইলে জীবনও বৃথা মরণও বৃথা। বাল্য জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বীজ উপ্ত হইলে, সমস্ত শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মভাব স্ফূর্ত্তি পায়। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ, পরমতত্ত্ব; পরমতত্ত্ব মধ্যেই স্রষ্টা, সৃষ্টি, জীব, জীবের কার্য্য এবং গতি এ সমস্ত তত্ত্বই নিহিত। ইহার অপর নাম পরমার্থ জ্ঞান। পরমার্থ

জ্ঞানের মূল ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বরবিশ্বাস এবং নীতি-জ্ঞান কেবল জ্ঞানের বিষয় হইলে চলে না, জ্ঞানানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে হয়। আনুষ্ঠানিক শক্তি লাভের জন্য ভাব ভক্তির প্রয়োজন, ভাব, ভক্তি, সাধন দ্বারা লাভ করিতে হয়। সাধনে প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হয়। সে জ্ঞানের একটি সাঙ্কেতিক নাম "দিব্য দৃষ্টি" সে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয় ভগবৎ প্রকাশ-দর্শনে; সে প্রকাশ তাঁহার কৃপাতেই দর্শন হয়। তখন সাধকের নিকট নূতন পুরাতনের কোন বিতর্ক থাকে না। ভগবানের প্রকাশ যে কি চিরনূতন, তখন সাধক তাহা বুঝিতে পারেন।

নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহায় নব নব ভাব, নব নব সৌন্দর্য্য অনুভব করেন, আবার বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবও লাভ করেন।

আজ নববর্ষ একটি সেই দিন। মহাপাপীও একদিন ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া 'নবজীবন' লাভ করে,—নূতন মানুষ হইয়া যায়। আবার বিশ্বাসী সাধকগণ তাঁহার নিত্য নূতন প্রকাশ দেখিয়া নিত্য নূতন ভাবে পবিত্র জীবন লাভ করেন।

যাহা জীবন—প্রকৃত পক্ষে তাহা নূতন! নিত্যই নূতন জীবন লাভ করিতে হয়। পুরাতন জীবন মৃতবৎ শুষ্কভাব, তাহা লইয়া সাধকের দিন চলে না। নূতন জীবন প্রকৃত জীবন। নিত্য নূতন ভাবে যে জীবন লাভ করিতে হয়। ইহলোক হইতে পরলোকে যাইতেও ঐ নূতন হইতে নূতনতর ভাবেই যাইতে হইবে। এমনই বিশ্বাস চাই। কৃপাময়ের কৃপাতে তাহা পাওয়া যায়।

নববর্ষের আবাহন

তুমি এস এস হে নবীন এস
কর নব সুধারস সিঞ্চিত।
এস নব নব আশা জাগায়ে পরাণে—
যেন রেখনা কখন বঞ্চিত।
হে নব বরষ, বিমল হরষ
বিতর আসিয়া বিধুর বক্ষে;
দাও নব শক্তি নব উন্মাদনা
চেতনা-অঞ্জন পরাও চক্ষে।

কত সুখ দুঃখ কত আশা তৃষা
গেছে পুরাতন পিছনে ফেলি,
তোমারে সম্মুখে রাখি মন সুখে
যাব সব বিঘ্ন হেলায় ঠেলি।
বরষের সনে জরা জন্ম মৃত্যু
কত আসে কত চলিয়া যায়।
সম্পদ বিপদ শোক তাপ দুঃখ
থাকি শুধু স্মৃতি লইয়া হায়!
কতনা আনন্দ-মুকুল মম
জীবনের বৃন্ত ভরিয়া উঠি।
শত নৈরাশ্যের সুভীষণ তাপে
শুকাইয়া গেছে কিছু না ফুটি'।
কত ঝঞ্ঝা কত ভীষণ বন্যা
বরষের বক্ষে মিশায়ে থাকে।
কতনা সাধের সাজান নন্দন
পলকে শ্মশান করিয়া রাখে।
আজি পুরাতন বরষে স্মরিয়া
বিদায়ের অশ্রু পড়িছে ঝরি;
নূতনে বরিতে আবাহন গীতে
জীর্ণ বক্ষ বীণা উঠিছে ভরি।
এসহে নূতন! নব পত্র-পুষ্পে
নবীন পল্লবে ভরিয়া শাখা।
জাগায়ে জীবনে নবীন বসন্ত
সারাটি বরষ থাকহে সখা।
বিশুষ্ক জীবন-কুঞ্জ মুঞ্জরিবে
তব চরণ-মঞ্জীর রণনে।
হিল্লোলি উঠিবে কত কলরোল
তব শ্বাস-সমীরণ-স্বননে।
নবীন উদ্যম নবীন উৎসাহ
সঞ্চার, সবার দুর্ব্বল প্রাণে।

দেখা দাও শত মূর্ত্ত ছন্দে তুমি
শত গন্ধে শতবরণে ধ্যানে।
এস নববর্ষ দীনের কুটিরে
লহ হৃদয়ের নির্ম্মল প্রীতি!
রেখেছি ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া
তব আবাহন-মঙ্গল-গীতি।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

মিলন

(গল্প)

পিতার অবর্ত্তমানে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা মোহিতলালের আদেশ অমান্য করিয়াও যখন রামচন্দ্র বন্ধু-ভগ্নী সুরমাকে বিবাহ করিতে দৃঢ় নিশ্চয় হইল, তখন মোহিত স্বীয় কর্ত্তব্য এবং দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া আর একবার রামচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ রাম, যৌবন-মদগর্ব্বে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ো না, একবার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কাজ কর. আমরা রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণদের ঘরে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করতেন না, তার উপর আমরা মুখ্য কুলীন, সমাজে আমাদের কত প্রতিপত্তি, কত সম্মান, আর সে-সব কিনা আজ তুমি দুপায়ে মাড়িয়ে. সেই বারেন্দ্রশ্রেণীর ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? আমাদের চিরোজ্জ্বলবংশের মুখে এমন করে কালি লেপে দিতে তোমার এ কি দুর্ম্মতি হ'ল? পিতৃপুরুষদের পর্য্যন্ত যে নরকবাসের ব্যবস্থা করছ, এটাও কি একবার ভাবছ না? আবার ভবিষ্যতে তোমারও কন্যা পুত্রের বিবাহাদি হওয়া ভার হবে, সমাজ তোমায় ঘৃণা করবে, আর তোমার স্ত্রীকে আমি নিজের সংসারে গ্রহণ করতেও পারব না, কেন না, আমারও ছেলে মেয়ে আছে, কাজেই সমাজকে রীতিমত আমায় মেনে চলতে হবে, বাপ মার নাম ডুবুতে পারব না, তখন তোমায় আলাদা বাড়ী ভাড়া নিয়ে নূতন করে সংসার পাততে হবে, তোমার এই সামান্য তিরিশটি টাকা বেতনে কি এই কল্‌কাতা সহরে বাস করতে পার্‌বে ভাবচ? আমি তোমার ভালর জন্য সকল দিক ভেবে চিন্তে বললুম, এখন তুমি বেশ করে বুঝে দেখ।"

নতমুখে রামচন্দ্র সকলই শুনিল, সেও কি আর এ-সব বিষয়ে বার-বার আন্দোলন করিয়া দেখে নাই? আজ কয়দিন বার-বার সে আদ্যোপান্তই ভাবিয়াছে, কিন্তু সে যে সকল বিপ্লবের সঙ্গে, সমুদায় বাধার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এ বিবাহের প্রসঙ্গ ভ্রাতার কর্ণগোচর করিয়াছে, এখন সম্মুখসমরে কেমন করিয়া পশ্চাৎপদ হইবে? বন্ধু যখন বলিয়াছিল, "রামচন্দ্র, মুখে যতই আস্ফালন কর, কাজে পারছ না, এ বড় দুঃসাহসিক ব্যাপারে হাত দিতে যাচ্ছ।" তখন কি সে বুক ফুলাইয়া মেঝের উপরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলে নাই "শর্ম্মা সে ছেলে নয়, যে কথা সেই কাজ।" এখন সে কি আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে? সুতরাং ভ্রাতার কথার উপরে ধীরে ধীরে বলিল, "কথা দিয়ে ফেলেছি, তার কি আর নড়-চড় হয়? সত্য কথা পুরুষের ধর্ম্ম।"

মহাক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মোহিত কহিল, "কি আমার ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির রে, ভারি সত্যপালন করতে শিখেছেন, যা, অধঃপাতে যা, দূর হ আমার সম্মুখ হ'তে, আর এ বাড়ী ঢুকিস্ নে, নিজের পথ দেখে নিগে, ও কালামুখ আর দেখাস্ নে!"

নীরবে রামচন্দ্র সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। যদিও তাহার ভ্রাতা এ বিবাহে অসম্মত হইবেন, সে জানিত, তথাপি ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে, তাহা সে আশা করে নাই, এখন আর একবার সে আগা গোড়া ভাবিয়া লইতে লাগিল।

শৈশবে সে পিতৃ মাতৃ হীন হইয়াছিল, এবং তদবধি ভ্রাতৃজায়া বনবালা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ যত্নে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছিল। পিতা কিছু সামান্য কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে যে কত টাকার, এবং কাহার নামে, তাহা রামচন্দ্র কখনও জানে নাই, বা জানিবার চেষ্টাও করে নাই, দাদার নিকট মজুত আছে জানিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল।

মোহিত পূর্ব্বে ই, বি, এস, রেলওয়ের কোন ষ্টেশন-মাষ্টার ছিল, এবং পঞ্চাশটাকা বেতন সত্ত্বেও কিরূপে মাসিক দুই তিন শত টাকা অক্লেশে উপার্জ্জন করিত, তাহা সুচতুর রেলের কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত অপরের বোধগম্য হইবে না। এইরূপে দু চারি বৎসরে মোহিত বেশ গুছাইয়া লইয়া ছিল, অতঃপর কর্ম্মে একটি গোলযোগ ঘটায় যখন কর্তৃপক্ষ তাহার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিলেন, তখন সে ডিস্‌মিস্ হইবার আশঙ্কায়, বুদ্ধিমানের ন্যায় পূর্ব্ব

হইতেই কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বসিল, আর সঞ্চিত অর্থ গুলি সুদে খাটাইয়া দিব্য মাসে দু-দশ টাকা রোজগার পূর্ব্বক সংসার চালাইতে লাগিল।

রামচন্দ্র তখন এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ-এ পড়িতেছে, মোহিত একদিন ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, রাম, বাবা মারা যাবার পর জান তো একরকম সংসার চালিয়ে আসছিলুম, কিন্তু এখন চাকরিটি গেল, আর বাতে আমার শরীর এমন অক্ষম হয়েছে যে আর নতুন করে কোন চাক্‌রী করতেও পারব না, কাজেই আমি নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তোমায় একটি অপ্রিয় কথা বলতে বাধ্য হ'চ্ছি। এদিকে আমার মেয়ে দুটিও দিন দিন বড় হয়ে উঠচে, তাদের বিয়ে-থার যোগাড় এখন থেকেই করতে হবে, কেন না জান তো, আজ কাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছে. সুভরাং তোমার পড়ার খরচ আর দিয়ে উঠতে পারব না। আমার ইচ্ছে ছিল যে, তোমায় যেন পরের চাক্‌রি করে খেতে না হয়, লেখা পড়া শিখে একটা স্বাধীন-জীবীকা অবলম্বন করবে, তা দুর্ভাগ্য ক্রমে হ'ল কই? আর তোমাকেও বলি, তোমার বন্ধু কালিদাস পাস করে জলপানী পাচ্ছে. তুমি তো বাপু তা পারলে না।"

ভ্রাতার আকস্মিক এই উপদেশ বা আদেশ-বাণী শ্রবণে রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, তখন তাহার পাঠানুরাগ অত্যন্ত প্রবল, অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের প্রতি তখন তাহার ততো লক্ষ্য ছিল না, জ্ঞান-তৃষ্ণা তাহার চিত্তকে উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিয়া সে বলিল "একটা 'টিউসন' আছে, গোটা আষ্টেক টাকা মাসিক পাওয়া যেতে পারে, আর একটা চার পাঁচ টাকার টিউসনও যোগাড় করে নিতে পারি, আপনি বলেন তো তাতেই আমার কলেজের মাইনে ইত্যাদি চালিয়ে নিতে পারব।"

মোহিত সূক্ষ্মদর্শী ছিল, সুতরাং ভ্রাতার এ উত্তর তাহার নিকট যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না, তাই বলল, "পড়ার খরচ না হয় ঐতে চল্ল, কিন্তু পেট চলবে কিসে?" তাহা ছাড়া, মোহিত অত্যাধিক ভ্রাতৃস্নেহ বশত স্থির করিয়া ছিল যে, শীঘ্রই রামচন্দ্রের জন্য একটি রূপবতী সালঙ্কারা পাত্রী স্থির করিয়া বিবাহ দিবেন, (তাহার উপর অবশ্য নগদ টাকা এবং যৌতুক সামগ্রী আছেই) সুতরাং তখন ভ্রাতা সংসারী হইলে কিছু আর টিউসনে উভয়ের অন্নের সংস্থান হইবে না, তাহার উপর কোন্ না সম্বৎসরের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীর শুভদৃষ্টি নব দম্পতীর প্রতি পতিত হইবে? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই মোহিত রামচন্দ্রের

চাকরী করাই অবশ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে উত্তর শুনিয়া কহিলেন, "পাগলের মতো কেন বকচ ভাই? টিউসন করে যদি পড়া ও পেট চল্‌তো তা হ'লে ভাবনা ছিল না, তারপর না হয়, সংসারে আমার যতদিন অন্ন জুটবে, তোমারও দু'মুটো জুটে যাবে, কিন্তু মানুষের শরীরের উপর কতটুকু ভরসা, আমার এই ভগ্ন-স্বাস্থ্য, তাই আগে হ'তে তোমার একটা স্থিতি দেখতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। আমার কি আর ইচ্ছে ছিল যে হঠাৎ তুমি কলেজ ছেড়ে গোলামী করতে ঢোক? কিন্তু কি করব বল? অদৃষ্টের ফের, নইলে আমার অমন কাজ যাবে কেন?"

রামচন্দ্র ভ্রাতাকে অত্যন্ত মানিয়াই চলিত সুতরাং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক অবিলম্বে বিদ্যালয় ছাড়িয়া অধ্যাপনার কর্ম্ম গ্রহণ করিল। এবং বুদ্ধিমানের ন্যায় সেই সঙ্গে যাহাতে এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও করিতে লাগিল।

২

কলেজ ছাড়িয়া দিয়াও রামচন্দ্র এইরূপ বিদ্যালোচনা করিতে লাগিল। এবং শিক্ষা বিষয়ে দিন দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। যথা সময়ে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইল, এবং পুনরায় বি-এ পড়িবার জন্যও চেষ্টা করিতে লাগিল।

মোহিত দেখিয়া শুনিয়া কহিল, "হ্যাঁ এই তো বুদ্ধিমানের কাজ, পড়াচ্ছ ও পড়চ্ছ, এমন কটা ছেলেতে পারে?"

কিন্তু রামচন্দ্রের বি-এ পড়া আর হইল না, অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায়, পড়িবার বাসনা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু অবসর মতো সে নানাবিধ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া আপনার জ্ঞানস্পৃহাকে চরিতার্থ করিত।

রামচন্দ্র ভ্রাতার যথেষ্ট অনুগত ও বাধ্য হইলেও একটি বিষয়ে তাঁহার অনুগামী হইল না, সে-টি বিবাহ বিষয়ে। যদিও ঐ কার্য্যটি বাঙালী গৃহে অত্যন্ত সহজ সাধ্য বলিয়া পরিগণিত, তথাপি যৌবন দৃপ্ত, শিক্ষা-গর্ব্বিত যুবক রামচন্দ্রের নিকটে উহা অতিশয় দুরূহ এবং জীবনের একটি ঘোরতর সমস্যার ন্যায় মনে হইত।

মোহিত কতস্থানে রামচন্দ্রের জন্য পাত্রী ঠিক করিয়া বিবাহে ভ্রাতার ঘোরতর অসম্মতি জানিয়া, বৃথা অপদস্থ হইতে লাগিল, সুতরাং তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বনবালাও সাধ্যমত দেবরটিকে সুপথে আনিবার জন্য দুইবেলা পূজার সময় ইষ্টদেবতার নিকট তাহার সুমতির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, মূর্খ যুবকের বিবাহ বিষয়ে সৎ জ্ঞানটুকু তত্রাচ হইল কই?

একদিন রামচন্দ্রের আহার কালে বনবালা হাস্য মুখে কহিল, ভাই ঠাকুরপো, লক্ষ্মিটি, বেশী শক্ত কাজ নয়, একখানি চেলির কাপড় পরে, একটি টোপর মাথায় দিয়ে, টুকু করে ফিটিন চড়ে একবার যাবে, তারপর কেমন একটি

টুকটুকে, চাঁদপারা মুখ ছোট্ট বোন্‌টি আমাকে এনে দেবে. এই কাজটুকু করে, আমায় আর তোমার দাদাকে সুখী করতে, তোমার এতো অমত কেন ভাই ?"

রামচন্দ্র কহিল, "দোহাই বৌদি, বিয়ে কাজটিকে তুমি যত সহজ ভাবছ, আমি ততোটা ভেবে উঠতে পারছি না। এক বাটি রসগোল্লা বা দু'চারটে লেঙড়া আম, আমি এখন তোমার অনুরোধে পেটের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও অম্লান মুখে খেয়ে ফেল্‌লে পারি, কিন্তু ঐ যে চেলী পরা, ফিটিন চড়া, ও আমার দ্বারা হবে না। যদি পুতুল বিয়ে করতে বল, তা দিন দু চারটেও করে আন্‌তে পারি; কিন্তু বাপ্‌রে, সে একটি জলজ্যান্ত জীব ঘরে আন্‌তে হবে, আর তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিন রাত্রে সহস্র বার আমায় অনুভব করতেই হবে, তখন এত শীগগির চোক্ কান্ বুজে সে কাজ আমি করতে পারি না। তবে তোমায় নিরাশ করছি না —নিমন্ত্রণও করে রাখছি, একদিন এর পরে ধীরে সুস্থিরে দেখে শুনে সে কাজ হবে।"

বিস্ফারিত নয়নে বনবালা কহিল, 'এঁ্যা, তবে কি তুমি কোট সপ করে বিয়ে করবে নাকি ?"

না তাও নয়, বিয়ে সম্বন্ধে ঠিক্ ধারণা এখনও আমার হয় নি, সুতরাং ও-বিষয়ে আলোচনাও করতে পারি না।"

"তোমার দাদা তো তোমার বয়সে ছেলের বাপ হয়ে ছিলেন, তিনি তো বিয়েকে বাঘের মতো ডরান নি, কপ্পা একটি অস্বাভাবিক জিনিষ বলেও মনে করেন নি, তোমার বেলায় এ উল্টো ব্যবস্থা কেন ভাই ?"

আহার শেষ করিয়া ডিবা হইতে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া চিবা তে চিবাইতে হাসি মুখে রামচন্দ্র কহিল "দাদা যে নতুন গুড়ের সন্দেশের নামে জিবের জল ফলেন, আর ও জিনিষটার গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের ভাত বার হবার জো হয়, সুতরাং নতুন গুড়ের মিষ্টত্ব বিষয়ে যতই তুমি গলাবাজী করে প্রমাণ দেখাও না কেন, আমি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারব না, এর তথ্য নির্ণয় করতে পার কি বৌদি ?"

এইরূপে দেবর ও ভ্রাতৃজারায় মধ্যে মধ্যে নানা তর্ক ও যুক্তি অমীমাংসিত ভাবে চলিতে থাকিত, ব্যর্থ প্রয়াস বনবালা কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিল না, সুতরাং হতভাগা নির্ব্বোধ যুবকের জীবনের স্বর্ণ-ময় দিন গুলি, সরস পত্নী তত্ত্বে নিযুক্ত না হইয়া একরকমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে বিফল-মনোরথ কুসুমধন্বা অবাধ্য যুবককে একদিন রীতিমত সুশিক্ষা দিবার জন্য, তাহার শাণিত ফুলধনু লক্ষ্য করিয়া শুভ অবসরের প্রতীক্ষায় রহিতে ভুলিল না।

৩

নানাবিধ ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রেম বিষয়ক অজস্র, বৈচিত্র্যময়ী উপন্যাস-কাহিনী ইত্যাদি পাঠ করিয়াও রামচন্দ্র সে বিষয়ের যথার্থত্ব বা অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, অথচ মর্ম্মের মধ্যে একটা যেন কিসের

তৃষ্ণা, কিসের অভাব জাগিয়া থাকিত ; যেন কি নাই, যেন কি চাই, যেন হৃদয় বীণার তারগুলি সব বাঁধা হইয়া ঠিক্ রহিয়াছে. কেবল তাহাতে নিপুণ বাদকের হস্ত হইতে সুরযোগের অপেক্ষা। যেন রামচন্দ্রের অজ্ঞাতে তাহার নবীন-হৃদয় কাহার তরে বাসরসজ্জা করিয়া বসিয়া আছে। মনের এই প্রকার উচাটন অবস্থায় একদিন মাঘ মাসের দারুণ শীতের কনকনির মধ্যে, সূর্য্যকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে রামচন্দ্র বন্ধু-গৃহে বন্ধু-ভগ্নী সুরমাকে দেখিল, বন্ধু পুত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে নিমন্ত্রণে আসিয়া অনূঢ়া কিশোরী সুরমাকে দেখিবামাত্র রামচন্দ্রের বিদ্রোহী হৃদয় আজ যেন জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিল "এরই জন্য আমার বাসর সজ্জা, এই আমার বাসর-লক্ষ্মী" হৃদয় বীণা আজ আর নীরব রহিল না, তার সব তারগুলি আজ শত ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় রামচন্দ্র গোপনে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল. কিন্তু হায় হায়, সংযমের বাঁধ আজ আর টিকে কই ? প্রথম দর্শনে যদিও সে সুশোভনা বালিকাকে দেখিয়া একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছিল. কিন্তু তাহা অনুরাগ বা প্রেমের লক্ষণ নহে, (কেননা প্রথম সাক্ষাতে অনুরাগের কথা রামচন্দ্র বিশ্বাস করিত না) তারপর যখন পিতৃমাতৃহীনা সুরমার বিষয়ে সকল কথা শুনিল, তখন সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, স্নেহ প্রেম সবই তাহাতে মিশ্রিত হইয়া, রামচন্দ্রকে অপূর্ব্ব মানসিক বলে বলীয়ান করিয়া তুলিল, কেন না, আজ রামচন্দ্রকে সমাজের বিপক্ষে একা দাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সুরমা পূর্ণ চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সেও অবিবাহিতা ছিল, কেননা তাহার ভ্রাতা হরেন্দ্রনাথের কিছু মাত্র সঙ্গতি ছিল না, সুরমা সুশ্রী হইলেও তাহাকে সেরূপ সুন্দরী বলা যায় না, যাহাকে পাত্র পক্ষ বিনা যৌতুকেও গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন, হরেন্দ্রনাথের ঘরও এ দিকে কিছু ছোট ছিল. কিন্তু তাহার দৃষ্টি টুকুও প্রখর ছিল, যাহাতে ভগিনী সুপাত্রে ন্যস্ত হয়, সুতরাং সুরমার বর জোটা যে অসম্ভব হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? প্রাচীনারা তো বলা-বলি করিতেন, ছুড়িটাকে হয় তো আজন্মকালই থুবড়ি থাকিতে হইবে।

পাড়ায় যখন রাজীবলোচন মৃতদার হইয়া পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন হরেন্দ্রনাথের অনেক হিতৈষী স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধুগণ তাহাকে অজস্র উপদেশ দিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, এতবড় আইবড় মেয়ে ঘরে রেখে কেন পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করছ ? রাজীবলোচন তো এক পয়সা না নিয়েও সুরমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে। পাত্র দ্বিতীয় পক্ষের হলেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পুরুষমানুষ কখনও বুড়ো হয় না, দুটো মেয়ে আছে, তা তারা ছেলে পুলে নিয়ে শ্বশুর-ঘরেই আছে লোকটার পয়সা আছে, সুরমার খাবার পরবার দুঃখু কখনও হবে না, গায়ে দু-খানা সোনা-দানা পরেও বাঁচবে, ভাগ্যে না থাকলে অমন বর মেয়ের কপালে জোটে না।"

দুর্ম্মতি যুবক হরেন্দ্রনাথ সে সকল হিতগর্ভ সুযুক্তি পূর্ণ উপদেশ গুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিত, তখন সকলে বুঝিল, উহার অদৃষ্টে নিতান্তই দুঃখ আছে।

বন্ধুর নিকট হইতে সকল কথা অবগত হইয়া রামচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া বসিল

"এ বিবাহ আমিই করিব" যদিও ইতিপূর্ব্বে বিবাহের 'আইড়িয়া' ভ্রাতৃজায়া বনবালা, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনেক শিক্ষাতেও তাহার উদ্ভট কল্পনাপূর্ণ মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই, কিন্তু আজ অকস্মাৎ অনায়াসে সে বুঝিতে পারিল, একা এই সংসার সমুদ্রে অবলম্বন ও উদ্দেশ্যশূন্য জীবনতরী বাহিয়া চলা অপেক্ষা একটি মনোনীতা সঙ্গিনী গ্রহণ করা ভাল, তাহা হইলে জীবনটাকেও শূন্যতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে।

মোহিত যখন ভ্রাতার এই সমাজ বিরুদ্ধ বিবাহের প্রস্তাব শুনিল, রাগে, ও অপমানে তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রাতাকে ডাকিয়া অনেক তিরস্কার করিল, অনেক উপদেশ দিল, বনবালাও যথাসাধ্য দেবরের মন ফিরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা অটল অচল পূর্ব্ববৎ রহিল।

৪

সেদিন ভ্রাতার নিকট হইতে শেষ রূঢ় কথা কয়টি শুনিয়া রামচন্দ্র নিজগৃহে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিল। সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে, যদি সে এ বিবাহ করে, তাহা হইলে সমাজে তাহাকে এক-ঘরে হইয়া থাকিতে হইবে, সকলেই তাহাকে নিন্দা করিবে, এমন কি, যে স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এতদিন তাহাকে ক্রোড়ে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সে ক্রোড় হইতেও তাহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। এই শেষ চিন্তাটিতে কিছুক্ষণের জন্য রামচন্দ্রের সমস্ত অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সে আপনা আপনি কহিল "হায় হায়, স্নেহ জিনিষটাও সমাজের শাসনাধীন!" কিন্তু তাই বলিয়া সে কাপুরুষের ন্যায় সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে না। সে এই বিবাহের সমস্ত দুঃখ, সকল বিপ্লবকে বরণ করিয়া লইতেই প্রস্তুত, এবং তাহার কার্য্যে দেশের লোক গালি পাড়িলেও তাহার প্রতি সে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া একটি সুবৃহৎ বটগাছ দেখা যাইতেছিল, তখন সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু অস্তগত তপনের শেষ কিরণটুকু বৃক্ষের উপরিভাগকে অতি বিচিত্রপ্রভায় রাঙাইয়া তুলিয়াছিল, চারিদিক হইতে কাক্ চিল এবং নানা জাতীয় অন্যান্য পক্ষীগণ নিজ নিজ কাকলীতে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া রজনীর আশ্রয়ের জন্য সেই বৃহৎ বৃক্ষটির চারিপাশ ঘিরিয়া ফেলিতেছিল, সকলেই যেন মহাব্যস্ত—কে কাহার উপর পড়িতেছে ঠিক্ নাই। যেন কত বড় প্রকাণ্ড একটা কাজের সমারোহ চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইটি কপোত, বৃক্ষের এক প্রান্তস্থিত একটি শাখার উপরে বসিয়া বকম বকম করিয়া মাথা নাড়িতেছে। ঐ কোলাহলের সহিত যেন তাহাদের কোন সংস্রব নাই, উভয়ে উভয়ের নিভৃত আলাপেই ব্যস্ত এবং তাহাতেই ভরপুর।

রামচন্দ্র দেখিয়া দেখিয়া ভাবিল, লোকে বলে, পায়রাদের মতো কোন জীব প্রেমিক নয়, তাহাদের এই ভালবাসাই যেন সর্ব্বস্ব, সমস্ত জীবনটাতে তাহাদের

ভালবাসা জুড়িয়া আছে, আমরাও এমনি সংসারের সমস্ত কোলাহল হ'তে বিদায় নিয়ে নিভৃতে আবাস বেঁধে থাকব। আমাদের সরল অকৃত্রিম প্রণয়ই নিঃসঙ্গ জীবন দুটিকে মধুময় করে তুলবে, তাতেই আমরা হৃদয়ে শান্তি পাব, সেই ভালবাসা এবং বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে এক অপূর্ব্ব পুলক অনুভব করিল, তাহার সর্ব্বশরীর ভবিষ্যতের এই রমণীয় প্রেমপূর্ণ দাম্পত্য চিত্র দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠে প্রণয় বিষয়ে যতটুকু অভিজ্ঞতা সে এতদিন লাভ করিয়াছে, আজ নিজেকে তাহারই অন্তর্গত ভাবিয়া একটি অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

যখন সে ভ্রাতৃ আদেশে তাহার সেই চিরপুরাতন—চিরপ্রিয় আবাল্যের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল, স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া বনবালা কম্পিত হস্তে এক জোড়া ইয়ারিং বাক্সসমেত আনিয়া রামচন্দ্রের হাতে দিয়া কহিল "ভাই ঠাকুর পো, তোমার বৌ, আমার ছোট বোন্‌টিকে আমার এই চিহ্ন দিও, আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, লক্ষ্মীর মতো বৌ নিয়ে মনের সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে বাস কর। কিন্তু আজ আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে ঠাকুরপো, লক্ষ্মণের মতো যে তুমি হেন দেবর, তাকে আজ আমায় পথে ভাসাতে হচ্ছে, তোমার বৌ যে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তাকে আমি বরণ করে ঘরে তুল্‌তে পারলাম না, এ-কি কম দুঃখের কথা! সে দুঃখ কাঁটার মতো আমার বুকে ফুট্‌চে, কিন্তু কি করব উপায় নেই, তুমি জান, তোমার দাদাকে, আমার একটি কথাও তাঁর কাছে চলে না, এই যে আজ তুমি ঘর বাড়ী শূন্য করে চলে যাচ্ছ, এতে যে আমার বুক কত খালি খালি হয়ে যাচ্ছে, ছেলে গুলো যখন 'কাকা কোথা' জিজ্ঞেস করবে"—

বনবালার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, অঞ্চল তুলিয়া সে চক্ষে দিল, স্নেহময়ী রমণীর অন্তর যে আজ কতখানি ব্যথা অনুভব করিতেছে, তাহা অন্যে কি বুঝিবে?

রামচন্দ্রও সজল চক্ষে কহিল, বৌদি, আজ কিন্তু বুঝলাম জগতে স্নেহের একটা কোন মূল্য নেই, সমাজ সব চেয়ে বড়, নইলে আমাকে তোমরা এমন করে দুর করে দেবে কেন, মৃতকেও লোক এমন ভাবে টেনে ফেলে দেয় না, যাই হোক্ আমি তবু তোমাদের রইলুম, তোমাদের দরজা আমার জন্যে চির কালের মত রুদ্ধ হলেও যখুনি ডাকবে আমি আসতে কুণ্ঠিত হব না, তোমাদের কাছে আমার অপমান নেই।"

ইহার উত্তরে ব্যস্ত হইয়া বনবালা কহিল, "বালাই ষাট্, তুমি কি দুর হবার জিনিষ ভাই" কিন্তু আর বেশী সে বলিতে পারিল না, কেননা স্নেহ জিনিষটা যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, সমাজও তার চেয়ে কিছুতে ছোট নয়, সুতরাং সেই সমাজের চরণ তলে সকলই বিসর্জ্জন করা হিন্দুপরিবারের প্রধান কর্ত্তব্য; এ-টাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

৫

সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, দিন তো কাটিয়া চলেই, সে কারও মুখ চাহিয়া

অপেক্ষা করে না, সুতরাং রামচন্দ্রের সহিত সুরমার বিবাহের পর দুইটি বৎসর হু-হু করিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

আত্মীয় স্বজন বিহীন, তবু তাহাদের এক কোণের ক্ষুদ্র নূতন সংসারটি এক রকম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে ঈশ্বর-কৃপায় একটি পুত্র সন্তান তাহাদের সংসারে স্থান পাইয়াছে, এবং সে সুকোমল শিশুর সরল হাস্যে, ক্রন্দনে, ক্রীড়ায় তাহাদের হৃদয় ও গৃহ ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। দম্পতী-হৃদয়ে শক্তির বন্যা, স্নেহের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে। আর্থিক বিষয়ে রামচন্দ্রের কিছুই উন্নতি হয় নাই, তবে বেতন এক্ষণে চল্লিশ টাকা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ঐ সামান্য আয়ে একটি ভদ্র গৃহস্থের—বিশেষ কলিকাতা সহরে সংসার চলা সুকঠিন ব্যাপার। আট টাকা দিয়া রামচন্দ্র একটি খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। হাস্যমুখী প্রসন্ন-স্বভাবা সুরমা স্বহস্তে দাসীর ও পাচিকার কার্য্য সম্পন্ন করে। এই অল্প আয়েই দুইজনে যথাসাধ্য ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া এক প্রকার গুছাইয়া চলে, আর অভাবজনিত কোন প্রকার ক্লেশ বা অশান্তি তাহাদের সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে বিদ্রোহের শিখা প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র একবার ভ্রাতাকে বিনীতভাবে জানাইয়াছিল যে, তাহার আর্থিক অবস্থা যখন এ প্রকার অস্বচ্ছল, তখন তাহাদের স্বর্গীয় পিতা উভয় পুত্রের নামে যে কিছু নগদ টাকা ও কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক বা একাংশ যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যার্পণ করেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। গম্ভীর ভাবে মোহিত উত্তর দিয়াছিল, "কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের দুই ভায়ের সমান অধিকার লেখা স্বত্বেও উহাতে আরও লেখা আছে যে, 'যদি কনিষ্ঠ রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুচরিত্র হয়, কিম্বা জ্যেষ্ঠ মোহিতের কথা অমান্য করিয়া চলে, তাহা হইলে ইহার এক কপর্দ্দকেও তাহার দাবী দাওয়া বর্ত্তিবে না।" তোমার বিশ্বাস না হয়, এক সময়ে এস, উকিলের নিকট গিয়ে, তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে আসব।"

"আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন এই আমার কাছে যথেষ্ট সত্য।" এই বলিয়া নতমস্তকে রামচন্দ্র ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, সেই হইতে দুই ভ্রাতায় আর কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নাই।"

রামচন্দ্র ও সুরমা বেশ মনের সুখেই দিন যাপন করিত। কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া জলযোগান্তে রামচন্দ্র খোকাকে বুকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিত। ততক্ষণে সুরমা রন্ধনকার্য্য শেষ করিত। তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে খোকাকে লইয়া নানা প্রকার গল্প ও খেলা করিত, এবং সুরমা খোকাবাবুর দৈনন্দিন ক্রীড়ার ও দুষ্টামির দীর্ঘ তালিকা রামচন্দ্রের গোচরীভূত করিত, রামচন্দ্র খোকার শাস্তিস্বরূপ অজস্র চুম্বনে তাহার সুকোমল গণ্ড দুটি রাঙাইয়া তুলিত। দুষ্ট শিশু সে সবে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তখনই আবার নূতন নূতন উপদ্রবে পিতা মাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। দোয়াত উল্টাইয়া—কালি ফেলিয়া প্রদীপ, ল্যাম্প ফেলিয়া দেওয়া, জল ঘাঁটা ইত্যাদি নানা রূপে খোকা সুরমাকে বিব্রত করিয়া তুলিত।

কখনও বা কুকুর ছানাটিকে যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগে বুকে লইয়া এমন ভাবে তাহাকে পেষণ করিতে থাকিত যে, দেড় বৎসরের শিশুর এই বীরত্ব দর্শনে সুরমা ভাবিত. "খোকা যদি বাঁচে, হয় তো শকুন্তলার ছেলে ভরতের মত সিংহীর ছানার সঙ্গে খেলা করতে ভয় পাবে না। খোকা নিদ্রিত হইলে, উভয়ে আহারাদি শেষ করিয়া গ্রন্থাদি পাঠে কিছুক্ষণ নিযুক্ত থাকিত. এইরূপে সকলকার বাহিরে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন হইয়া উভয়ের হৃদয়ে যেন নিঃশব্দে বিশ্ব-বিধাতার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া যাইত।

একদিন রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, দাওয়ার উপরে মাদুর বিছাইয়া রামচন্দ্র বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল, নিকটে সুরমা বসিয়া খোকার জন্য জামা সেলাই করিতে করিতে যদিও গীতা শ্রবণে চিত্তকে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, তথাপি তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট মন. প্রাঙ্গনস্থিত খোকার সহিত বিড়াল শাবকের ক্রীড়া দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। বাড়ীতে দাস দাসী নাই বলিয়া রামচন্দ্র একটি ভাল কুকুর পুষিয়াছিল, সম্প্রতি দুই মাস হইল, তাহার তিনটি ছানা হইয়াছে, আর খোকার খেলিবার জন্য রামচন্দ্র একটি বিড়াল ছানাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সুতরাং খোকা বাবু এই নূতন সঙ্গীগণের সহিত সর্ব্বদাই খেলা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা ক্ষুদ্র শিশুর আদর সম্ভাষণ সর্ব্বদা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, এবং তাহার সোহাগরূপ অত্যাচার অধিকক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া যথাসাধ্য "মিউ মিউ" ও "কেঁউ কেঁউ" করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিত বটে. কিন্তু খোকা সে সকল অভিযোগ শুনিতে নিতান্তই নারাজ,এবং উহাদের স্বাধীনতা দিবার কোন আবশ্যক বিবেচনা করিত না। এক দিন কুকুর ছানা গুলি কিছুক্ষণ এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিবার পর. দৌড়াইয়া মাতার নিকট পলায়ন করিল, উহাদের মাতা তখন আহারান্তে দ্বারের নিকটে বিশ্রাম করিতেছিল, কিন্তু তাহার সাবধান কর্ণযুগল কোন নবাগতের পদধ্বনি শ্রবণে অসতর্ক ছিল না, এক্ষণে শাবকগুলিকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া তাহাদের গাত্র লেহনে প্রবৃত্ত হইল; শাবকগুলি স্তন্যপানে নিযুক্ত হইল।

এদিকে সুরমা রামচন্দ্রকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "ওগো দেখ, খোকার রকম দেখ, কুকুর ছানাগুলকে তো মেরে তাড়ালে, তার পর বেড়াল ছানাটার কি দুর্দ্দশা করছে দেখ না।

সুরমার এই প্রলোভন পূর্ণ বাণী, গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অপেক্ষা মধুর লাগায় কিয়ৎক্ষণের জন্য পুস্তক মাটীতে রাখিয়া রামচন্দ্র মুখ ফিরাইয়া খোকার বীরত্বসূচক কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, এবং গীতার দুরূহ অর্থ বোধ অপেক্ষা ঐ ব্যাপারটি বেশ সহজ ও সরল বোধ হওয়ায় প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল, খোকা তখন একটি ক্ষুদ্র বেতের মোড়ার উপর বসিয়া, বিড়ালটির মস্তক আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে,আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট মধুরতর ভাষায় স্বীয় ক্ষুদ্র হৃদয়ের আনন্দোল্লাস ব্যক্ত করিতেছে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল, অকস্মাৎ রাস্তার উপরে, অথচ গৃহের অতি নিকটেই পাল্কীর বেহারাদের চির পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর

কুকুরটি অত্যন্ত চীৎকার পূর্ব্বক যেন কোন অপরিচিতের আগমন ঘোষণা করিতে লাগিল, সবিস্ময়ে সুরমা কহিল, "দেখ তো গো, বোধ হচ্ছে পাল্কী আমাদের দরজায় নামিয়েচে, হয় তো বাড়ী ভুল ক'রে এসেছে।"

রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময় মিশ্রিত চীৎকারের সহিত কহিল, "ও হো, একি ব্যাপার, বৌদি যে, এ যে চিন্তার অতীত, স্বপ্নের অগোচর! গৃহলক্ষ্মী কি আজ পথ ভুলে লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে উপস্থিত হলেন?"

"বালাই, সম্মুখে লক্ষ্মী থাকতে লক্ষ্মীছাড়া হবে কেন ভাই? অনেক দিনের সাধ তোমার লক্ষ্মীকে একদিন দেখতে আসি, তাই সুবিধে পেয়ে এলুম, তিনি দু'দিনের জন্যে জমীদারী দেখতে গেছেন কি না।"

সুরমা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল, কাহার শুভাগমন হইয়াছে, ত্রস্তে, মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্র-পদে আসিয়া বনবালার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, বনবালা হস্ত দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত চুম্বন করিয়া সুরমাকে কোলের কাছে টানিয়া সস্নেহে কহিল, "তুমি বোন্ ঘরের লক্ষ্মী হয়েও অদৃষ্ট দোষে একপাশে পড়ে রইলে, এ কি আমার কম দুঃখু? বেঁচে থাক, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নো খয়ে যাক্, ছেলেপুলে নিয়ে স্বামীর ঘর চিরকাল মনের সুখে কর। খোকা কই? শুনেছিলুম খোকা বড় সুন্দর হয়েছে।"

বনবালার সঙ্গে কেবলমাত্র বনবালার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন আসিয়াছিল, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বিড়াল শুদ্ধ খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতেছিল, মাতার আহ্বানে অগ্রসর হইয়া কহিল, "এই যে মা খোকা দেখ, আমি তোমায় বলি নি? খোকা আমাদের বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে।"

"সোনা আমার, গোপাল আমার, বংশধর আমার" বলিতে বলিতে বনবালা খোকাকে কোলে লইয়া চুম্বনে চুম্বনে কচি গাল দু'টি রঙাইয়া তুলিল। একখানি গিনি খোকার হাতে দিবা মাত্র, খোকা তৎক্ষণাৎ সেটির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল, নবীন চীৎকার করিয়া কহিল, "ও মা কি দুষ্টু ছেলে, এখনি গিলে ফেলবে, গলায় আটকে একটা কাণ্ড বাধবে।" বনবালা গিনিখানি সুরমার হাতে দিয়া কহিল, "বৌ তুমি বোন এটা আঁচলে বেঁধে রাখ।" খোকা তখন নিতান্ত অসম্মতি সূচক চীৎকার করিতে লাগিল, বনবালা এক হাঁড়ী রসগোল্লা আনিয়াছিল, নবীন তাহারই একটি বাহির করিয়া খোকার হাতে দিবামাত্র ক্রন্দন থামিয়া গেল, কেন না খোকা বুঝিল, পূর্ব্বেকার জিনিষটির অপেক্ষা এটির মিষ্টত্ব শতগুণে অধিক।

রামচন্দ্র কহিল, "তবে বৌদি, দীনের পর্ণকুটীরে যখন দয়া করে পায়ের ধুল দিয়েছ, তখন একটু বসবে চল। সত্যি বৌদি, আজ আমার এমন আনন্দ হচ্ছে, দেখ যদি তোমরা আমায় না তাড়াতে, এই আনন্দ আমরা সকলেই দিন রাত্রি ভোগ করতুম, এই এক সহরেই আমরা কত পরের মত বাস করছি, তোমাদের বাড়ীতে ঢোকবারও আর আমার অধিকার নেই, বিজয়ার দিন

প্রণাম করতে গিয়ে দরজার কাছ হ'তে ফিরে এসেছি, ভেতরে যাবার সাহসে কুলোয় নি, নবীন তবু লুকিয়ে মাঝে মাঝে আসে, তাই খবরটা পাই।"

কোমল-প্রাণা বনবালার দুই চক্ষু অশ্রুতে টল টল করিতে লাগিল, কিন্তু সে কি করিবে, দুরন্ত স্বামীর কথার বা কার্য্যের বিরুদ্ধে বাঙ্ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা তাহার মোটেই ছিল না।

৬

সে বৎসর কলিকাতায় নূতন প্লেগের উপদ্রব ও হুজুগ সহসা জাগিয়া উঠিল, এবং হুজুগটাই শত গুণে রোগটাকে অতিক্রম করিয়া বাড়িয়া চলিল। সমস্ত সহরে, অত্যন্ত বিপ্লব ও বিভীষিকা এক ভয়ঙ্কর খেলা খেলিতে লাগিল।

কলিকাতার বাহিরে যাহাদের বাসস্থান আছে, তাহারা সত্বর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইতে লাগিল, যাহারা পেটের দায়ে কলিকাতায় থাকিতেই বাধ্য, তাহারা পরিবারবর্গকে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পড়িয়া রহিল।

অনেক লোক, যাঁহারা বহুদিন হইতে কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন, পল্লীগ্রামে স্বীয় বাসভূমির স্মৃতি যাঁহাদিগের নিকট এক্ষণে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং 'পাড়া গাঁ' বলিয়া ঘৃণ্য, যে স্থান এতদিনে জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন ও গ্রাম্য পশুকুলের আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে, আজ দুর্দ্দিনে সহসা তাহার কল্যাণময়ী স্মৃতি আশ্রয়-দাত্রীরূপে মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং তিনিও অবিলম্বে তল্পী তল্পা বাঁধিয়া সপরিবারে গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজপথে অনবরত হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, জনস্রোতের ও গাড়ী পাল্কীর বিরাম নাই, গাড়োয়ানরাও সময় বুঝিয়া আট আনা বা এক টাকা ভাড়ার স্থলে পাঁচ সাত টাকা রোজগার করিতে লাগিল। পীড়ার সংখ্যা অল্প হইলেও "সহরের আজব গুজব" মুখে মুখে ক্রমশ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া প্রত্যেক সহরবাসীর হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র খোকাকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে যাওয়া পরিত্যাগ করিল, সুরমা যথাসাধ্য চারিদিক পরিষ্কার রাখিয়া, ধূপ ও গন্ধকের ধূনা জ্বালাইয়া ঐ দুর্দ্দান্ত রোগের কবল হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টায় রহিল। সুরমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরেন্দ্র তখন কলিকাতায় ছিলেন না, কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে বাঁকীপুরে বাস করিতে ছিলেন, সুতরাং নিতান্ত বন্ধুহীন অবস্থায় রামচন্দ্রের উদ্বেগের সীমা ছিল না।

স্বামী স্ত্রীতে একমনে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক খোকাকে বুক দিয়া ঢাকিতে লাগিল, কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর কাল রোগের চক্ষে সেই হাস্য-প্রদীপ্ত, ক্রীড়া চঞ্চল, দিব্য শিশুমূর্ত্তি বড় মনোহর লাগিল, সুতরাং একদিন সে সহসা জনক জননীর অতিরিক্ত সাবধানতার মধ্যেও খোকার কুসুম-সুকুমার দেহখানি অধিকার করিয়া বসিল। উৎকণ্ঠিতা সুরমার মুখখানি ভয়ে একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গেল। রামচন্দ্রও প্রথমে অত্যন্ত ভীত ও ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে সময়োচিত সাহসের আবশ্যকতা স্মরণ করিয়া সুরমাকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইল, "সুরমা জীবনের বড় কঠিন পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছে, দাদার

অভিসম্পাতই বা আজ ফলে, যাই হোক্, এখন উতলা হয়ো না, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোন হাত নেই, তা আমরা শুধু এতদিন ধর্ম্মপুস্তকেই প'ড়ে এসেছি, কিন্তু আজ তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি ও পাব। খোকার এই অসুখে আগে হ'তেই যদি আমরা হতাশ হয়ে দমে যাই, তা হ'লে উচিত মতো সেবাও হবে না. আর ওকে বাঁচাবার আশাও থাক্‌বে না, এখন এস, আমরা প্রাণপণ যত্নে ওর সেবা করতে থাকি, তার পর ভগবানের হাত, আমাদের সহায় সম্বল কিছুই নেই; কিন্তু দীনবন্ধু আমাদের সঙ্গ ছাড়েন নি, একথা ভুল না।"

অশ্রু মুছিয়া সুরমা দৃঢ়চিত্তে ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া স্বামীর সহিত পুত্রের সেবায় দেহ মন ঢালিয়া দিল, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা দারুণ অবসাদে ও ভয়ে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিতে লাগিল। তখন প্লেগের জন্য স্কুল বন্ধ হওয়ায় রামচন্দ্রও সর্ব্বদা খোকার জন্য ঔষধ আনা, ডাক্তার ডাকা ইত্যাদি করিতে পারিত। বাঁকীপুরে হরেন্দ্রকে টেলিগ্রাম করায় যখন হরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রামচন্দ্র একটু সাহস পাইয়া বাঁচিল। ডাক্তারও বলিলেন, "যদিও প্লেগ বটে, কিন্তু রোগের লক্ষণ সেরূপ ভয়ানক নয়. আর চার পাঁচ দিন যখন কেটে গেছে, তখন আর বেশী ভয়ের কারণ নেই।"

দেখিতে দেখিতে সত্যই ঈশ্বর-প্রসাদে খোকার রোগ ক্লিষ্টমুখ আবার হাসির প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবার সে মায়ের কোলে বসিয়া তাহার শীর্ণ বাহু দুটি বাড়াইয়া বিড়াল শিশুকে আদর করিতে লাগিল।

ভক্তি-গদগদ-চিত্তে তখন দম্পতী যুগল বিশ্ব-পিতার চরণে প্রণত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্য হইল। খোকা যখন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিল, সহসা একদিন ঝড়ের মত্তবেগে পাগলের বেশে মোহিত নবীনের সহিত আসিয়া রামচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে খোকার অসুখের সময় রামচন্দ্র ভ্রাতার নিকট স্বয়ং যাইতে সাহসী না হইয়া লোকমুখে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সে সংবাদের উত্তরে মোহিত মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া গিয়াছিল. ভ্রাতার সে নীরব প্রত্যাখ্যান রামচন্দ্রের মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়াছিল, বেদনার অশ্রু কোন বাধা না মানিয়া হতভাগ্য যুবকের দুটি গণ্ড ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন রামচন্দ্রের দুই হাত ধরিয়া মোহিত আর্ত্ত-কণ্ঠে কহিল "রাম রে, এতদিনে আমি সংসারকে চিনেছি, পরশু রাত্রে ভুপেনের প্লেগ হয়েছে, ভয়ে তোমার বৌদিরও জ্বর এসেছে, সেও শয্যাগত, ডাক্তার বল্‌ছে, খুব সম্ভব তারও ঐ রোগ হবে, পাড়া-প্রতিবাসী, এতদিন যাঁরা খুব আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠ ব্যবহার ক'রে এসেছেন, এখন আর তাঁরা কেউ আসছেন না, আমি ডাক্‌তে গিছলাম, সকলেই ব'লেছেন, তাঁদের নিজের ঘরেও ছেলেপুলে আছে, ইচ্ছা ক'রে কে এ ছোঁয়াচে রোগকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে। বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে—তাকে আন্‌তে পাঠালুম, বেহাই পাঠালেন না; বলেছেন, "বৌমা অন্তঃসত্ত্বা, জেনে শুনে প্লেগের ঘরে কেমন ক'রে পাঠাই?" জামাইকে পর্য্যন্ত একবার দেখতে আস্‌তে দেন নি। নীরদা ৮।৯ বছরের সেই একটুকু মেয়ে, রাঁধতেও পারে না, তবু যা হোক্ ক'রে করছে,

কা'ল তার পা পুড়ে গেছে, তা ভাই তুমি যদি এখন বৌমাকে নিয়ে না যাও তা হ'লে সপরিবারে আমি মারা যাই. আমি অনেক দোষ করেছি, আজ সব ভুলে যা ভাই, আমি মহাপাষণ্ড তাই তোর ছেলের অসুখ শুনেও একবার দেখতে আসি নি, খবরও নিই নি. বৌমা, লক্ষ্মী, আজ হতভাগাকে মাপ কর মা, চল একবার তোমরা না গেলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, বৌ বিছানায় শুয়ে শুয়ে 'ঠাকুরপোকে আন, ছোট বৌকে আন' করছে।"

রামচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই অসুস্থ প্রায়, কালের কবল হইতে সদ্যঃমুক্ত শিশু-সন্তান লইয়া সুরমার সহিত পুনরায় সেই সর্ব্বগ্রাসী রোগের সম্মুখে যাইতে প্রস্তুত হইল, এই দীর্ঘ তিনটি বৎসর পরে আজ রামচন্দ্র পুনরায় তাহার পরিত্যক্ত শৈশব-নিকেতনে পুনঃ প্রবেশের অধিকার পাইল, কিন্তু হায়, যে আজ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইবে, সে আজ উত্থানশক্তি রহিতা। বনবালা একবার মাত্র চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপো, ভাই এসেছ ? সুরমা লক্ষ্মী বোনটি এসেছিস ? আমার খোকাকে, আমার ভুপেনকে সবাই মিলে বাঁচাও." তার পর বনবালার আর সংজ্ঞা রহিল না। সুরমা একদিকে রন্ধন, আর একদিকে যথাসাধ্য রোগীদেরও সেবা করিতে লাগিল, রামচন্দ্র অবিশ্রান্ত অক্লান্তভাবে রোগীদের সেবায় নিযুক্ত রহিল, কিন্তু সকলকার প্রাণপণ যত্নেও ভুপেনকে কালের কবল হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিল না, মধ্যরাত্রে বালকের প্রাণবায়ু বাতাসে মিলাইয়া গেল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মোহিত উন্মাদের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া শোক-বিবশা রমণীর মতো ক্রন্দন করিতে লাগিল, দুই হাতে রামচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ওরে তোরও প্রাণও কি আমারই মতো কঠিন যে, আমায় এখনও মাপ করলি নে? তাই কি আমি ভুপেনকে হারালুম, এ কি কঠিন শাস্তি রে?"

অশ্রু-বিগলিতনেত্রে রামচন্দ্র কহিল, "দাদা, তুমি কি পাগল হয়েছ ? আমি কি কোন দিন তোমার ওপর রাগ করেছি ? অতো অস্থির হয়ো না বৌদিকে বাঁচাবার চেষ্টা যে এখনও করতে হবে।"

এই মর্ম্মভেদী দৃশ্যে সুরমার কোমল-হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তবু সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক অসীম ধৈর্য্যের সহিত বনবালার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, বনবালা ধীরে ধীরে প্লেগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল, বুঝি বা সে শুধু সুরমার অক্লান্ত সেবায় ও ঈশ্বর আরাধনে! পুত্রহীনা নারীর বক্ষের ও পঞ্জরের সমস্ত অস্থি চূর্ণপ্রায় হইলেও সে বাহ্য বিহ্বলতা প্রকাশ করিল না, অভাগিনীর স্নেহপূর্ণ হৃদয়, পুত্র-বিরহে আজ জ্বলিয়া পুড়িয়া গেলেও সে শোকে হা-হা-কার করিল না, ইহাকে সে বিধাতার অভিসম্পাত বুঝিয়া মনে মনেই কহিল, "হে দেবতা, পাপের শাস্তি যদি এতেই শেষ হয়, তা হ'লে বুক পেতে নীরবে এ আমি বহন করব, আর সবাইকে তুমি ভাল রেখ—সেই আবার, তোমার আশীর্ব্বাদ হবে।"

সে দিন যখন প্রভাতের বাল-রবি সমস্ত পৃথিবীখানিকে তরুণ কিরণে রঞ্জিত করিল, কলিকাতার অবিশ্রাম দিনের কোলাহল যখন ভাল করিয়া মাথা তুলিয়া জাগে নাই. পাখীর কাকলি তখনও দিগন্ত ছাপাইয়া আছে, প্রাতঃকালীন একটি মধুর ও পবিত্র শান্তি—দেবতার নীরব আশীর্ব্বাদের মতো চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে,সেই সময়ে নিদ্রাভঙ্গে ধীরে ধীরে বনবালা স্বীয় রোগশয্যার উপরে উঠিয়া বসিল. সুরমার ক্রোড় হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়া বুকে রাখিয়া কহিল, "আজ হ'তে এই আমার ভূপেন! ঠাকুরপো, আর তুমি এ বাড়ী হ'তে যেয়ো না ভাই, তা হ'লে এ ঘরে আর আমি টিঁকতে পারব না। ওগো, আজ তুমি একবার আগেকার মতো ঠাকুরপোকে বুকের কাছে টেনে নাও—আমি সব কষ্ট, সব ব্যথা ভুলে যাই।"

নীরবে মোহিত রামচন্দ্রকে বাহুপাশে বেষ্টন করিল. সকলকার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু আজি ইহা মিলনের আনন্দাশ্রু। তিনবৎসর পূর্ব্বে এই গৃহে যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের ধূমরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া সকলকার অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, আজকার এই পুণ্যময় প্রভাতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল, সুতরাং আজিকার নির্ম্মল সূর্য্যকিরণ শুধু গৃহের অন্ধকারকে বিনষ্ট করিল তা নয়, সকলকার হৃদয়ের জড়তা ও অশান্তি পর্য্যন্ত দূরে সরাইয়া ফেলিয়া অন্তঃকরণকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিল। আর এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে দুই ভ্রাতায় ভ্রাতৃত্বের মধুর আস্বাদ যেমন করিয়া বুঝিল, ভ্রাতাকে আজ যেমন আপনার, অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলিয়া জানিল. তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও জানিতে পারে নাই. বুঝি বা বিচ্ছেদ না ঘটিলে জানিতেও পারিত কি না সন্দেহ। এইরূপে আমরা দারুণ বিপদের মধ্যেও সেই করুণাময়ের প্রসন্ন মুখ ও কল্যাণ-হস্ত দেখিতে পাইয়া ধন্য হই।

শ্রীসরসীবালা বসু।

মহামুনি শাক্যসিংহ

ও

নির্ব্বাণ-তত্ত্ব

(শাক্যমুণি চরিত হইতে গৃহীত)

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার অমিত-প্রভ বিশাল জীবন, ভারতবক্ষে উদিত হইয়া বাসনা-তাপদগ্ধ সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে "নির্ব্বাণের" শান্তিসুধা-ধারা বর্ষণ করিয়াছিল, সেই মহাপুরুষ শাক্য সিংহ এই সময়ে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন সিংহলবাসীরা বলেন, খৃষ্ট শকের ৫৫৩ বৎসর পূর্ব্বে, চীন দেশীয়

ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা হইতে আরো অধিককাল কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতরা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট শকের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম। ললিত বিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে। বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শাক্য সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিকট রোহিণী নদীতীরে কপিলবস্তু নগর—ইহার বর্ত্তমান নাম কোহানা, কাশীর (উত্তর পূর্ব্ব) ৫০ ক্রোশ দূরে গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী। শাক্যসিংহ কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র। রাজা শুদ্ধোদন শাক্যবংশ সম্ভূত। শাক্য আভিধানিক শব্দ নহে। ইক্ষ্বাকু বংশ হইতেই শাক্য নামকরণ হয়। কথিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশের কোন পূর্ব্ব পুরুষ পিতৃ শাপ আক্রান্ত হইয়া গৌতম বংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে শাক (শেগুণ) বৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ বংশ শাক্য নামে অভিহিত হয়। বোধহয় এই কারণে বোধিসত্ত্বের নাম শাক্য সিংহ অর্থাৎ শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

মহাত্মা বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

এই ভারত ভূমি অতি পুণ্য ভূমি ও অপূর্ব্ব স্থান। এখানে কত মহাত্মারাই জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কত অমূল্য সত্যরত্ন দিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। যখন আর্য্য ঋষিগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতানে সমস্বরে সেই আদি দেব-দেবের স্তুতিবাদ করিতেন, আর সামগানে তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেন, তখনকার কি অপূর্ব্ব ভাব ছিল, স্মরণেও সুখোদয় হয়। ধ্যান-স্তিমিত লোচন সমাধিস্থ যোগিগণ একান্ত মনে পর্ব্বতকন্দর সরয়ূতটে ব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন হইয়া চিদানন্দ পুরুষের দর্শনে অপার যোগানন্দ সম্ভোগ করিতেন, তখন ভারতের কি সুখের দিনই ছিল ; কিন্তু সেই সকল পুরুষোত্তমের বংশধরগণ বংশ পরম্পরাগত ভাবে সেরূপ উচ্চগুণ সম্পন্ন হইতে পারিলেন না, তখন বৈদিক শুষ্কক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের সার বলিয়া মানিতে লাগিলেন, ব্রহ্মদর্শন, আত্মসংযম, যোগ, তপস্যা, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসার যাগ, যজ্ঞ, পশুবধ প্রভৃতি নিকৃষ্টভাব চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠ জাতির অভিমান আসিয়া সমাজ মধ্যে ক্রমে স্বার্থপরতার স্থান প্রাপ্ত হইল। সাধারণ জনগণ ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণেরাই মনশ্চক্ষুদাতা, তাঁহারা লোকদিগকে যে দিকে চালাইতেন লোকে সেই দিকেই চলিত, সুতরাং প্রাণহীন মৃতদেহের যেরূপ দুর্গতি হয়, আর্য্যধর্ম্মেরও তদ্রূপ দুরবস্থা ঘটিল। ভাবহীন কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম পরিণত হইল। বেদ সমুদায় জ্ঞানের চরম, মানবচিত্তে বেদ-বহির্ভূত আর জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যও নাই, এই মত দৃঢ় হইল। বাস্তবিক মানুষের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ঈশ্বর-দত্ত সহজ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও প্রেম-ভক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। বেদে বিশ্বাস না করিলেই নাস্তিকতা। তখন প্রতি গৃহস্থের গৃহে যজ্ঞার্থ পশুবধ হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে সোমরস পান ও মাংসাহার প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইল। যজ্ঞানুষ্ঠানের নামে

আর্য্য নরনারী বিলক্ষণ মদ্য মাংসের বশীভূত হইয়া আসুরিক ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। এই সূত্রে আর্য্য বংশীয়েরা অথবা আর্য্যধর্ম্ম হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বিধাতার রাজ্যে চিরকাল পাপ অন্যায় অত্যাচার চলে না। যিনি ভুবন বিজয়ী বিশ্ববিধাতা, তিনি নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া এই মানবজীবনের পরিচালক হইয়া আছেন। যিনি মানবজীবনের আধ্যাত্মিক গতি ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুগে যুগে কত প্রকার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি কি আর ভারতের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারেন ?

এই সময়ে বাস্তবিক একটা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জনসমাজের দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু বিশুদ্ধীকৃত করিবার জন্য এক বজ্রসম মহাতেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই বিপ্লব দূর করিবার জন্য মহাশক্তিশালী শাক্য ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। শাক্য যথার্থ অগ্নিময় তেজোময় জীবন লইয়া তৎকালে উপস্থিত হন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড আলোক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসাড়তার মধ্যে পরমবৈরাগ্য, আসক্তির মধ্যে পরম নির্ব্বাণ, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বিপুল দয়া, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার মধ্যে বিনয় ও আত্ম-বিনাশরূপে অবতীর্ণ হইয়া, অধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে আসিলেন। ইনি জ্বলন্ত অগ্নি, সাক্ষাৎ মহাশক্তি, ইনি জীবের নিকট প্রত্যক্ষ দয়ার অবতার।

মহাত্মা বুদ্ধদেবের বিস্তৃত জীবনী এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বহু ভাষায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাহা অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। আমরা তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার পবিত্র নাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বের উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব। যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাহারও প্রাণে তাঁহার জীবনী পাঠ করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে। *

নির্ব্বাণ-তত্ত্ব (সংক্ষিপ্ত-সার)

পূর্ব্বতন আর্য্য-পণ্ডিত, কবি, পতঞ্জলি, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানবজীবনের চরমগতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার মহাপুরুষ ঈশা, চৈতন্য, নানক সকলেই জীবের মুক্তি লাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরমগতি, ইহা একতানে জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তি-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুগত মহর্ষি শাক্যও মানবজীবনের ঐরূপ আদর্শ প্রতীতি করিলেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ ও সংসারাসক্তি রিপুপরতন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম, শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে এই অবধারণ করিলেন, অগ্রে

* স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ-সঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষায় "শাক্যমুনি চরিত," কলিকাতা ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিব। সমস্ত জীবের ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার জন্য মুক্তির পথ প্রদর্শন করিব, * * * * তিনি দেখিলেন, সমুদায় সংসার নিয়ত তৃষ্ণানলে পুড়িতেছে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রীতৃষ্ণা, কাম তৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও সুখ তৃষ্ণায় অস্থির; তাহারা এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে নিরন্তর জ্বলিতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কোথায়? কিরূপে উহা উৎপন্ন হইতেছে? *** * * চিত্ত হইতে সকল বিকার তিরোহিত হইলেই দুঃখ নিরোধ হয়। এই দুঃখ নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। কিন্তু আমিত্বরূপ প্রদীপ থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা বেদনা, সুখদুঃখানুভব, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা ইন্দ্রিয়-বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমিত্ব জ্ঞান বিনষ্ট হইলে তাবৎ দুঃখের মূল উৎপাটিত হইয়া গেল।

মহামুনি বুদ্ধ নির্ব্বাণ বিষয়ে বৈদিক পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল। যাহা হউক, ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র কেমন এক সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে। প্রসিদ্ধ থিয়োলোজিয়া জার্ম্মেণীকার প্রণেতা সমুদায় পুস্তকে "আমিত্ব-আমার আমাকে" এবং 'আমিত্ব বিনাশ" ইহা লইয়া সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহংজ্ঞানেই অধর্ম্ম এবং তদভাবেই ধর্ম্ম, আমিত্ব পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের উদয়। এই অহং বিনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশের নামই নবজীবন বা নূতন মানবের জন্ম, অথবা দ্বিজাত্মা হওয়া। এই অহং ভাবই স্বর্গচ্যুতি এবং তাহার বিনাশই স্বর্গ লাভ। এই অহন্তাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা, তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্যতা। এই অহংভাবেই ঋষিদিগের যোগভঙ্গ এবং অহঙ্কার বিনাশই ব্রহ্মযোগ। ঈশার সমস্ত সাধনার ফল আমিত্ব বিনাশ। * * * * এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। তিনি বলিতেন না, প্রচার করিতেন না; সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিত।

মনোরমা

—•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের সংক্ষিপ্ত সার)

[প্রৌঢ় রমাকান্ত বাবু, একমাত্র অনিন্দ্য-সুন্দরী কিশোরী কন্যা মনোরমাকে কথঞ্চিৎ ইংরাজী বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সঙ্গে, তাহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট থাকায় কিছু সঙ্গীত করিতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পিতামাতার অনবধানতায়—অর্থাৎ যথোচিত অনুসন্ধান না লইয়া চতুরা ঘটকী সৌরভীর ছলনায় এবং জামাতা ধনবান ও রূপবান জানিয়াই দুশ্চরিত্র সন্তোষকুমারের সহিত মনোরমার বিবাহ দিয়া নিজেরাও যেমন অসুখী হইলেন, কন্যাকেও ততোধিক দুঃখিনী করিলেন। "স্বামী যেমনই হউন, স্ত্রীর পক্ষে তিনি পরমগুরু

বার বার চেষ্টা করিয়া মনোরমা আপনার মনকে তাহা স্বীকার করাইতে পারে নাই, কেননা, বাল্যকাল হইতে তাহার পিতার নিকট তাহার শিক্ষা অন্যরূপ। রমাকান্ত বাবু অত্যন্ত সাধু স্বভাব, তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা। মনোরমাও পিতার ন্যায় লোকের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। পিতারই ন্যায় সেও ব্যভিচারী ও সুরাপায়ীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত। উশৃঙ্খল-স্বভাব সন্তোষ, বিধবা মাতৃদেবী অন্নপূর্ণাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিত না। প্রথমা পত্নী—অমরনাথ বাবুর কন্যা সুশীলার প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন—অত্যাচার করিয়া তাহাকে পিত্রালয় পাঠাইয়া,গোপনে মনোরমাকে বিবাহ করে। অন্নপূর্ণা ইহা অন্যায় জানিয়াও অস্বাভাবিক পুত্র-বাৎসল্যে এই বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সন্তোষ কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী ও ভগ্নীপতি নগেন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ ভয় ও মান্য করিত। হিরণ্ময়ী বিবাহ-উৎসবে আসিয়া গোপনে মাতাকে মিষ্ট-ভৎসনা জানাইতে ত্রুটি করে নাই, এবং নববধূ মনোরমাকে বুকে ধরিয়া বেদনায় সহানুভূতি জানাইয়াছিল। সহানুভূতির নিগূঢ়-নিয়মে একদিন হিরণ্ময়ীর সহিত মনোরমা সুশীলার নিকট দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়া স-পত্নী সত্বেও সম-দুঃখিনী হৃদয় দু'খানিতে কি বিনিময় হইয়াছিল. তাহা হৃদয়-দেবতাই জানেন। শেষ যখন সন্তোষের অত্যন্ত বাড়াবাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িল, তখন হিরণ্ময়ী ও নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণাও তীর্থদর্শন মানসে এবং বধূ মনোরমারও স্বাস্থ্যাদির উন্নতি উদ্দেশ্যে পুত্র ও পুত্রবধূ সহ প্রথমে কাশীতে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও সন্তোষের কুসঙ্গী জুটিল ও দুষ্কার্য্যের স্রোত চলিতে লাগিল দেখিয়া এলাহাবাদে আসেন। সেখানেও কোন সুবিধা না দেখিয়া জব্বলপুর আসিলেন। জব্বলপুরে আসিয়া মনোরমার একটি সমবয়স্কা সঙ্গিনী জুটিল। তাহার নাম কামিনী, কিন্তু সে সামান্য স্বর্ণকার-পত্নী। তাহাকে পাইয়া ব্যথিতা মনোরমা তাহার ও তাহার শিশু পুত্রটির প্রতি কত আদর সোহাগ দেখাইয়া হৃদয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিল। এখানে আর একটি ঘটনা ঘটে। মনোরমার পিতার ভগ্নী সদৃশা বিধবা ক্ষীরোদাসুন্দরীর পুত্র বিনয়কুমার জব্বলপুরে শিক্ষকতা করিত। মনোরমারা জব্বলপুরে আসিলে মনোরমার মাতা বিনয়ের মাতা ক্ষীরোদাকে পত্র লিখিয়া মনোরমার সহিত দেখা সাক্ষাত ও আলাপ করিতে অনুরোধ করেন। বিনয় পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় মনোরমাদের পাশাপাশি বাড়ীতে বাস হেতু উভয়ের মধ্যে সখ্যতা জন্মে। এমন কি, বিনয়ের মাতার মনে মনোরমাকে বধূ করিবার সাধ পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু নিজেদের অবস্থা তেমন ভাল নয় বলিয়া, সে-কথার কোন প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই। অনেকদিনের পর বাল্য-সঙ্গী মনোরমার দেখা পাইয়া বিনয় অত্যন্ত সুখী হইল বটে, কিন্তু তাহাদের দাম্পত্য-প্রেমে বিষম-বৈসম্য দেখিয়া বিনয় ততোধিক অসুখী হইল এবং পরস্পরের মধ্যে একটা সমবেদনার ভাব জাগিয়া উঠিল। অবিবাহিত বিনয়কুমার, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদার প্রকৃতির, এবং স্ত্রী জাতির উন্নতি ও সেবা পরায়ণ—বহুগুণান্বিত সুন্দর যুবক। একদিন খৃষ্টীয় প্রচারিকা মিস্ বুরেশের সহিত মনোরমার নিকট ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিনয় যে সকল কথা-বার্ত্তা বলে তাহা শুনিয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিল। তা ছাড়া বিনয়ের সহিত আলাপ ও সৎপ্রসঙ্গে মনোরমার অবসন্ন হৃদয় ধীরে ধীরে যেন সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, এমন সময় তথায় প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় মনোরমাদের কলিকাতায় ফিরিবার কথা চলিতে লাগিল]

১৩

কামিনী মনোরমার চুল বাঁধিয়া দিতেছে। মনোরমা বড় একটা চুল বাঁধিত না,.কিন্তু এখানে আসিয়া, কামিনীর হাতে তাহার পরিত্রাণ নাই,

কামিনী সেই রেশম-চিক্কণ ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলের রাশি সম্বন্ধে বিনাইতে বিনাইতে সৃষ্টিকর্ত্তার নিপুণ হস্তখানির বার বার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না, মনোরমা হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি কবি হ'তে; তা হ'লে আমার চুলের সম্বন্ধে কবিতা লিখে ফেলতে।"

কামিনী বলিল, "সত্যি বৌরাণি;আমি যদি দাদাবাবু হ'তাম, তা হ'লে এই চুলের ফাঁসি গলায় লাগিয়ে মরতাম।" কামিনী সন্তোষকে দাদাবাবু বলিত, মনোরমা এ রহস্তের অর্থ না বুঝিয়া কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল "মনে ক'র, তাই হয়েচ আচ্ছা, ভালবাসলে চুলের ফাঁস গলায় লাগিয়ে কি করে মরতে হয়, আমায় একবার দেখিয়ে দিতে পার ?"

কামিনী হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, এমন সময় সন্তোষ আসিয়া যেমন গৃহপ্রবেশ করিবে কামিনীও উর্দ্ধশ্বাসে অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। মনোরমা হাসি চাপিয়া ডাকিল, "আস্তে কামিনী, হোঁচট খেয়ে পড়বে, নয় তো ফুলগাছে আঁচল বাধবে।" সন্তোষ খুসী হইয়া কহিল, 'ঠিক বলেছ, উনি যেন রসগোল্লা, আমি যেন দেখিবামাত্র টপ্ ক'রে খেয়ে ফেলব, রকম দেখ না, পালাবার দৌড় কি ? আচ্ছা মনোরমা, কামিনী আমায় দেখে অতো লজ্জা করে কেন ? তোমার সঙ্গে অতো বন্ধুত্ব,আর আমি বন্ধুরই তো স্বামী ?"

মনোরমা একটু গম্ভীর ভাবে কহিল, "বৌ মানুষ, পরপুরুষের সঙ্গে কথা কবে কেন ?"

"অবশ্য না কইতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্বস্থলে দোষ কি ?"

মনোরমা কহিল, "আমি যদি তার স্বামীর সঙ্গে কথা না বলি, ও কেমন করে তা হ'লে তোমার সঙ্গে বলে ?"

সন্তোষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে ওর তুলনা ? তুমি একটা জমীদারের স্ত্রী হয়ে একটা নগণ্য স্যাকরার সঙ্গে কথা বললে আমার মুখ হেঁট হ'ত পারে না ? অথচ আমার সঙ্গে কথা বললে কামিনীর কিছু গৌরবের হানি হবে না ?"

উদ্যত-ফণা ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া মনোরমা কহিল,"সহস্রবার গৌরবের হানি হতে পারে। যারা নারীকে শুধু বিলাসের জিনিষ ব'লে মনে করে, নারীর ব্যক্তিত্ব বা নারীত্বের দিকে সম্ভ্রমের সহিত দৃষ্টিপাত করে না,তাদের সঙ্গে কোনও নারীরই কথা বলা উচিত নয়।"সন্তোষ পূর্ব্বে কোনও দিন মনোরমাকে এরূপ সতেজে কথা কহিতে শোনে নাই, সুতরাং প্রথমে সে একটু স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরক্ষণে কহিল, "তোমার বড় স্পর্দ্ধা যে, আমার মুখের ওপর জবাব দিতে শিখচ দেখছি। নিজের ভাল চাও তো মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে থাক, নইলে লাথি মেরে দূর ক'রে দেব।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল, মনোরমা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী পিঞ্জরের ফাঁদ হইতে বাহিরের সুনীল আকাশের দিকে,

ঘনচ্ছায়াতরু-শ্রেণীর দিকে যেমন লুব্ধদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, বাহিরের পৃথিবীর দিকে আজ মনোরমা তেমনি করিয়া দৃষ্টিপাত করিল। আজ তাহার যেন নূতন করিয়া নিজের বন্ধনদশার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। মানুষ যতক্ষণ নিজের বন্দীত্ব বিষয়ে অজ্ঞাত থাকে, ততক্ষণ সে, সে অবস্থা পীড়াদায়কা বলিয়া মনে করে না, কিন্তু জানিবামাত্রই সে দশা অত্যন্ত অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। মনোরমার বুকের মধ্যে বেদনার রাশি ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার নিঃশ্বাসকে পর্য্যন্ত যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, নয়ন কিন্তু অশ্রু শূন্য! মনোরমার মনে পড়িল, কবি গাহিয়াছেন, "মরণ যে, তুঁহ মম শ্যাম সমান" আজ সে সেই মরণেরই শ্যাম-স্নিগ্ধ ক্রোড় পরম রমণীয়, চরম বাঞ্ছনীয় বলিয়া বার বার মনে করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। মনোরমা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, সন্তোষ। সে এইমাত্র মদ খাইয়া আসিয়াছে. তাহার চিত্ত প্রফুল্ল. চক্ষু ঈষৎ লাল হইয়াছে। সন্তোষ মনোরমার হাত ধরিয়া টানিয়া খাটের উপর বসাইয়া কহিল, "আমার উপর রাগ করেছ মনোরমা! বল, আমার মাথা খাও।"

মনোরমা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "রাগ কেন করব? রাগ করার আমার দরকার?" সন্তোষ মনোরমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "এই তো লক্ষ্মীটির মতন কথা বলছ। বাড়ী গিয়ে তোমায় আমি এক জোড়া. হীরের নতুন ব্রেসলেট গড়িয়ে দেব।"

মনোরমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্তোষ কহিল, "মনোরমা. আমায় একটা জিনিষ ধার দেবে?"

"কি জিনিষ?"

"এই তোমার বালা দু-গাছা। কলকাতায় গিয়েই আমি আবার নতুন গড়িয়ে দেব।"

মনোরমা কহিল, "আমার হীরের বালার দাম প্রায় দু'হাজার টাকা, এত টাকার জিনিষ তুমি কি করবে? ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস না ক'রে আমি দিতে পারিনে, তিনি বার বার ক'রে লিখচেন, যে তাঁকে না জানিয়ে যেন কোনও জিনিষ তোমায় না দিই।"

উত্তেজিত হইয়া সন্তোষ কহিল, "বটে? জিনিষ আমার, আমি চাইচি. তুমি দাও। তোমার বাপের বাড়ীর জিনিষ তো নয়। তোমার ঠাকুরঝিরও নয়। তাঁর হুকুম বড়, না আমার কথা বড়?" অপেক্ষাকৃত নরম সুরে

সন্তোষ পুনরায় কহিল, "মনোরমা, এখানে যে দেনা হয়েচে, তা শোধ না করলে. আমি এ দেশ ছেড়ে যাই কি ক'রে ?"

মনোরমা নিরুত্তরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সন্তোষ কাপড় ধরিয়া টানিয়া কহিল, "কথার জবাব দিয়ে যাও, আমার বড় দরকার, বালাজোড়া দাও, তাতে তোমার ভালই হবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মনোরমা কহিল, "ভাল আমার সেই দিন হবে, যে দিন আমি মরব।"

সন্তোষ কহিল, "জ্যাঠামি এখন রেখে দাও; বালাটা দাও, দেরী কোঁর না।"

মনোরমা আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া কহিল," আচ্ছা ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখি।"

"এত বড় স্পর্দ্ধা, দেবে না" বলিয়া সন্তোষ সজোরে মনোরমার দুই হাত হইতে বালা টানিয়া খুলিয়া লইয়া, এমন ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিল যে, হতভাগিনী টেবিলের কোণায় কপাল ঠুকিয়া মেজেতে পড়িয়া গেল, সন্তোষ ফিরিয়াও চাহিল না, গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া অন্নপূর্ণা ও পিয়ারীর মা দৌড়িয়া আসিয়া দেখে, মনোরমা মেজেতে লুটাইতেছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া শশব্যস্তে. বধূকে কোলে তুলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

১৪

"মনু, মা কেমন আছ" ক্ষীরোদার স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনোরমা সহসা বিছানায় উঠিয়া বসিল, ক্ষীরোদা খাটের উপর বসিয়া কহিলেন, "থাক মা, উঠতে হ'বে না, শরীর ভাল নেই, একটু বিশ্রাম কর। আজ বিনয়ের ছুটি আছে; একবার তোমায় দেখতে এলুম, তোমরাও তো শীগগির যাচ্চ, আবার কবে দেখা হয় ঠিক নেই।" ক্ষীরোদা সস্নেহে মনোরমার মাথায় হাত বুলাইয়া আবার কহিলেন, "মা মনু, দুটো কথা বলি, মনে কিছু করিস না, শরীরটা পাত ক'রে ফেলেচিস, রং তো কালী হয়ে গেছে, এত ভাবলে দেহ যে মাটী হয়ে যাবে ; যেতে তো বসেইচে। তোর মুখ চেয়ে তোর বাপ মা বেঁচে আছেন, তাঁদের কথা একটু ভাবিস।"

এমন সময় বিনয় আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। মনোরমাকে দেখিয়া কহিল, "এ কি, ক'দিন আমি আসিনি, এর মধ্যে চেহারা এত শুকিয়ে গেছে। ভিতরে কোনও অসুখ হয়নি তো ?"

"ক'দিন থেকে গায়ে বড় ব্যাথা হয়ে জরের মতন হচ্ছে,তাই জন্মে স্নানাহার করিনি," বেশী কিছু না বলিয়া মনোরমা পিসিমার পায়ের ধূলা লইয়া বিনয়কে প্রণাম করিল।

বিনয় কহিল, "সময়টা ততো ভাল নয়, বিশেষ সাবধানে থেক। আর তোমরা তো যাচ্ছই।"

ক্ষীরোদা কহিলেন, "মনু, শুনলুম, সন্তোষ তোমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তাতে তুমি বড় আঘাত পেয়েচ। আমার বোধ হয়, তোমার মন সে জন্ম যথেষ্ট তেতো হয়ে গেছে, কিন্তু মা, আমার একটি কথা শোন, মেয়ে মানুষের স্বামীর চাইতে বড় দেবতা নেই, সন্তোষ মাতাল, দুশ্চরিত্র, তা জানি, তবু মা তোমার কাছে সে পরম গুরু। তাকে মনে মনে ক্ষমা ক'রে ভালবেস, ভক্তি কোর, তাতেই তোমার ইহ-পরকালের মঙ্গল হবে।"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া, দুকূল প্লাবিত করিয়া রুদ্ধ স্রোত ছুটিয়া চলিল। মনোরমা এতদিন হৃদয়ের সহিত নীরবে গোপনে যথেষ্ট সংগ্রাম করিয়াছে, আজ পিসিমার প্রাণস্পর্শী সান্ত্বনাবাক্যে সে আত্মহারা বিবশা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিসীমা সস্নেহে মনোরমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের নিকট টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কচি ফুলের মতো হৃদয়ে তুমি যে ব্যাথা পাচ্ছ তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মা তুমি বুদ্ধিমতী, ভেবে দেখ, জগতে সবাই নিজের স্বার্থ দেখে, কিন্তু স্বার্থ বিসর্জ্জন ক'রে যে ভালবাসে, তার মহত্ত্ব কতখানি ?"

মনোরমা করুণ-কণ্ঠে কহিল, "পিসীমা, আমায় মাপ করুন। মৃত্যুই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার মনের বল নেই পিসীমা, আমি আর সহ্য করতে পারি না। মাকেও লিখবেন আমায় যেন ক্ষমা করেন।"

সেই কয়টি করুণ কথা, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের মতো বিনয়ের বক্ষে গিয়া বাজিল। সে ক্ষণকালের জন্ম চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার মনে হইল, বঙ্গ-সংসারের কত রমণীর প্রাণের ভাবা এই করুণ বাণী! বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষীরোদা বুঝিলেন, মনোরমার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছে। কহিলেন; "দেখ মা, সহ্য করতেই স্ত্রীজাতির জন্ম। হিন্দুর মেয়ে আমরা, কর্ম্মফল মানি। পূর্ব্বজন্মে অবশ্য কোনও পাপ করেছিলে, যার জন্মে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয়েছ। কিন্তু এ কর্ম্মের ক্ষয়ে তা লাভ করতে পার।

আশায় বুক বাঁধ মা, একদিন তোমার স্বামী তুমিই ফিরিয়ে পাবে। আমাদের দেশ সতীর গৌরবে ধন্য, আশীর্ব্বাদ করি মা, সীতা সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে তোমার মনে অসীম ধৈর্য্য আসুক।

বিনয় অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "মা তুমি রাগ কোর না, সীতা সাবিত্রীর তুলনা এখানে মা যত অনায়াসে দিচ্ছ, ততো সহজ ব'লে তো আমার মনে হয় না। সত্যবান বা রামচন্দ্রের মতো পতি, নল বা শ্রীবৎসের ন্যায় স্বামী যদি মেয়েরা পায়, সকল দারিদ্র্য. সকল লাঞ্ছনা তা হ'লে তারা অঙ্গের ভূষণ করে নিতে পারে, যে সকল সতী আমাদের দেশে প্রাতস্মরণীয়া ও বরণীয়া হয়ে রয়েছেন. স্বামীর প্রণয়ে তাঁরা কোন দিন বঞ্চিতা ছিলেন না, এটা তোমার অবিদিত নেই?"

মনোরমার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। ঠিক এই কথাই সে-যে কত দিন ভাবিয়াছে। যখনি সে সতী নারীগণের পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়াছে, তখনি সে মনে করিয়াছে, স্বামীর পূর্ণ নির্ম্মল প্রণয় লাভ করিলে অন্তঃকরণে যে অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হয়, সেই অমিতবলের দীপ্ত চরণতলে, জগতের সকল প্রকার অত্যাচার—সকল প্রকার দুঃখ দৈন্য ধূলার মত গুঁড়া হইয়া যায়।

ক্ষীরোদার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। এই বালিকাকে তিনি আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন। তাঁহার নিজের তরুণ জীবনের কথা মনে পড়িল। তাঁহার স্বামীও একদিন উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "মনে কর, তোমায় আমি আর ভালবাসি না, তা হ'লে তুমি কি কর?" এই কথা ক্ষীরোদার বুকে যেন শেলের মত বাজিয়াছিল. কোনও কথার তিনি উত্তর দেন নাই, দুই চক্ষে কিন্তু বাণ ডাকিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিলেন, যে মুহূর্ত্তে আমি জানিব, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াইব।" অথচ আজ তিনি স্বচ্ছন্দে. অনাদৃতা উপেক্ষিতা বালিকাকে আদর্শ সতী নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বড় মানুষের ছেলে সঙ্গ দোষে অনেকেই এ রকম বিগড়ে যায়, আবার শুধরে যাবে। তুমি কিছু ভেব না মনু, কলকাতায় গিয়ে মা বাপের কাছে গেলে তোমারও মনটা ভাল থাকবে। যাচ্ছ, ভালই হচ্চে। সদা সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখ মা।"

বিনয় দুই বাহু নিজের প্রশস্ত বক্ষে বাঁধিয়া, নতমুখে গৃহের এ প্রান্ত হইতে

ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল। গৃহ নীরব, কাহারও মুখে কথা নাই। কতক্ষণ পরে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বিনয় কহিল, "মা, তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যত দিন বাঁচব, যত দিন দেহে রক্ত বিন্দু থাকবে, নারীজাতির কল্যাণ সাধনই প্রাণপণে করতে চেষ্টা করব। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, আশ্রিতের প্রতি, এই কঠোর নির্য্যাতন যতটুকু দূর করতে পারি তার চেষ্টাই আমার ব্রত রইল।"

বিনয় মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল, ক্ষীরোদা সস্নেহে পুত্রের ললাট চুম্বন করিলেন, ইতি মধ্যে অন্নপূর্ণা গৃহ মধ্যে আসিয়া, এ পবিত্র দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল, নয়নপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, মনোরমারও দুইটি নয়ন সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে আরতির যুগলপ্রদীপের মতো জ্বলিয়া উঠিল।

১৫

স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে চারিদিক ঝল-মল করিতেছে, মনোরমার রক্তিম কপোলে, নিটোল মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দুগুলি সেই উজ্জ্বল-কিরণ-সম্পাতে সমধিক উজ্জ্বল দেখাইতেছে, মিস বুরেশ মনোরমার কটি বেষ্টন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, "মনোরমা, প্রভুর প্রেম স্মরণ ক'রে নিজের দুঃখ বিস্মৃত হও। আমি জানি, তোমরা আত্মহত্যাকে বড় সহজেই বরণ কর, কিন্তু সে কাজ কোর না, তোমার জীবন, জীবন-দাতারই কাজে উৎসর্গ কর। এস আমার সঙ্গে, আমি তোমায় ভগ্নীর মতন ভালবাসি, তোমার মনোবেদনা আমার অন্তঃকরণে বড় বাজছে, মনোরমা—

মনোরমা কাতরকণ্ঠে কহিল, "আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ! আবার এ জীবনে দেখা হবে কি না জানি না। আমি আপনাকে সদা সর্ব্বদা চিঠি লিখব, আপনিও অবশ্য লিখবেন। হয় তো কখনও আপনার নিকট আমি আসতেও পারি।" কথাটা বলিয়াই মনোরমার স্মরণ হইল, সেই না নিজে একদিন বিনয়ের কাছে বলিয়াছিল, সুযোগ পাইলে মেয়েরা প্রচারিকাদের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, এখন সে কিনা নিজেই উহা গ্রহণ করিবার আভাস জানাইতেছে। মনোরমার তখন মনে পড়িল, মানুষের বোধ বা বিচারশক্তি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিয়তই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু উহা অস্বাভাবিক নয়। সে জন্য মানুষের চিত্তকে চঞ্চল বা অস্থির বলিয়া দোষারোপ করা চলে না।

মিস বুরেশ একখানি মরক্কো বাঁধাই, ক্ষুদ্র বাইবেল পুস্তক মনোরমার

হাতে দিয়া কহিলেন, "আমার প্রীতি-নিদর্শন এই পুস্তক তোমার হাতে দিচ্চি, তুমি ইহা অনুরাগের সহিত পাঠ কোর, আমি প্রভুর নিকট সর্ব্বদাই তোমার আত্মার উন্নতির জন্য, কল্যাণ প্রার্থনা করব। কলিকাতায় আমি গ্রীষ্মাবকাশে যাব মনে করেছি, সেই সময় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

মনোরমা ধন্যবাদ জানাইয়া নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি হীরক খচিত আংটি খুলিয়া মিস ব্রেশের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল, মিস্ অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন,"মূল্যবান জিনিষ আমায় কেন দিচ্চ ভগ্নি! আমি বড় লজ্জিত হচ্চি।"

মনোরমা কুমারীর হাতখানি চুম্বন করিয়া কহিল, "কিসের লজ্জা! আপনি আমায় ছোট ভগ্নীর মতন মনে করবেন, আমার উপহার অতি সামান্য, কিন্তু আমার প্রাণপূর্ণ স্নেহ দ্বারা ঐটি আপনার স্নেহের চক্ষে অবশ্য অসামান্য বলেই মনে হবে।"

"নিশ্চয়" বলিয়া কুমারীও মনোরমার কপোলে চুম্বন করিলেন। যেন দুটি গোলাপ সংযুক্ত হইল। কুমারী বিদায় লইলেন, এই সময় খোকাকে কোলে লইয়া কামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

খোকার হাতে একটি অতি সুন্দর ফুলের তোড়া, কামিনী গৃহে প্রবেশ করিয়াই খোকাকে কহিল, "মাসীমার হাতে ফুল দাও খোকা" খোকা কিন্তু অসম্মতিসূচক চীৎকার করিয়া দুই হাতে তোড়ার ফুলগুলি চাপিয়া ধরিল, কামিনী ফুলগুলিকে শ্রীহীন ও বৃন্ত-ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া দুঃখে ও বিরক্তিতে খোকাকে তিরস্কার করিল, সে আজ কত যত্নের সহিত এই ফুলগুলি সংগ্রহ করিয়া তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছে, তাহার যত্নের উপহার সামগ্রী দুষ্ট শিশুর হস্তে নষ্ট হয় দেখিয়া সে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেল, মনোরমা হাসিয়া কহিল, "কামিনী, টানাটানিতে ফুলগুলি নষ্ট হবে, আমি ভুলিয়ে নিচ্চি, খোকাকে কাঁদিও না।"

মনোরমা নিজের কণ্ঠ হইতে হার ছড়াটি খুলিয়া খোকার সামনে ধরিল, খোকা সহজেই নূতন জিনিষটির প্রতি আকৃষ্ট হইল, কামিনী খোকার শিথিল মুষ্টি হইতে ফুলের তোড়াটি লইয়া মনোরমার হাতে দিল, মনোরমা খোকার গলায় হার ছড়াটি পরাইয়া দিয়া কহিল, "কামিনী, খোকাকে আমি এই হার দিলাম, যখন খোকা বড় হবে, আমার কথা ওকে বোল।" মনোরমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, মনোরমা খোকাকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিল।

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কাল তোমরা চলে যাবে, আমার

বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে, আমি মা বোন জানি না, তোমাকে আমি বড় বোনের মতন পেয়েছিলাম, কেমন ক'রে আমি থাকব।" মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মনের সুখে থাক. স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরকন্না কর, প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হলেও দুদিন পরে সয়ে যাবে, আমি কিন্তু তোমাদের নিয়ে প্রবাসে বেশ ছিলাম, এই স্মৃতিই আমাকে আবার ব্যথার মধ্যে আনন্দ দেবে। যেখানেই থাকি, তোমাদের জন্য সর্ব্বদাই আমি ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করব।"

কামিনী কহিল, "বৌরাণি, আপনি অতো দামী সোনার হার আমাদের দেবেন না, আমরা গরীব, আমাদের ও শোভা পাবে না। আপনার শাশুড়ী জানলে, রাগ করতে পারেন, উনিও বকবেন। মনোরমা কহিল, "সে ভার আমার, কত মূল্যবান গহনা আমি স্বামীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য খুলে দিচ্ছি, আর এক ছড়া হার আমি যেখানে প্রাণ থেকে উপহার দিয়ে প্রীতি পাচ্ছি, তা দেবার আমার অধিকার নেই? তোমার স্বামীকে আমার নাম ক'রে বোল, এতে তাঁর বকবার কোনও কারণ নেই।"

এমন সময় চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া একদল বালিকা গাহিয়া উঠিল,

শ্যামলিয়া!
ঝুলন ঝুলত রাজকুমারীয়া—
নাচত বোলত,
সখী সব আওত
হিলতে ডোলতে রাধাপিয়ারীয়া
শ্যামলিয়া!

মনোরমা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে সুবৃহৎ অশ্বত্থগাছে একটি দড়ির দোলনা টাঙান ছিল, মাঝে মাঝে একদল মেয়ে আসিয়া দোল খাইত, একজন করিয়া দোলনায় উঠিত, একজন তাহাকে দোল দিত. অপর সকলে সমস্বরে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র ভাষার গান করিত, মনোরমা সে দৃশ্যে পরম কৌতুক অনুভব করিত। গানের দুই এক ছত্র বুঝিতে পারিত, কিন্তু সুর টুকু তাহার বড় ভাল লাগিত। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

দাসের আত্ম-কথা ।

(শেষাংশ) *

ব্রহ্মমন্দির হইতে কলিকাতায় আসা,—যে কারণে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া, চলচ্ছক্তি-হীন পত্নী সহ কলিকাতায় আসিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিতে হইল পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ধর্ম্ম-বন্ধু বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ যখন আমাকে মাসিক একটি নির্দ্দিষ্টহারে বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বিশ্বাস বিরুদ্ধ হওয়ায় আমি তাঁহার ঐরূপ ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হই, এ কথাও সংক্ষেপে বলিয়াছি। কিন্তু তখন আমার বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দিই নাই, এখন তাহা দিব। সাত বৎসর ব্রহ্মমন্দিরে থাকার পর, তাঁহার ঐরূপ ব্যবস্থার আমি কোন আবশ্যকতা মনে করি নাই, কেবল তাহা নহে, এই সূত্রে দেশের একটি সাধারণ ধর্ম্ম সাধন ক্ষেত্র—যে স্থান বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যতে প্রত্যেক সভ্যই আপনার বলিয়া মনে করিবেন, তাহা ব্যক্তিগত কর্ত্তৃতাধীন হওয়া কখনই উচিত নয়, তখন এই মূলসূত্রটি আমার মনে অনুমিত হইয়াছিল।

বাবু লক্ষ্মচন্দ্রের আশের সহিত আমার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নহে, কোন দিন

---

* সন ১৩১৯ হইতে ২১ সাল পর্য্যন্ত ৩ বৎসর ব্যাপিয়া "কুশদহে" "দাসের আত্মকথা" প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রবন্ধ শেষে 'ফুটনোটে' বলা হইয়াছিল, "দাসের আত্মকথা" কুশদহতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বাহির হইল। জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যত দূর বলিব প্রথমে মনে হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার বলা হইল, কলিকাতায় আসিয়া জীবনের যে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল, তাহা বিচিত্র ঘটনা পূর্ণ দীর্ঘকাহিনী বিশেষ। তাহা বলিয়া কুশদহ'র আয়ো কলেবর আবদ্ধ করা উচিত মনে করি না"—ইত্যাদি। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, ঐ প্রবন্ধ বন্ধ করার পর কেহ কেহ বলিলেন, "আত্মকথা" বন্ধ হইল কেন? শেষ পর্য্যন্ত জীবনের কথা বলা উচিত, উহা একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়।" বিশেষতঃ আত্মীয়-বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলেন, "জীবনের শেষাংশে প্রথম জীবনের ভাব রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই কি সে কথা বলিলেন না?" অতএব এই দুই বৎসরের চিন্তা ও সমালোচনায় জানা গেল, বস্তুতঃ শেষাংশের কথাও প্রকাশ করিয়া যাওয়া আবশ্যক। নচেৎ প্রথমাংশের কথার তেমন সার্থকতা হইবে না। এই জন্যই "দাসের আত্ম-কথা" পুনরায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা হইল। মনে হয় একবৎসরে শেষ হইলেও হইতে পারে। অন্ততঃ তদ্রূপ চেষ্টা করা হইবে। দাস—যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

তাহা হইতেও পারে না, প্রত্যেকেই আমরা সমাজের সভ্য, কেহ অর্থে, কেহ সামর্থে সমাজের সেবা করিতে আহুত।

খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ, লক্ষ্মণচন্দ্রের প্রভৃত অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট, একথা আমি কখনও অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহা মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা বা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রবাবুর ভিতর দিয়া করিতেছিলেন, এখন সহসা তাঁহার সাক্ষাতভাবে এই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াশ কেন? যেমন ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে তো আমার কোন আপত্তির কারণ ছিল না। ক্ষেত্র বাবুও প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেন জানি না শেষ তিনি আর তেমন কিছু করিলেন না। এই জন্য পরে তাঁহাকে অনেক কষ্টে মন্দির উদ্ধার করিতে হইয়াছিল, সে কথা যথা সময়ে বলিব। যাহা হউক শেষ যখন তাঁহার কর্ত্তৃত্বই স্থান পাইল, তখন সেখানে অবস্থিতি করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া পড়িল। বাহিরে আমাদের প্রতি যে, কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা ভাবের আবির্ভাব যখন ঐ স্থানে আসিয়া পড়িল, তখন নিরুপায় ভাবে সেখানে থাকা অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিতে লাগিলাম।

এখন মনে হয়, ঐ রহস্য খেলার মধ্যে একমাত্র বিধাতারই হাত ছিল। নচেৎ এমন হইবে কেন? যিনি পরমবন্ধুরূপে পবিত্র-প্রেমে পরিচালিত হইয়া কত প্রকারে প্রাণে আনন্দ দিলেন—একত্রে সাধন-ভজন, একত্রে ধর্ম্ম-প্রচার, একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন—মঙ্গলগঞ্জে এবং খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে বিধাতার কত আশীর্ব্বাদ উভয়ের মধ্যে বর্ষিত হইল, আর আজ সেই বন্ধুর প্রাণে এমন ভাব প্রকাশ পাইল যে, তেমন প্রিয় স্থান ব্রহ্মমন্দির তাহাও আজ যেন কণ্টক-শয্যার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আজ সুদীর্ঘ জীবন পরীক্ষার পর, স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আনন্দ মনে এই কথাই বলিতেছি যে, এ কেবল বিধাতাই খেলা; এমন করিয়া স্থানান্তর করা—নূতন জীবন গঠনে পরীক্ষার আগুণে ফেলা এ তাঁহারই বিধান।

কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল, কিন্তু তাহার উপায় তো কিছুই নাই, এতদিন যে মানুষ বিষয়-সম্বন্ধ ছাড়িয়া বৈরাগ্যব্রত লইয়া নিঃসম্বল হইয়াছে, সেই লোক এখন আবার কলিকাতা সহরে গিয়া সংসার পাতিবে, এ কিরূপ সম্ভবপর কথা! বোধহয় এই জন্যই ক্ষেত্রবাবু এবং শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় যখন এই কথা শুনিলেন যে, খাঁটুরায় থাকিতে আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছে, তখন বোধহয় তাঁহারাও বুঝিতে পারিলেন না যে, আমি কেমন করিয়া কি করিব। অথবা যদি আমি খাঁটুরা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসি, তবে ধর্ম্মজীবন—বৈরাগ্য ব্রত, সত্যনিষ্ঠা আর রক্ষিত হইবে না, হয় তো এই ভাবিয়াই তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। হয়তো এ ছাড়াও আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে আরো কোন শুভভাব ছিল, কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনতার ধর্ম্ম, একজন যে পথ আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে বিধেয় মনে করিয়া নিজের দায়ীত্ব নিজে গ্রহণ করিতেছে, অন্যে তাহাতে বাধা দিয়া দায়ীত্ব স্কন্ধে লইবেন কেন? যাহা হউক তখন আমি ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতে কোন সাহায্য পাইলাম না বলিয়া আমার মনে কোন অনুযোগের ভাব আসিয়াছিল বলিয়া অন্ততঃ আমার স্মরণ হয় না, কেবল মনে হইতে লাগিল, কেমন করিয়া কলিকাতায় একটু আশ্রয় পাইব। কিরূপে সংসার চলিবে, ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, এ সকল চিন্তায় আমার মনে ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হয় নাই; যত শীঘ্র এখান হইতে যাইতে পারি, তাহাতেই যেন আরাম এইরূপই মনে হইয়াছিল।

এই সময়ের আমার একটি বিশ্বাসের কথা উজ্জলরূপে স্মরণ আছে। বাস্তবিক আমি সাধন ভজনে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই, এ কথা সরল ভাবেই স্বীকার করিতেছি। আর একদিকে অনেক দিন ধরিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপের আরাধনা —চিন্তাদি যতটুকু করিতে সুযোগ পাইয়াছিলাম, খাঁটুরা, মঙ্গলগঞ্জে, এবং কলিকাতায় সম-বিশ্বাসী, সহ-সাধক ও প্রচারকমহাশয় দিগের সহিত উপাসনাদিতে যতটুকু ধ্যান ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম, খাঁটুরা নির্জ্জনবাসে ঈশ্বর-কৃপায় মনের মধ্যে যে-টুকু ভাবের গাঢ়তা জন্মিয়াছিল, মনে হয়, তাহারই একটা অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ মন্দিরত্যাগের অনতিপূর্ব্বে এইরূপ একটি বাণীর দ্বারা পাইয়াছিলাম। "যেখানে যাস্—যাহা করিস্, "সপ্ত-স্বরূপ-মন্ত্র" ভুলিস্ না, ঐ স্বরূপ ধরিয়া থাকিস্।" নব-বৃন্দাবন নাটকাভিনয়ে দেখিয়াছিলাম, সাধক (অবিনাশ) যখন পুনরায় পাপ পুরুষের প্রলোভনে পড়িবেন, তাহার পূর্ব্বে "বিবেক বৈরাগ্য" শুনাইলেন, "বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র ভুল না কভু ভুল না" ইহা মূলে তাহারই অনুরূপ হইলেও একটা বিশেষ প্রভেদও ইহার মধ্যে ছিল, এখন সে কথা বুঝিতেছি।—অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্য হইতে আনন্দ "সপ্ত-স্বরূপ-মন্ত্র" ভুল না, এই

কথাটির উপর জোর দিয়া বিশেষ করিয়া বলাতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, প্রকৃত বিশ্বাস যাহা পাইয়াছ তাহার বিশেষত্ব হারাইও না।

বস্তুত, বিশ্বাস যে, কি জিনিষ, বিশ্বাসের যে কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; যখন কিঞ্চিৎ বুঝি তখন অবাক হইয়া যাই। কপর্দ্দকশূন্য লোক—একদিকে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসম্বলে অসক্ত পত্নী, নাবালক পুত্র, এবং বিধবা ভগ্নী লইয়া একটি ক্ষুদ্র সংসার কলিকাতার সহরে পাতিতে হইবে। কিন্তু ভিন্ন ভাবাপন্ন বা অন্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া চাকুরী করাও হইবে না। অথচ বিশ্বাস বলিতেছে, "চল, চল।"

অনেক চেষ্টার পর আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু—যাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। বাবু চুণীলাল মিত্রের চেষ্টায় শোভাবাজার নন্দরাম সেনের গলিতে ১০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি পুরাতন বাটীর দ্বিতলে তিনটি ঘর ভাড়া পাইয়া ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে তথায় আসিলাম। ইতি মধ্যে ৭ই, শ্রাবণ লক্ষ্মণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। (ক্রমশ)

বিবিধ

সৈন্যদলে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য;—যে জাতির আত্মরক্ষার এবং স্বদেশরক্ষার যোগ্যতা নাই সেই জাতি কদাচ উচ্চ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি কোন উচ্চ অধিকার প্রদত্ত হয় তাহাও রক্ষিত হইতে পারে না। অধুনা বিধির বিধানে যে অপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়াছে এই সুযোগ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ, সকল সম্প্রদায় পরম আদরে গ্রহণ করুন। যে সুযোগ পাইবার নিমিত্ত বহুকাল হইতে নানা আলোচনা চলিয়াছিল, জাতীয় মহাসমিতি যে অধিকার বারংবার দাবী করিয়াছেন সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় ভারতীয় যুবকদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

সামরিক শিক্ষা—সামরিক শিক্ষা ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ সম্ভবপর কি না তাহা বিচার্য্য প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাহাকে বিপৎকালে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" ইত্যাদি কাপুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এই শক্তিহীনতা মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া দেয়। এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যে স্থলে শারীরিক

অসমর্থতার জন্য আমরা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারি না। ইহার ফলে আমাদের নৈতিক বীর্য্যও ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমাদের আশা ও বাঙ্গালী সৈন্য ;—সংপ্রতি করাচী হইতে ৪৯ জন শিক্ষিত বাঙ্গালী সৈন্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকগণ শৌর্য্য লাভ করিয়াছেন ইহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালী অন্তরে গৌরব অনুভব করিতেছেন। এই অল্প কয়টি যুবককে কলিকাতার অধিবাসিগণ যেমনভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন উহার মধ্যে সমস্ত জাতির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মা বাপের কার্য্য।—মিঃ কে, বি, দত্ত ও তাঁহার গুণবতী স্বদেশানুরাগিণী সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের পুত্র শ্রীমান বসন্তবিহারীকে বাঙ্গালী সৈন্য দলভুক্ত করিয়াছেন। মিঃ কে, বি, দত্তের পত্নী বঙ্গ-গৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা। তিনি পিতৃকুলের নামউজ্জ্বল করিলেন। যে মাতা স্বদেশের কল্যাণের জন্য পুত্রকে উৎসর্গ করিতে পারেন না, তিনি মাতা নামের যোগ্য নহেন। (সঞ্জীবনী)

যুদ্ধের পরিণাম ;—অনেকেই যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করিতেছেন ভয় ভাবনা আশঙ্কায় অনেকের হৃদয় আচ্ছন্ন, অবিশ্বাসীর হৃদয় তাহা ছাড়া আর কি সংগ্রহ করিবে। যাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই তাঁহারা জগতে কোন আশার বাণী শুনিতে পান না। ঘোর অন্ধকারে বিশ্বাসীজন গভীর আশার বাণী শুনিতে পান। এই সর্ব্বগ্রাসী মহাসমর অবসানে জগতে এক অপূর্ব্ব সাম্য-রাজ্য আসিতেছে, এখনই তাহার আভাস প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সন্ধির প্রসঙ্গ।—নরওয়ে ও সুইডেনের শ্রমজিবীদের প্রতিনিধিযোগে জর্ম্মণীর সামাজিক সাম্য বাদীরা রুষিয়ার শ্রমজিবী ও সৈন্যদের প্রতিনিধি সভায় এক সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। জর্ম্মণ সামাজিক সাম্যবাদীদের অধিকাংশই বলিতেছেন ;—(১) প্রত্যেক জাতি স্বাধীনভাবে আত্মোন্নতির সুযোগ পাইবে (২) অন্তর্জাতিক বিরোধ জোর করিয়া শালিসীর দ্বারা মিটান হইবে (৩) জর্ম্মণী অধিকৃত সকল রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন (৪) পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে অথবা জর্ম্মণ বা রুষ রাজ্য ভুক্ত করা হইবে বেলজিয়ম, সার্ভিয়া, রুমেনিয়া স্বাধীনতা পাইবে (৬) মেসিডোনিয়া বুলগেরিয়াকে

দেওয়া হইবে (৭) আদ্রিয়াতিক উপসাগরে সার্ভিয়াকে স্বাধীন বন্দর দেওয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক সামাজিক সাম্যবাদী ইহা অপেক্ষাও উদার সর্ত্তে সন্ধি করিতে চাহেন।

রুষিয়ার প্রতিনিধিগণ অচিরে এই প্রস্তাব আলোচনা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। রুষিয়া, মিত্র পক্ষীয়দের অমতে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইবেন আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। (সঞ্জীবনী)

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।—লণ্ডন নগরে নেসনসোসাইটি লীগে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার জেনারেল স্মাটস্ বলিয়াছেন;—

বর্ত্তমান যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে যে, পৃথিবীর অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এতদিন যাহা ছিল সেই সকল পুরাতন জিনিষ অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। উনবিংশশতাব্দীর সন্ধি সর্ত্ত ও উন্নতির আশা সমস্তই অনির্ব্বচনীয় ক্লেশভোগে পর্য্যবসিত হইল! উহারই পরিমাণে ৮০ লক্ষ লোক জীবন আহুতি দিয়াছে, ততোধিক লোক চিরদিনের নিমিত্ত বিফল হইয়া গেল, হিসাবে দেখা যায় যে, যুদ্ধে যত লোক মরিল ও বিকলাঙ্গ হইল উহা হইতে ব্রিটনের অধিবাসী সংখ্যা অধিক নহে। এমন মহাসমর যদি আবার ঘটে, তাহা হইলে মানব-সভ্যতা বিচূর্ণ হইবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণের জন্য এখন হইতেই কার্য্য করিতে হইবে, হাত গুটাইয়া কেবল মাথা নাড়িলে চলিবে না। আমার মনে হয়, এই মহাসমরে মানবচিত্তে শান্তিলাভের নিমিত্ত যে আকাঙ্ক্ষা উঠিয়াছে, জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে উহা প্রবল। এমন মহাসমর আমরা আবার সহ্য করিতে পারিব না। সুতরাং জোড়াতালি দেওয়া সন্ধি করিলে চলিবে না, প্রত্যেক জাতিকেই আপন পরিণাম ভাবিতে হইবে, বৃহত্তর শক্তি সমূহের মনস্তুষ্টি সাধন করিলে চলিবে না। জেনারেল স্মাটস্ এইরূপ স্থায়ী সন্ধির সর্ত্ত আলোচনার জন্য আংগ্লো আমেরিকান কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন। (সঞ্জীবনী)

"স্বাস্থ্য সমাচার"—বর্ত্তমান বৈশাখে "স্বাস্থ্য সমাচার" মাসিক পত্র ৬ষ্ঠ, বর্ষে পদার্পণ করিল, মনে হয়, ভগ্ন-স্বাস্থ্য-বাঙ্গালীর মধ্যে স্বাস্থ্য সমাচার দ্বারা এই কয় বৎসরে কিছু কাজ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাস্থ্যসমাচারের স্থায়ীত্ব কামনা করি। মিতাচার, সদাহার এবং সাদা-সিদা পান ভোজন ও বিলাস বর্জ্জন সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া তাহাতে আমরা যে কেবল কর্ণের তৃপ্তি লাভ করি তাহা নহে; উহা আমাদের

ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া পাইয়া সত্য সত্যই আনন্দ লাভ করি। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে মনে হয়, এই স্বাস্থ্য-তত্ত্বে যদি যৌবনকাল হইতে দৃষ্টি পড়িত তবে কি দীর্ঘ-জীবনই হয়তো লাভ করিতে পারিতাম। আমাদের দেশের যা সমস্ত পৃথিবীর নিকট দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়—সহজ সরল তত্ত্ব মিতাচারের কথা যতই প্রচার হয় ততোই মঙ্গল। আমরা বৈশাখের স্বাস্থ্য সমাচারের "নিবেদন ও "অজীর্ণতা" প্রবন্ধ হইতে যাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মতো, তাহা হইতে সার সত্য যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা প্রথম হইতেই বিলাসিতা ও নানারূপ নেসার দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আলোচনা করিতেছি। এই মহাযুদ্ধে লিপ্ত সকল লোকেই এই সকলের অপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। রুষিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মদ্যপান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতিরিক্ত আহার, মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ, খাদ্য দ্রব্যের অভাবের জন্য ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আবশ্যক-মত আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা পরিমিতভাবে জীবন যাপন করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং রোগপ্রবণ হয় না—এই চির সত্যবাণী ইউরোপ খণ্ডে বিশেষ ভাবে প্রচার করা হইতেছে। অল্প খরচে কিরূপে শরীরের আবশ্যকীয় পুষ্টি সাধন হইতে পারে তাহা এক্ষণে সভ্য জগৎ বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে-ছেন। সকলকে বাধ্য হইয়া গুরুভোজন ও অতি ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।"

"আমরা যদি প্রত্যহ বুদ্ধির দোষে আহার সম্বন্ধে নানা গোল ঘটাই, আর আমাদিগের কর্ম্মদোষে পরিপাক নালীর সূক্ষ্ম যন্ত্র-তন্ত্রের পরিপাক, সার-শোষণ প্রভৃতি কাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আহারটা আহার না হইয়া প্রহার হইয়া দাঁড়ায়। খাদ্য একদিকে যেমন মানুষের পক্ষে অমৃত, আবার আর এক দিকে উহা তাহার পক্ষে বিষ। খোসখোরাকী বড়লোক-দিগের পক্ষে আহারটা অনেক সময়ে ঐশ্বর্য্যের দংশন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ধনীর ভোগের উপকরণ অনেক হইতে পারে কিন্তু পাকস্থলী কেবল একটি! আবার তাহার পাকস্থলীর অগ্নিতে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুই পরিপাক পায়। সুতরাং প্রথম হইতে ধনীকে খাদ্য চিনিতে হয়, আর কিরূপ খাদ্য অনায়াসে তাহার জঠরে পরিপাক পায়, আর কিরূপ খাদ্য পেটে গিয়া মহা উপদ্রব করে তাহা বিধিমতে জানিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে আপন পর চেনা হইলে পীড়াদায়ক খাদ্যগুলিকে দূরে রাখিতে হয়, এইটিই সুবুদ্ধির কাজ।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

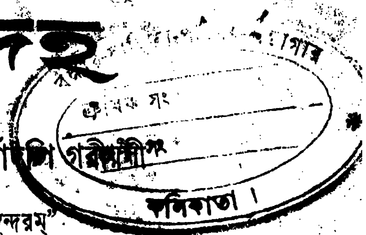
—০—

খাঁটুরার জামদানি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, গ্রামস্থ পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা করিয়া জীবন কাটাইলেন, তাই তিনি সাধারণতঃ 'গুরু মহাশয়' নামে খ্যাত। এখন যাঁহারা গৃহ-স্বামী, এমন অনেকে তাঁহার ছাত্র। সম্প্রতি তিনি কারবঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আসেন। গ্রে-ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র রক্ষিতের যত্নে ও সহায়তায় তাঁহার মিছরিরখানায় সম্মুখে একটি ঘর ভাড়া লইয়া তথায় থাকিয়া চিকিৎসিত হন। ডাক্তার শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ রক্ষিত হোমিওপ্যাথিক মতে বিনা অস্ত্রে ঐ গুরুতর ক্ষত আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার ভূজেন্দ্রনাথ আমাদের কুশদহবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রক্ষিতের পুত্র। উপেন্দ্র বাবু বহু দিবস মানভূম প্রবাসী হইয়া আছেন। শ্রীমান ভূজেন্দ্রনাথের নাম এবং চিকিৎসা কুশদহবাসীর নিকট প্রশংসনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। গুরু মহাশয়ের' পুত্র পত্রের দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"পিতা ঠাকুর মহাশয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ এবং তাঁহার কয়েকটি বন্ধুও কিছু কিছু সাহায্য করিয়া মাণিক বাবুর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। আমি ঐ সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণের নিকটে চিরঋণী। আর মাণিক বাবু সবদিকেই অগ্রজের ন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভূজেন বাবু আমাদিগকে আশাতীত উদারতা ও মহত্ত এবং কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভগবানের নিকট তাহার উন্নতি কামনা করি। (শ্রীহরিনারায়ণ সরকার)

আনুষ্ঠানিক দান।—বেড়গুম নিবাসী — কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে প্রবাসী, শ্রীযুক্ত মোহন মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে 'কুশদহ'র সাহায্যার্থে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের দ্বারে নবদম্পতীর কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার   চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ { দ্বিতীয় সংখ্যা

সঙ্গীত

সুরট মল্লার—একতালা।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা,
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো, মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশি তারা রবি, সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন বসন্ত পবন, তরু লতা ফল ফুল মধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু—মা, শিশুর হাসিটি জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি, তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি, শত রূপে মাগো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে দিবসে নিশীথে, তোমারই মাগো বিভব গরিমা।
তথাপি মাটীর প্রতিমা গড়ি, তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী,
অমর কবির হৃদয় গভীর, ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা;
দেখি না চাহিয়ে অবোধ আমরা, আপনি যে মা তুমি দিয়েছ গো ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে, ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

কুশদহে ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা

—o—

কেহ কেহ মনে করেন ধর্ম্ম আবার প্রচারের প্রয়োজন কি ? মানুষ মাত্রেরই মনে কোন না কোন আকারে একটা ধর্ম্মভাব আছেই। বিশেষত জগতে যখন ধর্ম্মের নানা পথ দেখা যাইতেছে, এবং সে পথে মানব আপন ইচ্ছা রুচি অনুসারে চলিতেই ব্যগ্র, তখন আবার বিশেষ করিয়া কোন ধর্ম্ম, প্রচারের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে এই কথাই মনে হয়, ধর্ম্মের মৌলিকভাব মানব মাত্রেরই মনে থাকিলেও তাহার পরিস্ফুরণের জন্য মানব সর্ব্বদাই বহিঃ-সাহায্য গ্রহণ না করিয়া পারে না। সত্যের বিকাশ, মানব মনে পরস্পর বিনিময় দ্বারাই হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়াই ধর্ম্মগ্রন্থ বা তত্ত্বশাস্ত্র সকলের সঙ্কলন চলিয়াছে, তদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবনের সাধন ফল—বিশ্বাস ভক্তি এবং জ্ঞান, তাহাও সাধকঅন্তর হইতে সাধকঅন্তরে সর্ব্বদা সংক্রামিত হইতেছে। আরো দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ সত্য প্রচারের জন্য যে সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, যাঁহারা যুগাবতার নামে খ্যাত, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে "যুগধর্ম্ম" বলা যায়, সেই সেই ধর্ম্মও প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, এবং প্রত্যেক যুগধর্ম্মই যে একই ধর্ম্মাবহ-বিধাতা প্রেরিত তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান যুগের একজন সাধক বলিয়াছেন ;—

"যখন যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম-বিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা মানবীয় কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত অবস্থায় যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুপ্রাণনা-মূলক, প্রত্যেক ব্রহ্মবাদীকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতীয় প্রাচীন ঋষি-তপস্বীদিগের সময়ে ভারতের সনাতনধর্ম্ম একেশ্বরবাদের যে মহামন্ত্র ঋষি-প্রাণকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মের অনুপ্রাণনা-মূলক (ধর্ম্ম)। যে অদ্বিতীয় নামের অত্যুচ্চভেরীনাদ আরবের উত্তপ্ত মরুভূমিকে কম্পায়িত করিয়া ধর্ম্মবীর মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী ইস্‌লামবাদী তাপসবর্গের সত্যপিপাসু উদ্বুদ্ধ প্রাণকে এক নবালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহাও সেই পরব্রহ্মের অনুপ্রাণনামূলক (ধর্ম্ম)। যে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয় পরাশক্তির প্রভাবে কপিলাবস্তু প্রাসাদস্থিত সিদ্ধার্থ-শিশুর ভিতরে উদ্দীপ্ত বাসনানল নির্ব্বাণের মহা ধর্ম্মভাব তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের ধর্ম্মজীবনকে মহা-নির্ব্বাণে নিমজ্জিত করিয়াছিল তাহাও সেই অনুপ্রাণনা-মূলক ব্রহ্মেরই (ধর্ম্ম)। সেই প্রাচীন জুডীয়া ভূমিতে যে ব্রহ্মশক্তি সূত্রধর-শিশুর ভিতরে মহাসন্তানত্ব, বাধ্যতা ও ইচ্ছাপালনের আদর্শজীবন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল তাহাও

সেই ব্রহ্মের অনুপ্রাণনাসুস্যূত (ধর্ম্ম)। যে অদ্বিতীয় প্রেমময়ের প্রেমশক্তি শচীতনয়ের ভিতর সেই উন্মাদকারী মহাপ্রেমের প্রবল বন্যা উপস্থিত করিয়াছিল তাহাও সেই ব্রহ্মের অনুপ্রাণনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া ঋষিতপস্বীদিগের ভিতরে ব্রহ্মের অনুপ্রাণনামূলক ধর্ম্ম, যুগে যুগে মানবজাতি ও মণ্ডলীর মধ্যে নবভাবে নবকিরণ বিস্তার করিয়াছে। ব্রহ্মের ধর্ম্মই নামান্তরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানবমণ্ডলীর মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মও বর্ত্তমান সময়ে নব ভাব লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান ব্রহ্ম-ভক্ত ব্রাহ্মের ভিতরে এই নবীনালোকের নবোন্মেষ। ধর্ম্ম চিরদিনই উন্নতিশীল।"

দুঃখের বিষয়—অথবা পৃথিবীর অবস্থাই এইরূপ যে, যুগধর্ম্মের প্রথম কিরণটুকু যেরূপ সত্যের উজ্জলপ্রভায় জনসমাজকে প্রভাবান্বিত করে, শেষ তাহার আর তেমন প্রভাব থাকে না, মানবচিত্তে তাহার ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া যায়। নানা শ্রেণীর নিম্ন অধিকারীর হস্তে পড়িয়া তাহার মধ্যে ভ্রম কুসংস্কার প্রবেশ করে। যেমন হিমালয়-প্রবাহিতা নির্ম্মলা গঙ্গা যতই ধরাবক্ষে নিম্ন ভূমিতে নামিতে থাকে, সলিলের নির্ম্মলতা ততই নষ্ট হইয়া যায়, ইহাও তদ্রূপ। যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মবিধানই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়া আসিয়াই জনসমাজে—মানবচিত্তকে পরিবর্ত্তিত এবং নির্ম্মল করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান—যাহা এক সময় সমস্ত জগতের ধর্ম্ম হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে তাহার অভ্যুদয় হইল, এবং ক্রমে তাহা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রত্যেক স্থান হইতে দুই একজন করিয়া বিধান-সংবাদ বাহক আসিয়া ইহার বীজ লইয়া গিয়া নিজ নিজ জন্মভূমি বা কর্ম্মভূমিতে নিখাত করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে অচিরাৎ সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী এবং ফলফুলে দেশ শোভিত করিতে লাগিল। আমাদের কুশদহেও তাহাই হইয়াছিল। এই যুগধর্ম্ম সাধন এবং প্রচারক্ষেত্র—ব্রহ্মমন্দির নামে. ক্ষেত্রমোহন নামা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। ধীরে ধীরে আত্মীয়বর্গের মধ্যে ইহার আকর্ষণী শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সৃষ্টি করিল। ক্রমে মন্দিরের সংশ্লিষ্ট 'মঙ্গলালয়' গৃহ, সুন্দর স্বাস্থ্যকর উদ্যানভূমি, মানসিক উন্নতি সাধনের অনুকূল সুন্দর পুস্তকালয় ইত্যাদি হইল—এদিকে মন্দিরে প্রত্যাহিক এবং সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনার ব্যবস্থা, অন্য প্রান্তে দুই একটি বিশ্বাসী সাধক

পরিবারের গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। এ সমস্ত আয়োজন ধীরে ধীরে বিধাতার কৃপায় হইল, কিন্তু হায়, কেন জানি না, আমাদের কি ত্রুটিতে—অথবা বিধাতা দল বাঁধিতে দিবেন না বলিয়াই অল্পকালের মধ্যে এ সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল, দলের সেবক কর্ম্মী দুই একটি পরলোকে চলিয়া গেলেন। কেহ স্থানান্তরে কেহ অবস্থান্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে নানা পরীক্ষায় দিন চলিয়া গেল, দেশে যুবাদলের মধ্যে আমোদ প্রমোদের প্রাবল্য হইয়া উঠিল। বলিতে গেলে ধর্ম্মপ্রচারের আর কোন শক্তিই যেন রহিল না।

ইতি মধ্যে কিন্তু দেশের ধর্ম্ম-ক্ষুধা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না, তাই মধ্যে মধ্যে এক এক জন এক এক পথে গমন করিতে লাগিল। কেহ সন্ন্যাসী হইয়া অস্বাভাবিক পথে চলিয়া অসময়ে নিদারুণ ভাবে জীবন হারাইল। কেহ কেহ ইতর ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া নেশার বশীভূত হইয়া শরীর নষ্ট করিল। কেহ স্ত্রী পুত্র সত্বে অস্বাভাবিক ভাবে সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতধারী হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কেহ বা ত্যাগের পথ ছাড়িয়া আবার শেষ জীবনে সংসার-পরিবারের কুক্ষিগত হইতে লাগিলেন। আর কেহ বা অল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম্মোন্মত্ততার লক্ষণ দেখাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। আর কেহ কেহ,অথবা দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া গৃহ সংসারে থাকিয়াও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করিয়া কাটাইলেন,এই বিচিত্র ঘটনার মধ্যে এক-দিকে অসম্পূর্ণ ধর্ম্মের আদর্শ, অন্য দিকে দেশের ধর্ম্ম-ক্ষুধা প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি খাঁটুরা-হয়দাদপুর গ্রামে একটি হরিসভা (কুশদহ হরিসাধন সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েকটি আত্মা ধর্ম্ম ক্ষুধায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন ; ইহা সুসংবাদ বটে, এ চিত্র অতীব সুদৃশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমারা যে অনেক দেখিয়া আসিতেছি—অনেকবার আশায় নিরাশ হইলাম—সেই কত দিন পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গায় “সুনীতি সঞ্চারিণী সভা” সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের হৃদয়-উন্মাদনা বক্তৃতা। মহাত্মা শিবনারায়ণ স্বামীর পদধূলিও একদিন এই কুশদহে পড়িয়াছে। আরো কত মহাত্মা এখানে আসিয়াছেন—বেশী দিনের কথা নয়, ভক্ত দীনবন্ধু কথকতা এবং সংকীর্ত্তন করিয়া মাতাইলেন। কিন্তু হায় কিছুই যে স্থায়ী হইল না। তাই বলি কুশদহ-মাটীতে ধর্ম্মবীজ আর কত কাল ব্যর্থ হইবে। আমরা যে এখনও বড় আশা করিয়া বসিয়া আছি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান-ধর্ম্মের আদর্শ-বৃক্ষ কবে ফলবান্ হইবে ?

ভগবান্ আমাদিগের অযোগ্যতা দেখাইলেন, আমাদিগকে লজ্জিত

করিলেন, কিন্তু আশা তো গেল না. এখনও মস্তক অবনত করিয়া তাঁহারই দ্বারে প্রার্থনা লইয়া পড়িয়া আছি। আমরা অযোগ্য হইলাম বলিয়া বিধানতো ব্যর্থ হইবে না। তাই বলি বিধানের জয় হউক। আমরা নিজদিগকে হীন মনে করিয়া তাঁহারই দ্বারে যেন পড়িয়া থাকি। তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করিবেনই।

প্রার্থনা

নিরাকারই সত্য

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দৈনিক প্রার্থনা হইতে গৃহীত)

হে পিতা, হে দীনজনপালক, তুমি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ দেশের লোক করিয়াছ তখন ইহার ভিতরেও আমাদিগকে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অন্য দেশে জন্ম দিলে না কেন? এ সময়ে জন্ম দিলে কেন? ভাবুক যে, সে ইহার ভিতর হইতেও নিগূঢ়ভাব লইবে। অন্য দেশে পাহাড়ের এত আদর নাই। এ দেশের আর্য্য জাতির মধ্যে ঐ ভাবটি বিশেষরূপে ছিল। ঋষিরা পর্ব্বতে তোমার আরাধনা করিতেন। হে পিতা, যদি আর্য্যকুলে আমাদিগের জন্ম দিলে তবে সে কুলের গৌরব রাখিতে দাও।

তুমি কিছুই অকারণ কর না। যখন আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে তখন ইহার ভিতর তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। আমরা এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিব না, আমরা আর্য্য জাতীয় লোক, অতএব আমাদের কার্য্য ভাব তাঁহাদের মত হইবে। এ দেশের লোক ভাবুক ও আধ্যাত্মিক। চিরকাল এ দেশে ঐ ভাব প্রবল হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা জড় ছাড়িয়া চৈতন্য গ্রহণ করেন। তবে কেন আমরা বলিব নিরাকার বুঝিতে পারি না। এ দেশের ঋষিরা এক হুঙ্কারে সংসার তাড়াইতেন। তখন ভিতরে সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য, ভক্তির রাজ্য, যোগের রাজ্য খুলিয়া যাইত। মাকড়সা যেমন শূন্যে জাল করে, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি আকাশে বাড়ী করিতেন, এবং সেখানে বিশ্বাস-নির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম জালে বসিয়া থাকিতেন। এখনকার

লোকেরা বিদেশীয় ভাব পাইয়া জড়াসক্ত হইয়া কেন বলে যে আমরা কেবল জড়ই দেখি, নিরাকার দেখিতে পাই না। কেন এদেশে একথা উঠিল? বড় দুঃখ হয়। পরমপিতার সিংহাসন, সাধুগণ, ধর্ম্ম, প্রেম, বিশ্বাস এ সমুদয় আধ্যাত্মিক। আমরা খুব জড়িয়ে এ গুলোকে ধরে থাকিব। বুঝিতে পারিব যে, ব্রহ্মপদার্থ খুব জাপ্‌টে ধরা যায়। আর জড় পৃথিবীকে ধরিলে ধোঁয়ার মত, কর্পূরের মত উড়ে যায়। সাধুদের শরীর বা বাহ্যিক লক্ষণ ধরা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র ও সদ্‌গুণ ধরা যাইবে। পিতা এজন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি।

দেশের গৌরব কেন চলিয়া যাইতেছে? আমরা কেবল জড় দেখি, জড় ধরি এ-রকম কেন হইল? কাঙ্গাল হয়ে ভিক্ষা চাই, পূর্ব্বের গৌরব এনে দাও। "আধ্যাত্মিক রাজ্যই যথার্থ, জড় কিছু নয়" এ-কথা সকলে বলিতেছে আবার যেন শুনিতে পাই। আর আমরা যে কজন লোক নববিধানের মন্ত্রে প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছি আমাদের আগে ও-কথা বলিতে দাও। আমরা যেন বলি যে, বুকের ভিতর ব্রহ্মপদার্থের গুরুত্ব অনুভব করিতেছি, হরিকে যখন ভজনা করি মনে হয় সত্য সাধনা করিতেছি, কিন্তু জড় ধোঁয়ার তুল্য। হে পিতা, আমাদিগের নিকট জড় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রাজ্য বড় হউক। পুণ্য দাও প্রেম দাও, তাই নিয়ে বসে থাকি। প্রাণ জমাট হউক। সব চেয়ে সত্য তুমি হও। তারপর তোমার ভিতর যে রাজ্য আছে তাহা সত্য হউক। হে পিতা, আমরা যেন জাতীয়ধর্ম্ম রাখি। যাহা দেখা যায় না তাই দেখিব, যা শুনা যায় না তাই শুনিব। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ পিতার শ্রীচরণ ধরিয়া এই মিনতি করিতেছে, হে পিতা, হে করুণ-সিন্ধু, তুমি যেমন জড় রাজ্য হইতে তুলিয়া পাহাড়ের উপর আনিলে, যেখানে চারিদিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আকাশের উপর পূর্ণব্রহ্মকে খুব সৎরূপে দেখিয়া সত্য সাধন করিয়া খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

মনোরমা

১৬

কোথায় সুদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, আর কোথায় বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর। দুই দেশের মধ্যে কত শত ক্রোশ ব্যবধান। কিন্তু

রেল কোম্পানীর কৃপায় তিন দিনেই সন্তোষ পত্নী ও মাতা সহ বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও কলিকাতা আসিবার জন্য সন্তোষ (অবশ্য অনিচ্ছায়, যেহেতু ভগ্নীর শাসনাধীনে আসিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না) জব্বলপুর হইতে রওনা হইয়াছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্যরূপ ঘটিল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে একটি ভদ্র লোকের সহিত তাহার আলাপ হইল, তাঁহার নাম হরকুমার মুখোপাধ্যায়। নিবাস মুর্শিদাবাদ, কিন্তু ভ্রমণ সর্ব্ব-স্থানে—বিশেষত: বড় লোকের ছেলেদের সহিত আলাপ হইলেই তাহাদের তত্ত্বাবধান লইতে তিনি বড়ই তৎপর। সন্তোষের সঙ্গে আলাপ হইবামাত্র চতুর হরকুমার যেন তাহার চরিত্রটি পাঠ করিয়া লইলেন। হরকুমার সুগায়ক, গানে তিনি মজলিস জাঁকাইয়া তুলিতে পারেন বলিয়া অনেক বড় লোকের সভায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, অনেকে তাঁহাকে মোটামাহিনা দিয়াও রাখেন।

গাড়ীতে দু' চারিটি গান গাহিয়া তিনি সন্তোষকে মুগ্ধ করিলেন। সন্তোষও সঙ্গীতানুরাগী, সে হরকুমারকে ধরিয়া বসিল "আপনি আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় চলুন।" হরকুমার কহিলেন "উপস্থিত তো যেতে পারব না, তবে কলিকাতায় আমার প্রায় যাওয়া আসা আছে। আপনি তো বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন, বরং যাবার মুখে আমাদের বহরমপুরটা একবার বেড়িয়ে যাবেন চলুন। এমন pleasant জায়গা, এমন scenery যে, আপনি দেখলে বড়ই খুসী হবেন। সুদূর পশ্চিমে এত বেড়িয়ে এলেন, আর আপনার ঘরের পাশে সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলা-বাঙ্গলা মায়ের ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি চেয়ে দেখলেন না, সত্যি বলছি সন্তোষ বাবু, অনেক দেশ বেড়াই, কিন্তু কবিরা যাকে সোণার বাংলা বলেন, তেমন চমৎকার দেশটি আর কোথাও দেখলুম না,—ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরকুমার গাহিয়া উঠিলেন.—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—
আমার জন্ম ভূমি, সে যে আমার বঙ্গ ভূমি,"

রেলের কর্কশ ঘর্ঘর কর্ণদাহী নিনাদকেও ছাপাইয়া হরকুমারের মধুর উচ্চ স্বর আকাশ পথে ছুটিয়া চলিল, স্তব্ধ মুগ্ধ সন্তোষ বিস্ময় প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল, পাশের গাড়ীর যাত্রীরা সাগ্রহে ঝুঁকিয়া গায়ককে দেখিবার জন্য কেহ বা সফল কেহ বা ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

সন্তোষের মন ছুটিল বহরমপুরের দিকে, অন্নপূর্ণাও পুত্রের অনুরোধে

সহজেই সম্মত হইলেন। মনোরমাও তাহাই চায়। কলিকাতায় পিতামাতার নিকট ফিরিতে তাহার মোটেই আগ্রহ নাই। বরং কলিকাতায় ফিরিবার চিন্তায় তাহার চিত্ত অধিকতর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া ছিল, এখন যেন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সন্তোষ মোকামায় আসিয়া ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিয়া লুপ মেলে উঠিল। হরকুমার পরমাত্মীয়ের ন্যায় সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। দরোয়ান কালী সিংও সন্তোষের অনর্থক বকুনি শুনার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া হাঁফ ছাড়িল।

রামপুরহাটে আসিয়া পুনরায় গাড়ী বদলাইয়া আজিমগঞ্জের ট্রেণে উঠিতে হইল। আজিমগঞ্জে নামিবামাত্র একটি রূপবান সুসজ্জিত তরুণ যুবক হরকুমারকে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল "মাষ্টার যে, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। আমরা ভেবেই অস্থির। কোথেকে আসছেন বলুন দেখি, যা[illegible] বা কতদূর? চলুন আমাদের বাসায়।"

হরকুমার গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন "আর দাদা, তোমরা যে বাতাসকে ধরে রাখতে চাও দেখছি। এখন শোন, জরুরি কথা আছে" হরকুমার হীরালালের কাণে কাণে কি কতগুলি কথা বলিল, হীরালাল প্রীতি প্রফুল্লমুখে অগ্রসর হইয়া সন্তোষের করমর্দ্দন করিয়া কহিল, "ষ্টেশনের নিকটেই আমার একখানি খালি বাংলো আছে এ বেলা অনুগ্রহ করে সেখানে বিশ্রাম ও আহারাদি করবেন চলুন। কাল না হয় বহরমপুর যাবেন। আসুন মাষ্টার, সবাইকে নিয়ে আসুন "সন্তোষ পরম আপ্যায়িত হইয়া নূতন বাসাভিমুখী হইল, আগে আগে চলিল হরকুমার, মধ্যে অন্নপূর্ণা সন্তোষ ও মনোরমা, পশ্চাতে কালী সিং ও হীরালাল।

মনোরমার সুঠাম অর্দ্ধাবৃত্ত বাহু দুটি ও সুন্দর পদ পল্লব দুখানির অপূর্ব্ব নিক্ষেপ ভঙ্গিমা দেখিয়া হীরালাল মনে মনে কহিল, "একি! সুন্দর, বিদ্যুৎকে যেন ধরে রাখা হয়েছে। যার পা ও হাত এত সুন্দর, না জানি তার মুখখানি আরও কত সুন্দর।" অতৃপ্ত নয়নে হীরালাল মনোরমার গমনশীল মূর্ত্তি খানির দিকে চাহিতে চাহিতে পথ চলিতে লাগিল।

১৭

বহরমপুরের নূতন বাঙ্গলায় আসিয়া সকলেই খুব খুসী হইল। মনোরমার মন যেন নবোৎসাহে নাচিয়া উঠিল, বড় সুন্দর স্থান, গঙ্গার ধারেই বাংলো,

চারিদিকে ফল ও ফুলের বাগান। বিলাতী লতাগুলি গৃহের দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন কুঞ্জ-ভবন। নানাবিধ বিলাতী সিজ্‌ন্‌ফ্লাওয়ার'এর শয্যাগুলি নব নব সৌন্দর্য্যে দর্শকের নয়ন মন আকৃষ্ট করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গোলাপ যুঁই মল্লিকার সারি। একদিকে একটি মালতী ফুলের সুবৃহৎ মঞ্চ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। ফুলের গন্ধ বায়ুভরে বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের মনে স্নিগ্ধ উন্মাদনার আবেশ ঢালিয়া দিতেছে। সন্তোষ, হীরালালকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতে লাগিল। ভাগ্যে সে বুদ্ধিমানের মত হরকুমারের পরামর্শ শুনিয়া এখানে আসিল, নচেৎ এ সৌন্দর্য্য সম্ভোগের সুযোগ ঘটিত না।

সন্তোষের প্রথমা পত্নীর সই কমলা পাশের বাংলোতেই বাস করিত,কমলার স্বামী খগেন্দ্রের সহিত সন্তোষের পরিচয় ছিল, খগেন্দ্রনাথ বহরমপুরে ওকালতী করেন এবং অবসর সময়ে মাসিক পত্রে কবিতা ও গল্প লিখিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় বিমলআনন্দে কালযাপন করেন। কমলা দু'চারি দিনেই মনোরমার সহিত ঘনিষ্টতা করিয়া লইল। উভয় পরিবারে যাওয়া আসা চলিতে লাগিল। খগেন্দ্র একদিন সন্তোষকে কহিলেন, হীরেলালের সহিত বুঝে শুনে চোল ভায়া, ওর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, কেঁইয়ারা এ অঞ্চলে যেমন ধনী, তেমনি আবার অনেকের চরিত্র ভাল না, মাষ্টার হরকুমার গান বাজনায় ওস্তাদ কিন্তু চরিত্র বড় লঘু, তুমি ভাই নূতন এসেছ, তোমায় আমার সাবধান ক'রে দেওয়া উচিৎ বলে একথা বললুম।"

সন্তোষ হাসিয়া কহিল, ভালই করলেন খগেন বাবু, কিন্তু সাবধান করে দেওয়াটা মেয়েদের জন্যই আবশ্যক, পুরুষমানুষের আর সাবধান হওয়ার কি আছে? সন্তোষের চরিত্র বড় দুর্ব্বল ইহা খগেন্দ্র জানিতেন, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া তিনি কৌতূহলী হইয়া কহিলেন, বলেন কি, সন্তোষ বাবু সঙ্গ দোষ গুণের যে একটা খুব প্রভাব আছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে চান?

কখনই না বলিয়া সন্তোষ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, দেখুন, মাটীর বা কাচের বাসন গুলির ভাংবার ভয় বড় বেশী, সে গুলিই সাবধান ক'রে রাখতে হয়, একটুতেই ভেঙে যাবার—এমন কি ছুঁলে নষ্ট হবার পর্য্যন্ত ভয় আছে, কিন্তু সোনা রূপার জিনিষের সে ভয় নেই, ভাংবেও না, ছোঁয়া পড়ে ব্যবহারের অযোগ্যও হবে না।

খগেন্দ্র অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, আপনার তো বেশ প্রতিভা

আছে দেখছি, উপমাটি বেশ দিয়েছেন তো, কিন্তু আপনি কি মেয়েদের মাটী ও কাচের দরে ফেলে পুরুষদের সোনার দরে ফেল্‌তে চান ?

সন্তোষ কহিল, আমি একা কেন ফেলব ? পৃথিবী শুদ্ধ লোকই যে এই দর ক'যে স্থির করেছে। ভগবান্ যিনি—নরনারীর সৃষ্টি কর্ত্তা তিনিই নিজে এই দর করেছেন।

খগেন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্তোষ পুনরায় কহিল, আপনি যে অবাক হলেন, খগেন বাবু, আপনার মতো লেখক বলে খ্যাতি না থাক্‌লেও তর্কে আমাকে হারাতে পারবেন না।

খগেন্দ্র কহিলেন, আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, পুরুষরা যদি অসংযম, ব্যভিচার প্রভৃতি চরিত্র দোষে দূষিত হয়, তা হ'লে সে দোষ সংক্রামকরূপে মেয়েদেরও মন কলুষিত এবং সংসারকেও অপবিত্র ও অশান্তির আলয় করা হয় না ?

সন্তোষ দক্ষিণ বাহু সঞ্চলন করিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি তা কিছুতেই স্বীকার করি না, আমি যদি নিজের সখ্ চরিতার্থ করি, তা বলে আমার বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতা নষ্ট হবে তার কোন মানে নেই, আপনি বলবেন অনেক বাড়ীতে তা হয়, কিন্তু পুরুষরা যদি বুদ্ধিমান হয়, তা হ'লে তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির বলে কিছুই লুকোতে পারে না। যারা আমাদের সাহায্যের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকে, আমাদের ভিন্ন যাদের গতি নেই, আমরা যাদের ভরণ পোষণ-কর্ত্তা, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক, রক্ষক, তারা কি আমাদের সঙ্গে সমানে চল্‌তে সাহস করতে পারে ? অসম্ভব। এই দেখুন না, মেয়েরা বিধবা হবার চাইতে নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয় মনে ক'রে, এইতেই আমাদের ও তাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাবটা বুঝে নিন। হা-হা-হা—ঠিক বলেছি, না, খগেন বাবু, আচ্ছা,—আমার একটা কাজ আছে, এখন চল্‌লুম, সইকে আমাদের বাসায় যেতে বল্‌বেন।

সন্তোষ চলিয়া গেল। খগেন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মনে হইল, সন্তোষ বড় মন্দ বলে নাই, অনেক সুশিক্ষিত লোকের মনের ভাবই সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। মুখে যে যতই বলুক কিম্বা তর্কের দ্বারা যতই সন্তোষের কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করুক না কেন, সমস্ত লোকের কিন্তু ঐ মত, কার্য্যের দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

১৮

অন্নপূর্ণা প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে পূজার ফুল তুলিয়া দুই ঘণ্টা কাল পূজায় অতিবাহিত করেন। বধূর মলিন মুখখানি তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা দেয়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছুই প্রকাশ করেন না, একান্ত মনে ইষ্টদেবতার চরণে শুধু পুত্রের মতি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার এ কাতরপ্রার্থনা কি একদিনও সে উদাসীন কঠোর ভাগ্যদেবতার চরণে পৌঁছিয়া তাঁহার আসন টলাইতে পারিবে না? সন্তোষকেও তিনি অযত্ন করেন না, আহারের সময় নিজে সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করেন, জলখাবারের থালা নিজে সাজাইয়া দেন, কিন্তু সন্তোষ স্নেহময়ী মাতার সহিত একদিনও অনুরক্ত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করে না। মনোরমাকেও অন্নপূর্ণা অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু হইলে কি হয়, মনোরমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কমলা একদিন অন্নপূর্ণাকে গোপনে কহিল, "মা, মনোরমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে, ওকে একবার ডাক্তার দেখানো ভাল। ভিতরে কোনও রোগই বা হয়েছে। অন্নপূর্ণার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, কহিলেন, কি করি মা, সবই আমার অদৃষ্ট, বৌমার বাবা লিখেছেন তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন, আমিও তো পাঠাতে চাই, বৌমা যে যেতে চায় না।

কমলা কোনও কথা না বলিয়া মনোরমার গৃহে আসিল, মনোরমা উদাস দৃষ্টিতে জানালার পথে চাহিয়া ছিল, গঙ্গার বুকে কত খালি ও বোঝাই নৌকা চলিয়াছে, সে বুঝি ভাবিতেছিল, তাহার জীবন-তরণী ঐ খালি নৌকার ন্যায় যেন লক্ষ্য হীন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ভাসিয়াই চলিয়াছে, সে তরী কাণ্ডারী শূন্য, কূলে পৌঁছিবার উদ্দেশ্য বিহীন। কমলা আসিয়া স্নেহাপ্লুত-কণ্ঠে ডাকিল, 'সই' মনোরমা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, মৃদু হাসির প্রভায় তাহার ঠোঁট দুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেও ডাকিল, সই দিদি, খুকী কই?

"সে এখন ঘুমুচ্চে, তুমি একলাটি বসে কি করচ? আমাদের বাসায় যাও নি কেন? আমি আবার এলুম।"

কমলা মনোরমার পাশে বসিয়া পড়িল, দুই জনে, এ-কথা, সে-কথা কিছুক্ষণ হইবার পর কমলা কহিল, "তোমার চেহারাটা বড় খারাপ হ'য়ে যাচ্চে সই! ভিতরে কিছু অসুখ হয়-নি তো?"

মনোরমা কহিল, কোনও অসুখ তো বুঝি না, কেবল বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন একটু কন্ কন্ ক'রে ওঠে—সে কিছু না।

কমলা মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া, সস্নেহে মনোরমার একরাশ বেলফুলের মত কোমল হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি সই, কিছু মনে কোর না, আমার সে সই তো এখন একেবারে বদ্‌লে গেছে, সন্তোষ বাবুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলেছে, তাতে তাকে বড় দুঃখিত বোলেও মনে হয় না, মনে করেছিলুম, সন্তোষ বাবুর স্বভাব তোমার সঙ্গে ঘর কোরে শুধরে যাবে, তারও তো লক্ষণ দেখি না, তা তুমিও কি তাকে এলে দিয়েছ? শোধরাবার চেষ্টা কিছু কোরছ না? লজ্জা কোর না সই, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের কাছে লজ্জা কি ভাই?

মনোরমা হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে তার নিটোল গোলাপী গাল দুটি ও বিশাল চক্ষু দুটি উজ্জল না হইয়া যেন কিসের ছায়ায় মলিন দেখাইতে লাগিল. মনোরমা কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "সই দিদি, নিজের ভাব নিজেই কিছু বুঝতে পারিনে, তা তোমায় কি বুঝিয়ে বোলব? স্বামীর ভালবাসা কি জিনিষ—সে ভালবাসার প্রতি স্ত্রীলোকের কতটা দাবী, কতটুকু অধিকারের সীমা তাতো আজো বুঝলুম না, শুধু এইটুকু বুঝছি, বুকের ভিতর কি যেন একটা অতৃপ্তি—কি যেন একটা অশান্তি জমাট হয়ে উঠছে, জীবনটা একটা ভারী বোঝার মতো হোচ্ছে, এ বোঝা মাথায় নিয়ে চলবার সামর্থ্য দিন দিন কমে যাচ্ছে, এর বেশী আর কিছু বলতে পারি নে সই।

মনোরমার স্বরে এমন একটা নৈরাশ্যভাব ফুটিয়া উঠিল, যাহা কমলার নারী-হৃদয়ের সমগ্র সহানুভূতিকে অতি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিল। মনোরমার মাথাটি বুকের নিকটে টানিয়া কমলা কহিল, সই, একটা কথা তো বল্‌লে না? সন্তোষ বাবুকে তুমি ভালবাস কি না—তাই যে আমি জান্‌তে চাই। তুমি যদি তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভালবাস, তাঁর জন্য সতীকুল শিরোমণি ভগবতীর চরণে অহোরাত্র প্রার্থনা কর, তা হ'লে একদিন তাঁকে ফিরতেই হবে; একদিন তিনি এসে বলবেনই "আমি তোমারি, আর কারু নয়।" প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে জয় করতে হবে, আমরা মেয়েমানুষ, কাঁদতে, সহ্য করতেই আমাদের জন্ম, যতটুকু আমরা পাই তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ।

মনোরমা মাথা তুলিয়া দৃপ্ত-ভঙ্গীতে কহিল, রাগ কোর না সই দিদি, তোমার ও শিক্ষা আমি মাথা পেতে স্বীকার করতে পারছি না। আমিও অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার মন ঠিক ঐ কথায় কিছুতে সায় দিতে চায় না। যে আমায় খেলার পুতুল বোলে মনে করে, দাসীর অধম বোলে ইচ্ছা মতো

অবসর মতো একটু আধটু ভালবাসা দিতে চায়, তাকে আমি শ্রদ্ধা ভালবাসা দিতে পারি না। সত্যি বটে, আমরা মেয়েমানুষ, সহিতেই—কাঁদতেই আমাদের জন্ম, কিন্তু এটাই কি ঠিক ভগবানের বিধান, না মানুষের মন গড়া নিয়ম ?

কমলা কহিল, আমরা দাসী বৈ কি বোন্। কিন্তু এ দাসত্বে কত গৌরব, কত আনন্দ বল দেখি ? এ সেবার আনন্দে—

বাধা দিয়া মনোরমা কহিল, দাসী বোলে জোর করে যার কাছ থেকে দাসীপনাটুকু কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে যাওয়া যায়, তার কাছ থেকে প্রাণের জিনিষ কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু তাকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে প্রীতির চোখে দেখলে, সে দাসীর চাইতে ঢের বেশী, তার যথাসর্ব্বস্ব, তার সমস্ত জীবন দিয়ে সেবা করতে পারে, এটা কি ভেবে দেখেছ দিদি ?

কমলা আর কিছু বলিল না. কমলার দাসী আসিয়া ডাকিল, মা, বাবু এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, মনোরমাকে কহিল, আমাদের বাসায় একবার যেয়ো ভাই।

কমলা দাসীর সঙ্গে বাসায় আসিল. খগেন্দ্র কহিল, বেড়াতে গিয়েছিলে ? মনোরমা কেমন আছে ? সে তো কই একদিনও আসে না ?

কমলা কহিল, তার প্রাণে যে আগুণ জ্বলচে।

"তা নিবিয়ে ফেলবার চেষ্টা করচ না, বসে বসে দেখছ শুধু। তুমি তবে তার কাছে যাও কেন ? তোমারও তো কাপড় ধোরে যেতে পারে !

কমলা কহিল, ইস্ ! আমার কাপড় ধোরবে কেন ? আমি অতো অসাবধানী নই, আমি চেষ্টা করছি, যদি নিভে যায়। কিন্তু সইদের দুজনই সমান। সই বলে, যে আমায় চায় না, তাকে আমি ভালবাসতে পারি না. তার মুখ চেয়ে বসে থাকা সে অনর্থক মনে করে। মেয়েমানুষের এ তেজ এ দম্ভ ভাল কি ?

খগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন ভাল নয় ? সেও তো ভগবানের সৃষ্ট জীব, পুরুষের মতো তারও তো মান, অভিমান, সুখ দুঃখ বোধ আছে ?

কমলা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, বেশ বুদ্ধি আর কি ? মেয়েমানুষের ভালবাসার জোরে, ভক্তির জোরে, পুরুষ যেমনই হোক, বশ যে হোতেই হবে, তা নয়, সে যদি আমায় না চায়, আমি তবে হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকব।

খগেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিল, তোমরা তুচ্ছ নারী জাত,—দশহাত কাপড়ে

তোমাদের কাছা নেই, তোমাদের আবার ভালবাসার তেজ কি? আমাদের ভালবাসা ও অনুগ্রহ ভিন্ন তোমাদের গতি কৈ? আমরা যদি ইচ্ছা কোরে তোমাদের দিকে ফিরে চাই,সে তোমাদের পরম সৌভাগ্য নইলে তোমাদের ভালবাসার বা ভক্তির বিশেষত্ব তো কিছু আমি দেখি না। আমাদের খুসী হয়, ফিরে চাইতে পারি, না খুসী হয় ফিরে চাইব না, কিন্তু তোমায় আমার পথচেয়ে থাকতেই হবে, তা ভিন্ন তোমার আর জগৎ সংসারে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছু নেই।

কমলার চক্ষু স্থির হইল, স্বামীর মুখে সে এমন গর্ব্বিত ও উদ্ধত কথা কথনো শোনে নাই, বরং মনে মনে কমলার যথেষ্ট গৌরব ও আত্ম-প্রসাদ ছিল, এমন স্বামীর প্রণয় কোনও নারীর ভাগ্যে সহজে ঘটে না. স্বামীর ষোলআনা মন এতখানি অধিকার করিয়া বসা সাতজন্ম শিবপূজার ফল, কমলার বিশ্বাস, তাহার ভালবাসার গুণে তাহার স্বামী এমন করিয়া ধরা দিয়াছেন, আজ খগেন্দ্রের কথাগুলি কাঁটার মতো তাহার বক্ষে গিয়া বিঁধিল, দৃপ্ত রসনা একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, কমলার দুই চক্ষে শতধারা ছুটিল, খগেন্দ্র হিতে বিপরীত ঘটিল দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

বিকাশ

—o—

ওই মালতী ফুলের মতো—
শুধু সৌরভ নিয়ে ফুটে-থাকা হ'ক
মোর জীবনের ব্রত!
নাহিক ভাবনা কেন ফুটে আছে,
আপনি পূর্ণ আপনার কাছে,
প্রভাতের পানে আঁখি মেলিয়াছে
জ্যোতি-সুধা পানে রত!
যেন তোমারি শুভ্রতায়—
আজি অনাবৃত করি হৃদয় আমার
দল গুলি খুলে যায়!—
সুরল-সহজ আলোকে বাতাসে,
শ্যামল ধরার বক্ষের পাশে
সব বাধা ঠেলি আপনা প্রকাশে
সফল পূর্ণতায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আদর্শ

(কোন এক ব্রাহ্ম-বিবাহ-বাসরে গীত)

"ওহে জগত-কারণ, এ কি নিয়ম তব ?
এ কি মহোৎসব ? এ কি মিলন নব ?
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে ;
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে,
অখিল নিখিল ভরা এ কি আহ্বান রব ?
যে নিয়মে জীবগণ সুখ দুঃখ অন্ধ,
প্রেম-পারিজাতে প্রভো, এ কি মকরন্দ ?
দুইটি অন্তর তাই দূরান্তর হ'তে,
করিছে শপথ আজ, মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে,
তুচ্ছ দৈন্য অতি তুচ্ছ বিভব।"

"যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে,
আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোর তাঁহারে তাহার,
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী !
কাল-পারাবার যিনি চিরদিন,
করিছেন পার বিরাম বিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন,
প্রসাদ-পবন সঞ্চারি !
নিয়ো নিয়ো চিরজীবন পাথেয়,
ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে,
সুখে-দুখে-শোকে, আঁধারে-আলোকে,
যেয়ো অমৃতের সন্ধানে !
বাঁধা নাহি থেকো আলসে-আবেশে,
ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে
বিশ্বের মাঝে বিস্তারি !"

মা ও ছেলে

(ছোট গল্প)

"মা, ওরা সব বাইরে আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি একবার এক্ষুণি আসচি।"—মাতা রোগশয্যায় শায়িত। তাঁহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। তিনি শুধু শীর্ণ হাত দু'খানি তুলিয়া কহিলেন,—বাবা আমার কাছে একটু বোস্ না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে—একটু হাত বুলিয়ে দে। আর তোকে বলব না—আজ শুধু একবার বোস্। ধীরে ধীরে অতি কষ্টে কথাগুলি বলিয়া মাতা নীরব হইলেন।

অবাধ্য পুত্র বনবিহারী মাতার কাতর অনুরোধ শুনিয়াও শুনিল না। তাহার প্রিয়তম বন্ধুগণ যে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মাতার কথার কোন উত্তর না দিয়া,শুধু—"এখনই আসৃব" বলিয়া ঝড়ের মতো গৃহের বাহির হইয়া গেল। মাতার প্রাণে আঘাত লাগিল। পুত্রের উপর ক্ষণিকের জন্য অভিমান আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। যে পুত্র কখনো অবাধ্য ছিল না, যে পুত্র কখনো মাতার এতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না, সেই পুত্র বনবিহারী আজ তাঁহাকে এই মৃত্যুর কোলে ফেলিয়া বন্ধুগণের সহিত বারোয়ারীর চাঁদা আদায় করিতে চলিয়া গেল। মাতার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া সুদূর অতীতের একটা স্মৃতি সরিয়া গেল। তিনি পুত্রের সেই শৈশবের নির্দোষ ক্রীড়া কৌতুক হইতে আরম্ভ করিয়া আজকার এই অবাধ্যতার কথা পর্য্যন্ত সকল অতীত ঘটনার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেন। দেখিলেন, সেই শৈশবে যখন বনু পিতৃহীন হইয়াছিল, তখন সে নিতান্ত শিশু বলিলেই হয়। সে যখন মাতার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বলিত—"মা তুমি কাঁদচ কেন? ও মা, বল না" আমার বড় কষ্ট হোচ্ছে। বাবা কোথায় গেছেন বল না মা!" মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিত। তখন তো বনবিহারী এমন ছিল না!

তার পর যখন সে বড় হইয়া গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তী হইল, তখন তো সে এমন অবাধ্য হয় নাই। তখন তো সে তাঁহার অসুখ হইলে, মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিত—মা তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে? যখন তাহার মা বলিতেন,—না বাবা। তখন তাহার মুখখানি কেমন প্রফুল্ল হইত।

উঃ সে-যে একটা সময় গিয়াছে। আর যেদিন হইতে সে কলিকাতায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে. তাহার পর হইতেই তো তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মাতা আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।

২

বনবিহারীর মাতা তাঁহার মামাতো ভাই প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শে একমাত্র পুত্রটিকে এই অস্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে নিতান্ত তাঁহার অঞ্চলাবৃত করিয়া না রাখিয়া সে যাহাতে সুশিক্ষিত হইয়া মানুষ হইতে পারে তাহার জন্য উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া, তাঁহার নিজের অবস্থা তেমন না হইলেও নিজে কষ্ট করিয়াও পুত্র বনবিহারীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং এপর্য্যন্ত তাহার সমস্ত খরচ যোগাইয়া আসিতেছিলেন। বনবিহারী যখন ছুটীতে বাড়ী আসিত তখন তাহার মাতা তাহার প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতেন। সে আর এখন মাতার উপদেশ মত একটু সামান্য ভাবে চলিতে পারে না। সে তর্ক করিয়া যুক্তি দ্বারা মাতাকে বুঝাইয়া দিত, কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে গেলে আর অল্প খরচে চলে না। লেখা পড়া শিখিয়া ভালই হইতেছে এই মনে করিয়া মাতা সকল কষ্ট সহিয়া আর কিছু দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে যখন প্রতি মাসে তাহার টাকার অভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পুত্র সর্ব্বদাই "এ চাই তা চাই" বলিয়া বার বার মাতাকে পত্র লিখিয়া টাকা পাঠাইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় জানাইত, মাতা তখন ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই গোপনে সঞ্চিত অর্থগুলি হইতে দুটি চারটি করিয়া বাহির করিতেন।

বনবিহারী যখন ক্রমাগত টাকার অভাব পুরণ করিতে পারিল, তখন শনৈঃ শনৈঃ তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। তাহার বন্ধুরা, সে যেন একটি অর্থশালিনী বিধবার পুত্র বলিয়া ধারণা করিয়া বসিল। বনবিহারীও হুজুগে মাতিয়া দু'পাঁচ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তদপেক্ষা অন্যদিকে মনের আবেগ দমন করিতে ততো আবশ্যক মনে করিত না। ক্রমে সে-যে একটি ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং তজ্জন্যই তাহার মাতা দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতেছিলেন, সে তখন তাহা ভাবিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিল। দিনের পর দিন সে যেন হৃদয়হীন এক অদ্ভুত-জীব হইয়া দাঁড়াইতে ছিল।

৩

অত্যধিক দুশ্চিন্তায় হউক আর যে কারণেই হউক বনবিহারীর মাতা মধ্যে মধ্যে হৃদ্‌রোগের সূচনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু কেই বা তার প্রতিকার চেষ্টা করে, নিজেও তেমন গ্রাহ্য করিতেন না। বনবিহারী অল্প দিনের জন্য বাড়ী আসিয়া একটা না একটা খেয়ালে ফিরিত, দেখিতে দেখিতে তাহার ছুটীর দিন ফুরাইয়া যাইত। মাতাকে দিন দিন দুর্ব্বল এবং অসুস্থ দেখিয়াও কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে নাই। ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া তাঁহাকে শয্যাগত করিয়াছে।

বনবিহারী বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া বারোয়ারীর ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইল। আগামী মঙ্গলবারে পূজা। তাই আজ তাহারা এত ব্যস্ত। মনে পূর্ণ উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া তাহারা চাঁদা আদায়ে প্রবৃত্ত। এবার তাহারা গ্রামে প্রথম বারোয়ারী করিয়া কালী-পূজা করিবে। কলিকাতা হইতে যাত্রার দল, কনসার্ট পার্টি আনাইবে। তাহারা গ্রামবাসীকে দেখাইবে কেমন জাঁক জমকে বারোয়ারী পূজা এবার হইল।

প্রথমে সকলে মিলিয়া জমিদার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রামতারণ বাবু তখন জমিদারীর কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। তিনি একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, কি হে ব্যাপার কি? তাহাদের মধ্য হইতে বনবিহারী বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে আমরা বারোয়ারীর চাঁদার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমরা এবার গ্রামে মায়ের পূজো করছি।

রামতারণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কতগুলি টাকা উঠেচে!

"আজ্ঞে ফর্দ্দ করা হয়েচে, শ'দুই টাকা হোতে পারে, আমরা আপনার কাছে বিশেষ আশা করে প্রথমে এসেছি, এ কাজে আপনিই আমাদের প্রধান সহায়।

রামতারণ বাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বেশ, কাঙালী খাওয়ানর কি বন্দোবস্ত করেচ! বনবিহারী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে তা কিছু করা হয় নি—তবে যাত্রা কনসার্ট—

রামতারণ বাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, এ্যাঁ কাঙালী ভোজনের বন্দোবস্ত করনি? কেবল যাত্রা আর কনসার্ট? সকলে ভয়ে দমিয়া গেল। রামতারণ বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, না-বাপু এখানে কিছু হবে না।

বনবিহারী ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ্ঞে কিছু—

"তবু মিছে বক্ বক্ করচ কেন? কল্‌কাতায় থেকে দু'পাতা ইংরেজী পড়ে তোমাদের মতি গতি এ রকম হয়ে যাচ্ছে কেন! মাতৃ পূজাটা কি শুধু ফুর্ত্তির জন্য? যাত্রা, যাত্রা,—যদি কাঙালী খাওয়াতে সৎকাজে টাকাটা ব্যয় কর্ত্তে, তা হলে বরং কিছু দিতাম।"

সকলে পলায়নের পথ খুঁজিতেছিল। যখন জমিদার মহাশয় "চলে যাও এখান থেকে" বলিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন তখন সকলে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে বনবিহারী বলিল, বুড় ও রকম করবে কে জানে?

আর একজন বলিল, দূর, তুই একটা বদ্ধ বোকা, যাত্রার কথাটা আগেই বল্লি কেন! অপর একজন কহিল, ভাই আমি মনে করেছিলুম যে, বুড় তার সেই কালো পাঁঠাটা মায়ের জন্যে দেবে। শেষে বনবিহারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, প্রথমেই এই রকম বিপাকে পড়তে হোল!

৪

বনবিহারী যখন বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। দরজার সম্মুখে গিয়া মনে পড়িল, সে 'এক্ষুণি আসব' বলিয়া মাকে প্রবোধ দিয়া গিয়াছে। এই কথা মনে হইতেই তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা তীব্র বেদনা ফুটিয়া উঠিল। হায়! মায়ের প্রাণে সে কষ্ট দিয়াছে। এ দিকে চাঁদা আদায় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছে, সে জন্য তাহার মনটা খারাপ ছিল। তাহার উপর আবার মায়ের কথা মনে পড়িয়া মনকে দ্বিগুণ খারাপ করিয়া দিল। মনে পড়িল যখন সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার মা বলিয়াছিলেন, আর তোকে বলব না, একবার বোস্। ওঃ এতই নির্ম্মম সে! মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়াছে!!

বনবিহারী আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা অজানিত আশঙ্কায় প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাতার বিছানার পার্শ্বে একটি কেরোসিনের 'লম্ফ' মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। আর সেই-খানে তাহার মামী ও গ্রামের দুই চারিজন স্ত্রীলোক বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

বনবিহারী সাহসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল মামী মা কাঁদচ কেন? মায়ের কি অসুখ বেড়েছে? প্রথমে তাহার মামী বনবিহারীর

আগমন জানিতে পারেন নাই। তিনি বনবিহারীর কথা শুনিয়া ক্রন্দনের উচ্চ সুরে বলিলেন, আর মায়ের কথা কেন বলছিস্ রে? তোর মা কি আর আছে রে?

বনবিহারীর শরীর একবার শিহরিয়া উঠিল। সে মামীর কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধচিত্তে বলিল এঁ্যা সত্যি—মামীমা?

বনবিহারীর কঠিন অবোধ প্রাণের দ্বার আজ হঠাৎ খুলিয়া গেল। সেই তো তাঁহার মৃত্যুর কারণ। হায়! মা তাহার কত কষ্টে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। প্রাণের ভিতরটা একবার হা-হাকার করিয়া উঠিল। ওঃ এতই পাষণ্ড সে। হায় মা! এর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? রুগ্ন মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়া সে কি-না বারোয়ারীর চাঁদা আদায় করিতে গিয়াছিল। ধিক্ তাহাকে! সে একটা হুজুকে পড়িয়া তাহার মাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। গৃহে এমন সাক্ষাত দেবী থাকিতে সে কি-না একটা মরিচিকার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল। তখন বনবিহারীর আর কিছু ভাবিবার অবসর ছিল না। সে শুধু আবেগ বিহ্বল-কণ্ঠে মৃত মাতার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিল "মা।"

শ্রীসতিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ

বঙ্গ-গৌরব সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন—সাম্রাজ্য সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গিয়া সার্ এস, পি, সিংহ মহোদয় যে প্রকার অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং আমাদের দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বঙ্গজননীর সুসন্তানবৃন্দ মিলিত হইয়া গত ২রা জুন তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন দিনে হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর হরিরাম গোয়েনকা, বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ও মিঃ এন্ এন্ সরকার প্রভৃতি অগ্রগামী হইয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪ঠা সোমবার দিবসে বেলগেছিয়া পাইকপাড়ার রাজাদিগের বাগানে এক সান্ধ্যসমিতিতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ইহা বাস্তবিক উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

ভারতবর্ষের আশা—টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার এক প্রতিনিধির নিকট বিকানীরের মহারাজা বাহাদুর বোম্বাই হইতে রাজপুতনা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন ;—ভারতসম্রাটের কথায় বলিতে হইলে বলিব যে আমরা ভারতবর্ষের জন্য "আশা" বহন করিয়া আনিয়াছি। ভারতবর্ষ যুদ্ধের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার পুত্রগণ রণাঙ্গণে যে শূরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ব্রিটিশ জনসাধারণের চিত্তে যে সদ্ভাব জাগরিত করিয়া দিয়াছে, এমন সদ্ভাব ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের আর কখনও হয় নাই। ইংলণ্ডের প্রত্যেক নরনারী এখন ভারতবর্ষের প্রতি অন্তরে সদিচ্ছার পোষণ করিয়া থাকে, ইহা হইতে যুদ্ধাবসানে কালক্রমে সুফলই লাভ করা যাইতে পারিবে।

বাঙ্গালী সৈন্য—বড়ই শুভ সুসংবাদ এই যে, দিন দিন বাংলার সর্ব্বত্র হইতেই বাঙ্গালী স্ব-ইচ্ছায় দলে দলে আসিয়া সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছেন, এক সপ্তাহে এত গুলি স্থান হইতে সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে—বিক্রমপুর,মালদহ, কশবা-ত্রিপুরা, খোক্সা-পাবনা,চট্টগ্রাম প্রভৃতি ; বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া বহুস্থানে গমন করিতেছেন। তাহার উৎসাহ দেখিয়া বাস্তবিক কত অলস প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইতেছে—আর আমাদের দেশের এক শ্রেণীর ধুরন্ধরগণ সংবাদপত্রে এই সকল দেশ-নায়কের প্রতি নিন্দা বিদ্রুপ বর্ষণ করিয়া কি যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন, জানি না।

মিথ্যা ভয়—মধ্য প্রদেশের চিফ কমিসনার সংপ্রতি এই জন্যে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, অনেকে যুদ্ধঋণে টাকা দিয়া যে কাগজ খরিদ করিয়াছেন, এখনই তাহা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন, তাহাদের মনে এই মিথ্যা ভয় জন্মিয়াছে যে, ঐ টাকা আর ফেরত পাওয়া যাইবে না। এই মিথ্যা ভয়ের মূলে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না, এই দেশের নিরক্ষর সরল লোকদিগকে যে যাহা খুসী বুঝাইয়া ভয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। নিরক্ষরতাই এই দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি, শাসনকর্ত্তারা কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝিবেন না। (সঞ্জীবনী)

মদ্যপানের পরিণাম—মদ্যপানহেতু প্রত্যেক বৎসরই বহুলোক অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ব্যাধির আক্রমনে

মৃত্যু ঘটে বলিয়া উহার বীভৎসতা অতি সুস্পষ্টরূপে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না।

মদ্যপান মানুষকে তাহার মনুষ্যত্ব হইতে কিরূপভাবে বঞ্চিত করে তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। সুরাপায়ী, চরিত্র ও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি এমন জঘন্য দ্রব্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী কুৎসিৎ সুখের লালসায় পান করিয়া থাকে।

দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য বা সুখের নিমিত্ত সুরাপানের প্রয়োজন আছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন না। বরং ইহাই সত্য যে, মদ্যপান মানুষের পাপলালসাকে জাগরিত করিয়া তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। এই কুঅভ্যাস যাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রকার পাপে নিমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকে।

মদ এমনই ভীষণ জিনিষ। কিন্তু এই ভীষণ জিনিষের ব্যবহার ভারতবর্ষে কিরূপ ভয়াবহভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গত ১৯১৫—১৬ সালে ভারতবাসী মদ্যপান করিয়া ১১৪ কোটী টাকা অপব্যয় করিয়াছে। এই ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। মদের দোকান দেশের ছোট বড় নগর ও পল্লী সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে মদের দোকানে যে বীভৎস লীলার অভিনয় হয় তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিবার সাধ্য হয় না। (সঞ্জীবনী)

বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ—আমরা আনন্দ সহকারে এই সংবাদ জনসাধারণকে জানাইতেছি যে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ প্রাথমিক এম, বি, পরীক্ষায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রায় অনুরূপ ফল করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শতকরা ৬৮জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়টির প্রতি দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ এই সর্ব্ব প্রথমে স্থাপিত হইল। এই কলেজের উন্নতি হইলে বঙ্গদেশেরই বিশেষ উপকার হইবে। বিশেষতঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানাভাবে শিক্ষার্থীদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন না, এমন অবস্থায় নূতন কলেজ লোকের বিশেষ অভাব পূরণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যদি প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়, তবে ইহা কলিকাতা মেডিকেল কলেজ অপেক্ষা বৃহত্তর হইতে পারে।

জুয়াখেলার বিষম আকর্ষণ—লটারী বা স্থুর্ত্তীখেলা একপ্রকার জুয়াখেলা। যে কার্য্যে নিজের পরিশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি বা কোন গুণপণা ব্যতীত টাকা পাওয়া যায়, তাহা জুয়া। এই লটারীর জুয়ায় সতত হাজার হাজার লোকের টাকা যাইতেছে, তথাপি উহা মনুষ্যের দুর্ব্বল লোভী হৃদয়কে আকর্ষণ করে, এবং যে দুই চার জন টাকা পায়, তাহা দেখিয়া অন্য অসংখ্য লোকে উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ হয়। ইংরাজরাজ্যে সাধারণের হিতার্থে লটারী খেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু য়ুরোপের প্রায় অন্য সকল দেশে উহা প্রচলিত। তথায় কয়েকটি বড় লটারীতে জনকতক সাধারণ লোকে কত টাকা পাইয়াছে, তাহা শুনুন। এক হোটেলের দাসী ৬ লক্ষ টাকা, করাণা সহরের এক মজুর ৩১ লক্ষ, মিলান নগরের এক রাজমিস্ত্রী ৬ লক্ষ, মেড্রিড নগরের এক ফলওয়ালা ১২ লক্ষ, এক ফরাসী চাষা ৩ লক্ষ এক গরিব কেরাণী ৩ লক্ষ, প্যারিসের এক পাচক ১॥ লক্ষ টাকা। (সময়)

উদ্যমশীল যুবক - বরাহনগর হইতে ইতিপূর্ব্বে "প্রতিবাসী" নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল। শ্রীমান্ সত্যচরণ মিত্র তাহার প্রকাশক ও সম্পাদক। প্রতিবাসী এখন বন্ধ আছে, কিন্তু শ্রীমান সত্যচরণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন, তিনি কিছুদিন হইতে এরূপ একটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান এবং বিগত শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যিক-গণের বিবরণ এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমিক ক্রমশ প্রকাশ করিতেছেন। কার্য্য অতিশয় গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্য বাবুর যে প্রকার উদ্যম উৎসাহ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে এরূপ আমাদের মনে হয় না। তদ্ব্যতীত এ কাজে তিনি অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সহানুভূতি পাইবেন এরূপ আশাও করা যায়। যিনি সৎসঙ্কল্প করিয়া কোন সৎকাজে অগ্রসর হন, তিনি ধৈর্য্যসহকারে যদি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারেন, তবে শেষ ফল আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবেনই।

পতাকা—(প্রাপ্তি স্বীকার) ইহা নমশূদ্র জাতীয় একখানি মাসিক পত্র। ১৩২৪ সালে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কাগজখানির ছাপা, কাগজ উত্তম, মূল্যও বার্ষিক ১৲ একটাকা মাত্র। তবে আকার কিছু ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়। যখন মাসিক পত্র তখন ইহাকে সাহিত্যের হিসাবে জাতীয় পত্র

রূপে করিলে বোধহয় আরো ভালই হইতে পারে। আমরা মনে করি ইহাতে নমশূদ্র জাতির সামাজিক উন্নতিকল্পে প্রধান প্রধান প্রবন্ধ তো থাকিবেই, তা ছাড়া এমন একটা কলম থাকিতে পারে, যাহাতে অনেক ভাল ভাল মাসিকের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এবং নানা বিষয়ের চুম্বক দিয়া যাহাতে ঐ মূল উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী হয়, তদ্রূপ করিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ উহার সম্পাদক যখন শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক এম, এ, বিএল, শিক্ষিত ব্যক্তি, তখন তিনি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে একাজ তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। অবশ্য আমরা ইহা বন্ধুভাবেই প্রস্তাব করিলাম এবং এই কাগজখানির উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার কার্য্যালয় ১৩ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের পুনরুদ্ধার

আজি কিবা শুভ দিন বাংলা দেশের,
লিখিতে লেখনী হাসে
ভাবেতে ভাবুক ভাসে
বীর রসে ভাসমান চিত্ত সকলের।
দেহ শিরে পুষ্পাঞ্জলি পঞ্চম জর্জ্জের—
আর মেরী গুণবতী
—সুশীলা সম্রাজ্ঞী সতী
অটুট হউক খ্যাতি ইংরাজ রাজের
বাঙালী জাতীর নেতা
সমরের অভিনেতা
ব্যোমকেশ বীর-চেতা মানী এ দেশের,
জ্বালিল উন্নতি বাতি
বঙ্গে সুরেশ সুমতি –
রণোৎসাহে উৎসাহিত চিত্ত সকলের—
ভীরুতা নীচতা অতি
রণে মরণের ভীতি

জাগিল দারুণ ঘৃণা মরমে লোকের,
তাই জাগাইল বঙ্গে
খেলিবারে রণ-রঙ্গে
রুধিরের-খড়্গ-খেলা বড়ই সাধের।
ইংরাজ রাজার ভক্ত
ইংরাজের অনুরক্ত
এ কথা বাহুল্য বলা বাঙালী জাতের।
গাও আজি হিমালয়
গাও ইংরাজের জয়
ইংরাজ বিভিন্ন নয়—রাজা আমাদের,
তাঁদের শরণ্য হয়ে
পিধানে বুক বাঁধিয়ে
সদলে মিলিয়া যাও সৈন্য সমূহের ;
তাঁদের শরণ্য হয়ে
ভীষণ অরণ্যে গিয়ে
সাধহ রাজার কাজ পারে সমুদ্রের ;
রমণী অঞ্চল ধ'রে
থাকিব না আর ঘরে
মরিলে সরগে যাব ক্ষত্র-সমরের।

হরিদাস—

দাসের আত্ম-কথা

নূতন পরীক্ষা—নন্দরাম সেনের গলিতে বাসা করা হইল। প্রচারাশ্রম-বোর্ডিং হইতে পুত্র বিনয়ভূষণ ও বরাহনগর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবাশ্রম হইতে ভগিনী ত্রৈলোক্যকে আনা হইল। বিনয়ের মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ হইত, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন হইয়াছিল তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া পড়া শুনা করানো। ভগিনী আরো বেশী উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে খাটুরায় সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিয়া উত্তেজিত করিয়াছিল। নিজেও আর

বোর্ডিংএ থাকিয়া কেবল আত্মোন্নতির চেষ্টায় তাহার মন সুস্থির ছিলনা। আমাদের জন্য তাহার মন অতিশয় চিন্তিত থাকিত, সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ হওয়ায় যেমন ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষ হইতে প্রতিকূল পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল, এ দিকে তেমনি ভগিনীর দ্বারা তাহার অনুকূলতা সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যাইতেছিল।

এখন পুত্র, ভগিনী, অশক্তপত্নীকে লইয়া আমাদের চারিটি প্রাণীর জন্য একটি বাসা করা হইল, ধর্ম্ম-বন্ধু চুণীবাবু হইলেন আমাদের সংসারের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক। — অবশ্য তিনি 'ফকির লোক' অর্থ দিয়া কোন সাহায্য করিবার সম্ভাবনা তাঁহার ছিল না—সে প্রত্যাশা করাও হয় নাই। কেবল পরামর্শদাতা, সহানুভূতিকারী ধর্ম্ম-বন্ধু রূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

বাসা করা হইল। সাংসারিক নিত্য ব্যবহারের জলপাত্র ভোজনপাত্রাদিও আমাদের তেমন কিছু ছিল না, তবে ভগিনীর নিতান্তই সাংসারিক দৃষ্টি; পূর্ব্ব হইতে সে বিষয় কিছু কিছু সংগ্রহ তাহার ছিল, তাই আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হইল না—বাকী মাটীর পাত্রেও কাজ চলিতে লাগিল।

তারপর প্রথম কথা উঠিল, সংসারপাতা হইল—কিন্তু সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের কি উপায় করা হইবে—অবশ্য কোন প্রকার চাকুরীর পথ অবলম্বন করিতে আমি একেবারেই নারাজ—তবে নিজে কোন রকম ব্যবসায় করা,—পূর্ব্বে ঘি চিনির বড় আড়দ্দারী কাজ যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছি, তা ছাড়া অন্য কাজ জানি না, আর সেই ঘি চিনির কাজ করিবার মতো এখন মূলধনই বা কোথায়? এই সকল অবস্থা বুঝিয়া চুণীবাবু বলিলেন, কোন ছোট-খাট কাজ করিতে পারেন কি না? ভগিনীর নিজ বাড়ী বিক্রয়ের দরুণ বোধহয় শ. দুই টাকা বড়বাজারে বন্ধুবর যোগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট জমা ছিল কথা হইল, তাহা লইয়া ঘৃত চিনির খুচরা দোকান করা হউক। ঐ টাকা লইয়া কাজ করিতে ভগিনীর অমত ছিল না।

বড়বাজারে মাসিক ২৫৲ টাকা ভাড়ায় একটি ছোট ঘর লইয়া দোকান করা হইল, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে বুঝা গেল এ দোকান চলিবে না, কারণ মাড়য়ারীদিগের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া সত্যভাবে জিনিষ বিক্রয় করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মিথ্যা প্রবঞ্চনার সহিত সংগ্রাম করিয়া দাড়ানো শত শতর মধ্যে একজনের পক্ষে অসাধ্য। সাধারণ ক্রেতাগণ কোথায় প্রবঞ্চণা

কোথায় অপ্রবঞ্চনা তদন্তে সময় দিতে অপ্রস্তুত. মূল্য সুলভের দিকেই সকলের লক্ষ্য। যাহা হউক কয়েক দিনেই তাহা বুঝিতে পারিয়া দোকান উঠাইয়া অর্দ্ধ বিক্রেয় ঘৃতের কানেস্তারা ও চিনির বস্তা বাসায় আনা হইল। অধিক দিন এই দোকান রাখিলে ঘর ভাড়ায় যৎসামান্য মূলধনের অধিকাংশ চলিয়া যাইত।

তার পর আমাদের পরামর্শ স্থির হইল, বাসাবাড়ীর নীচেকার সম্মুখের যে ঘর খালি আছে, তাহা ভাড়া লইয়া ঐখানে চাউল, দাউল, ময়দা, ঘৃত. চিনি ইত্যাদি সর্ব্ব রকম জিনিষের এক দোকান করা হউক—কয়েক দিনের মধ্যে তাহাই হইল; জিনিষ বিক্রয় ও ওজন-পত্র করিয়া দিবার জন্য একজন দোকানদারের প্রয়োজন, তাহাও ঠিক মতো পাওয়া গেল—আমার পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধ নফরচন্দ্র ঘোষের পুত্র কৃষ্ণ ঘোষ সন্তোষ পূর্ব্বক আমাদের নিকট কাজ করিতে স্বীকৃত হইল, দোকানের সাজ সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল।

কয়েক দিনের মধ্যে দোকান খোলা হইল। চুণীবাবু হইলেন দোকানের প্রধান পরিচালক। পাড়ায় যাঁহারা সম্রান্ত গৃহস্থ, প্রায় অধিকাংশই আমাদের গ্রাহক হইলেন। চুণীবাবু সর্ব্ব রকমে উৎসাহ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে—অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—চুণীবাবু যুবাকাল হইতে অন্ধ, কিন্তু এমনই অন্তঃদৃষ্টি এবং সতর্ক ভাব তাঁহার যে, অনেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকেও তাঁহার নিকট বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়. যাহা হউক দোকানের প্রতি তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

দোকান সম্বন্ধে আমার প্রধান কার্য্য ছিল, বড়বাজার হইতে ঘৃত চিনি খরিদ করিয়া আনা। আমাদের দোকানের মূলধন অতি সামান্য, এদিকে অধিকাংশ গ্রাহকগুলি যাহা হইল সকলেরই টাকা মাস কাবারে লইতে হইত, সুতরাং তাহাতে দোকান চালার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু বিধাতার কৃপায় স্বভাবত একটি উপায় হইল। আমি এতদিনের পর কঠোর বৈরাগ্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সাংসারিক ভাবে উপায়-উপার্জ্জন দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছি দেখিয়া আমার আত্মীয়গণ—বিশেষত বাবু জয়গোপাল পাল ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত সেন, এবং আমার পূর্ব্ব অংশীদার রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোং ফারমের রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে বাজারচলিত নিয়মানুসারে ঘৃত ও চিনি ১৪ দিনের মুদ্দতে (ক্রেডিটে) দিতে লাগিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে ঐ দুটি মূল্যবান জিনিষ অল্প লাভে নগত টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহাতে চাউল

ময়দা তৈলাদি বিবিধ দ্রব্য খরিদ হইতে লাগিল। এবং কুমারটুলির বড় বড় আড়দ্দারদিগের নিকট হইতে চাউল ঐরূপ ১ মাসের মুদ্দতে বা ডিউতে পাওয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ কয়েকটি সুযোগ সুবিধা পাইয়া এবং অনেক পরিশ্রম করিয়াও দোকানের কার্য্যে একটি অসুবিধা দূর করিতে পারা গেল না সে-টি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। ঐরূপ সামান্য দোকানে মাসিক ৫০৲ ৬০৲ টাকা আয় হওয়া নিতান্ত সামান্য নয় কিন্তু ব্যয় হইতে লাগিল,—আমাদের দুটি সংসারের, অর্থাৎ আমার ও চুনী বাবুর কতক ব্যয় এবং দোকানের ভাড়া, কৃষ্ণ ঘোষের বেতন ও খোরাকী সমস্ত রকমে ৮০৲ ৯০৲ টাকা।

কয়েক মাস ধরিয়া আয়ের পথ বৃদ্ধির অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হইল না। কাজেই একবৎসর দোকান চলিয়া ক্রমে বড়বাজারের ডিউমত টাকা দিতে না পারায় মাল পাইতে বাধা জন্মিতে লাগিল। এ সময় দোকানে উপযুক্ত জিনিষের অভাবে যথাসময়ে গ্রাহকদিগের সরবরাহের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সুতরাং দোকান বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিতে লাগিল।

এই তো গেল দোকান সম্বন্ধে বৈষয়িক কথা—তার পর আমার মন রাজ্যের কথা,—একমাত্র বিধাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কলিকাতায় আসিলাম, আসিবার দু'দিন পুর্ব্বেও হাতে এক পয়সা ছিলনা, ভগিনীরই দরুণ ১৫৲টি টাকা ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিতের নিকট অতিরিক্ত হিসাবে পাওনা ছিল, ঐ টাকা কয়টি ডাকে আসিয়া পৌঁছায়। তাহাই লইয়া কলিকাতায় আসা হয়। তার পর দোকানের মূলধনের কথাও বলিয়াছি। কিন্তু যখন একবৎসরে মূলধন গিয়া আরো কিছু দেনা হইল, তখন তো নিতান্তই মন খারাপ হইবার কথা, কিন্তু বাস্তব আমার যত দূর স্মরণ আছে তাহাতে মনে হয়, তজ্জন্য আমার বিশেষ মন ভঙ্গ হয় নাই। মন ভঙ্গ হইবার দ্বিতীয় গুরুতর কারণ, এখন তাহাই বলিব।

প্রথম যে দিন বাসা আরম্ভ হইল, সেই দিনই এক পরীক্ষা উপস্থিত। অবশ্য আমি বা আমরা সাত বৎসর কাল নিরামিষভোজী হইয়া আসিয়াছি, আজ বিনয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সামিষ ঝোল প্রস্তুত হইয়াছে। বন্ধুবর চুনী বাবু ১০টার মধ্যে আহার করিয়া আমাদের বাসায় আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় আমাদের নিরামিষ আহার সম্বন্ধে কথা হইল যে, এখন এ অবস্থায় দুই প্রকার আহার্য্য প্রস্তুত নিতান্ত অসুবিধার কথা—বোধ হয়, ভগিনী এইরূপ ভাব প্রকা

করেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া চুণীবাবু তার পর এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, আহারের উপর যে ধর্ম্ম নির্ভর করে তাহা অতি লঘু। ধর্ম্ম, অন্তরের জিনিষ আহারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অবস্থাগত। এখন আপনার যে অবস্থা— ছেলেটিকে যাহা খাওয়াইবেন আপনারাও তাহাই খাইবেন। ফলত তখন অবস্থা সেইরূপই দাড়াইতেছিল, সুতরাং আর আমাদের নিরামিষ আহারের বিশেষ আঁটা আঁটি রহিল না। একটি নিষ্ঠা ভাঙিল।

তার পর দোকানের কার্য্যে দেখা গেল, অনেক কথা যাহা বলা আমার পক্ষে বাধা বোধ হইতে লাগিল। সে সকল কথা যে ঠিক সত্য বলা হইবে তাহা আমার মনে হইত না—যেমন একজনকে অমুক দিনে টাকা দেওয়া হইবে বলা হইল, কিন্তু আমি দেখিতাম তাহার সম্ভাবনা নাই, অথচ না বলিলে কাজের অসুবিধা হয়। এইরূপে যখন আমার মনে বাধা বোধ হইতে লাগিল, তখন চুণীবাবু ক্রমশ এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সত্য মিথ্যার আসল ভাব ভিতরে—ভিতরে সদ্ভাব রাখিয়া—কোন রকমে পরপীড়ন ইচ্ছা না রাখিয়া সাধ্য মতো পরোপকার—পর সেবার ভাব প্রাণে লইয়া সংসারে বুদ্ধিমানের মতো, সংসারের দশজনে যেমন চলে—যেমন বলে, আপনিও যদি সেই ভাবে না চলেন, না বলেন, তবে আপনাকে কেহ বুঝিবে না—কেহ আপনার সঙ্গে কর্ম্ম করিবে না, আপনি কর্ম্মের বাহির—সুতরাং ধর্ম্মের বাহির হইয়া যাহাকে বলে 'কোন্ ঠাষা' হইয়া—না খাইয়া মরিবেন। আর যদি জনসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে চান, তবে ভিতরে ধর্ম্মভাব, -বাহিরে কর্ম্মজ্ঞান লইয়া চলিতেই হইবে। ফলত এইরূপ ধারণাই তখন গৃহীত হইল, ক্রমে মনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তাহা বুঝিয়াও বুঝিবার যেন অবকাশ রহিল না।

তার পর যখন প্রতিমাসে দোকানের লোকসান সম্বন্ধে কথা হইত, তখন চুণীবাবু মাঝে মাঝে বলিতেন—আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করুন—আর না হয় দোকান তুলিয়া দিন। এই কথায় আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিতাম আমি কেমন অবস্থায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, এখন তো দোকান তুলিয়া দেওয়া সহজ নয়।

যখন আমাদের দোকান বাহিরে দেখিতে বেশ চলিতেছে, তখন কেহ কেহ আমাকে গোপনে বলিতেন, চুণীবাবু কি আপনার অংশীদার ? (পার্টনার) তাঁহার তো কোন মূলধন দোকানে নাই, তবে কেন আপনি তাঁহার সাংসারিক

খরচ যোগাইতেছেন? এ কথার উত্তর দোকানের অবস্থাগত চিন্তা-সূত্রে আগেই আমার মনে স্থির হইয়াছিল। আমি মনে করিতাম, যিনি আমাকে অসময়ে সহানুভূতি করিয়া পৃষ্ঠপোষক হইয়া এখানে স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের সকল ভার এক প্রকার যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে—যিনি আমাদের জন্য সময় ও মন দিতেছেন, এখন আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিব? অবশ্য দোকান আমাদের সমগ্র ব্যয় বহন করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম্মবন্ধুর সহিত পার্থিব বিষয় লইয়া নীচ ব্যবহার কখনই করিতে পারি না. দোকান যদি নাই চলে, তখন বিধাতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর মন কষ্টের কারণ হইল এই যে, অল্প দিনের মধ্যে আমি জানিতে পারিলাম যে, বন্ধু আমার অজ্ঞাতে ভগিনীকে "মন্ত্র" দান করিয়াছেন, এবং আমিও তাঁহার নিকট কিছু মন্ত্র গ্রহণ করি ইহাও তাঁহার অভিপ্রায়। আমি তাহাতে প্রথমে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কেন না, আমার বিশ্বাস তাহা নহে। আমার মনে পূর্ব্ব হইতে যে বিশ্বাস—যে 'গুরুজ্ঞান' আছে, সেখানে অন্যের স্থান ছিল না; তার পর যখন তিনি এইরূপ বুঝাইলেন যে, উহা আর কিছু নয়, আমরা একভাবাপন্ন হইয়া এক শক্তিতে কাজ করিবার পক্ষে সহায়তা করিবে, তখন আমার মন নরম হইয়া গেল, একদিন মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, কিন্তু অল্প দিনে তাহা আমার মন হইতে চলিয়া গেল, সে মন্ত্রশক্তির কোন কাজ আমার মনে হয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া এবং তাহার পূর্ব্বেও অনুভূত হইয়াছিল যে, আমরা দীর্ঘকাল ব্রহ্মমন্দিরের প্রমুক্ত স্থানে—বিশুদ্ধ বাতাসে, সদ্ভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা যুক্ত অবস্থায় থাকাতে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে, এখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্বাভাবিক বলেরও অনেকটা সঞ্চার হইয়াছে—কেবল দুই পায়ের শিরা (আটারী) বদ্ধ হইয়া দাড়াইবার উপায় ছিল না। সমতল স্থানে কিছু দুর চলাচল করিতে পারিতেন, এ অবস্থায় যখন জানা গেল যে. সরলকুমার গর্ভস্থ, তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, কিন্তু চুণীবাবু তখন বলেন, ভয় নাই, যে স্বভাবে (নেচারে) আসিয়াছে, সে নিরাপদে নেচারে প্রসূত হইবে—বস্তুত তাহাই হইল। ১৩০১ সালের ৯ই মাঘ সরল ভুমিষ্ট হইল, দোকানও সেই দিন হইতে বন্ধ হইল। (ক্রমশ)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গা দেওয়ান-বাটীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়বিহারী যকৃতের পীড়াক্রান্ত হইয়া দুই মাসাধিককাল মেডিকেল কলেজে থাকার পর গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। বিনয়বিহারী বাল্যকালে সুখ-সম্পদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত; সুখেই পুষ্ট সুখেই বর্দ্ধিত। কিন্তু তাঁহাকে মধ্য যৌবনের পথেই দুঃখের মুখ দেখিতে হইয়াছিল। স্ত্রী বিয়োগের পর কয়েক বৎসর কাশীতে কালাতিপাত করিয়া তার পর এই রোগাক্রান্ত হইয়া যখন হাঁসপাতালে ছিলেন,তখন আমরা তাঁহাকে দেখিলাম। তখন তাঁহার হৃদয়ের ভাব কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার মুখে ঈশ্বরের কথা—বিনয় ভক্তির কথা শুনিয়া আমরা বাস্তবিক সুখী হইয়াছিলাম। তাঁহার অগ্রজ বাবু বিজয়বিহারী আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আপনি ঐকান্তিক যত্নে আমার ভ্রাতা বিনয়বিহারীর হাঁসপাতাল-জীবনের নৈরাশ্য অবসান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় বিনয়বিহারী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরপারে মহা যাত্রা করিয়াছেন। শ্মশানে সেই হাস্যময়ী মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, প্রাণাধিক বিশ্বপিতার প্রেম ক্রোড় লাভে চরিতার্থ হইয়াছে। সে মুখে মৃত্যুর গ্লানি নাই, হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস জনিত বেদনা নাই, সে এক শান্ত, শুদ্ধ,পবিত্র; তাহাতে যেন পিতার আশীর্ব্বাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করুণ, সেই আত্মা অমৃত-সুধা পান করিয়া পূত হয়।" শ্রীবিজয়বিহারী।

শ্যামবাজার মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে "শ্যামবাজার জগদ্বন্ধু পণ্ডিতের স্কুল" বলিলে কথাটা সকলে শীঘ্র বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ একাদিক্রমে ৫০ বৎসরাধিক এই স্কুলের কার্য্যে জীবনাতিপাত করা বড় কম কথা নহে। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে এই স্কুল স্থাপিত, ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ইনি ২২ বৎসর বয়সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। তখন ইহা গভঃ সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। তা ছাড়া পণ্ডিত মহাশয় শেষ জীবনে (৭২ বৎসর বয়সে) স্কুলের একটি নিজস্ব-গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন ইহাও তাঁহার জীবন-ব্রত

উদ্‌যাপনের ফলস্বরূপ হইল। প্রথমে যে দিন স্কুল-গৃহের উন্নত চূড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িল, সে দিন বড়ই আনন্দ হইল। ঐ চূড়ার সঙ্গে যাঁহার নাম স্মরণ হয়, তিনি যে আমাদের কুশদহবাসী, তাই তাঁহার গৌরবে আমাদের এত আনন্দ। বলা বাহুল্য এই স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণে পণ্ডিত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কাশীমবাজার-মহারাজের বিশেষ সাহায্যে আর সকল সাহায্য কার্য্যকরী হইয়াছে।

যে বস্তু সুলভ হয় সাধারণের নিকট তাহার তেমন আদর থাকে না; আমাদের ইংরাজ গভর্ণমেন্ট উপাধি বিতরণে যেন নিতান্তই মুক্তহস্ত হইয়াছেন। এইজন্য যেন উহা অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? যাহা হউক প্রিয়জন অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির সম্মান এবং গৌরব বৃদ্ধি হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের কুশদহস্থ চৌবেড়িয়া-গৌরব-রবি—অমর কবি স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের ৫ম জজ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের দ্বারে রায় বাহাদুরের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় আমাদের 'কুশদহ' পত্রের একজন হিতৈষী বন্ধু; তিনি কলিকাতায় বহু দিন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় বৃন্দাবন মল্লিকের ফাষ্ট লেনে একখানি ত্রিতল নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তাহাতে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, ইতি পূর্ব্বে দুইটি পুত্রেরও পর পর বিবাহ দিয়াছেন। আমরা বন্ধুর পার্থিব উন্নতিতেও আনন্দিত। ভগবানের দ্বারে কামনা করি তিনি ইহলোকের সম্পদলাভে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল পালন করিয়া পরমার্থ-সম্পদ সঞ্চয়েও সক্ষম হউন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন। কুশদহ-পঞ্জি, অর্থাৎ কুশদহবাসীর পারিবারিক বংশাবলী বিবরণ সংগ্রহ কার্য্যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। স্থানীয় লোক হইলেই ভাল হয়। এ কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। এই কার্য্য ভার গ্রহণেচ্ছুক সত্বর কুশদহ কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট লিখিয়া বা সাক্ষাতে জানাইতে পারেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৪ { তৃতীয় সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

যে তোমারে চাহে না হে—তারে তুমি চাহ চাহ," হে প্রভু! মলিন মানব তোমায় চায় না, তুমি তারে চাও। নতুবা পাপীর গতি কি হইত? তোমার শরণাগত দাসদিগকে বুঝি তোমার ঐ স্বভাব দাও? তাই তাঁহারাও নিয়ত তাপিতজনকে তোমার পথে ডাকেন,—মোহান্ধ নরনারীর দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেননা। নানাবিধ উপায়ে মানবের অজ্ঞানতা দুরের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহারা জন-সমাজের অন্যান্য দুঃখ দূর এবং উন্নতিবিধানের জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করেন, তাহাও ঐ উদ্দেশ্যে—মানবাত্মার দিকেই লক্ষ্য করিয়াই করেন। কিন্তু প্রভু, নরজাতি এমনই বধির হইয়াছে যে, নিজ নিজ অন্তরে বিবেক নিয়ত যাহা বলিতেছে তাহা যেন শুনিয়াও শুনিতে পায় না। ভক্ত-বিশ্বাসীগণের ডাকও তাহাদের কর্ণে পৌঁছায় না। প্রভু, তুমি যাঁহাদিগকে ঐরূপ ডাকিবার প্রবৃত্তি দিয়াছ,তাঁহারা আর কি করিবে বল? তাঁহারা তো জীবনান্ত পর্য্যন্ত ডাকিবেনই। ঐ ডাকাতেই যে তাঁহাদেরও মুক্তি নির্ভর করিতেছে। প্রভু আমি তোমার এমনি অযোগ্য দাস যে, তোমার সন্তান সন্ততিগণকে তেমন করিয়া ডাকিতে পারিলাম না, ইহা বেশ অনুভব করিতেছি; কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ—যাহা শত পরীক্ষাতেও গেল না, তাহাতেই অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছি। এখন শক্তি দাও, বাকি দিন কয়টা যাহাতে গভীরভাবে ডাকিতে পারি। তোমার কৃপায় একদিন নিশ্চয়ই এ ডাক সফল হইবেই।

যুদ্ধের পর আমাদের অবস্থা

আশার কথা।

যুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থা—অথবা ভারতবর্ষের অবস্থা, বাংলা দেশের অন্ততঃ আমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে ইহা সকলেরই আন্দোলনের বিষয় হইয়াছে। সমস্ত সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছে। যিনি যে দিক দিয়া যাহা বুঝিতেছেন, তিনি সেই ভাবেই মতামত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য আমরাও এ চিন্তার বাহিরে নহি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

আমাদের চিন্তা—ধারণা, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কিম্বা শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া নহে। অন্তঃরাজ্যের সঙ্কেতানুসারেই যাহা কিছু বলিব। জানি না, এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই হয়তো আমাদের অধিকাংশ পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধের প্রকৃতি বুঝিয়া এইখানেই পাঠ বন্ধ করিবেন। তবে অনুগ্রহ করিয়া যাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন অন্ততঃ ততটুকু স্বার্থকতা আছে মনে করি।

প্রবন্ধের প্রকৃত প্রশ্ন—যুদ্ধের পর মোটের উপর পৃথিবীর অবস্থা বা গতি কিরূপ দাঁড়াইবে ? আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, ভালই হইবে! অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, এ-জন্য কিছু কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিব।

যাঁহারা বলেন, এক অবিচ্ছিন্নকালের মধ্যে সত্য, ত্রেতা; দ্বাপর এবং কলি, এই চারি যুগ ভেদে, সত্যযুগে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ উন্নত, বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব পূর্ণ ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে কলিযুগে পৃথিবীতে কেবল রোগ জরা শোক তাপ, আর পাপ পূর্ণ হইয়াছে। এই ঘোর কলি পূর্ণ হইলে পৃথিবীর প্রলয় হইয়া আবার সত্য যুগাদি আসিবে—ইত্যাদি। আমরা এই মতে বিশ্বাস করি না, কারণ ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অযৌক্তিক কুসংস্কার মাত্র। ইহা বড়ই সু-সংবাদের কথা যে,মহাত্মা ডারউইনের "ক্রমোন্নতিবাদ" আজ জগতে সর্ব্ববাদী সম্মত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ ক্রমোন্নতিবাদ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সম্মত। এই জগতের স্রষ্টা অনন্ত। অনন্তশক্তির সৃষ্টি অনন্ত-উন্নতিশীল ইহাই স্বাভাবিক। প্রলয় বা মহাপ্রলয় অথবা সর্ব্বতোভাবে ধ্বংশ, এ কথা নিতান্ত

অশ্রদ্ধেয় অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক। তবে ক্রমোন্নতির গতি বা মানে এ নয় যে, কেবল একটানা উন্নতি। উন্নতি বলিলেই বুঝিতে হইবে, উত্থান পতনের ভিতর দিয়া উহার গতি। পর্ব্বতশিখরে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহারা জানেন যে, যখন কোন পাহাড়ের উচ্চশিখর দেশে উঠিতে হয়, তখন উচ্চদিকে চলিতে চলিতে কখন নীচের দিকেও গতি বোধ হয়, বাস্তব সে-টা নীচে নামা নয়, সে-টাও পার্ব্বত্যপথের গতি অনুসারে একমাত্র আরোহণ।

সাধকগণের ব্যক্তিগত জীবনের গতিও ঐরূপ স্বাভাবিক। একবার মনে হয় জীবনের গতি, বিশ্বাস ভক্তি যেন ম্লান হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু এক-নিষ্ঠ সাধক দেখেন, তাহার মধ্যেও সত্য আছে। সময় সময় তাহার প্রয়োজন আছে, অন্তত তাহা হইবেই। ইহা সূক্ষ্মভাবে অন্তঃরাজ্যের কথা—এ ছাড়া স্থূলভাবে কর্ম্মজীবনেও কখন উৎসাহ কখন শিথিলভাব দেখা যায়। সমাজ গত, জাতিগত ভাবের মধ্যেও এই গতি আছে।

তার পর এই জগতের স্রষ্টা প্রেমময়। তিনি প্রেমে সৃষ্টি করিয়া প্রেমে পালন করিতেছেন, ভক্ত-বিশ্বাসী ভিন্ন সে তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না। প্রেমময় সন্তানকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধ্বংস করেন না। কিন্তু অনন্তউন্নতির বিধান করিয়াছেন।

এইবার প্রকৃত বিষয়ের কথা বলিব। এই সর্ব্বনাশী বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের পর কিসে জগতের মঙ্গল হইবে—যেরূপ লোকক্ষয়, যে প্রকার অর্থ ক্ষয় হইল তাহা আবার কতকালে পূর্ণ হইবে কে জানে। ইউরোপের ধনক্ষয়ে আমরাও ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছি—আরো যে হইব না, কে বলিল, তবে আর মঙ্গল কোথায় ? এই কথাই তো সকলে ভাবিতেছেন।

যাহা অধিকাংশে ভাবিতেছেন, তাহার মধ্যে যে কিছু সত্য নাই তাহা নহে। বাহ্য জগতের যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইল তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু এই ক্ষতি হইবে বলিয়াই তো মহা যুদ্ধের আরম্ভ। তবে একটা কথা আছে নদীর এককুল ভাঙ্গিলে আর এক কুল গড়ে। আমরা বলি এই ভয়ঙ্কর ক্ষতির ফল স্বরূপ অন্তর্জগতের মহামঙ্গল হইবে। প্রবল প্রতাপান্বিত পাশ্চাত্য জাতি সকলের—বিশেষত ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-চিন্তা স্রোত এইবার ফিরিতেই হইবে।

সকলকালে সকলদেশের মানবজাতির ইতিহাসেই দেখা যায়, মানবের অন্তর্জগতের চিন্তা এবং সাধনার তখনই উন্নতি সূচীত হইয়াছে,যখন বহির্জগতের

ধন, মান, পদগৌরবের আলোক খর্ব্ব হইয়াছে। ইউরোপের বাহ্ বিষয়ে এত ক্ষয়ে অন্তর্জগতের কিছুই লাভ হইবে না, এ কথা কে বলিতে পারেন ?

যাঁহারা প্রাচীন ভারতের চরমোন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, সে উন্নতির মূল কারণ কি, কোন্ বস্তুর উন্নতিতে ভারত উন্নত হইয়াছিল—কেবল কি সাম্রাজ্য-সম্পদে ? না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সকল উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছিল। সে জ্ঞান কোন্ জ্ঞান ? বাহ্যজগতের জ্ঞান, না ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান ? ঋষিরা কোন্ জ্ঞানে জ্ঞানী, কোন্ ধনে ধনী হইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা প্রাচীন সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ? তাঁহারা কোন বস্তুর সঙ্কোচন করিয়া কোন বস্তু লাভ করিয়াছিলেন ? পৃথিবীতে কি কেহ কখন দেখাইতে পারেন যে, আসক্তি এবং ভক্তি একত্রে লাভ হইয়াছে ?

বর্ত্তমান ভারতে যে উন্নতিকামনার চীৎকার ধ্বনি শুনা যাইতেছে, সে কিসের উন্নতির জন্য ? প্রভুত্ব অভিমান অহঙ্কার, সম্পদঐশ্বর্য্যের ক্রোড়েই স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হয়। বহির্জ্জগতের উন্নতি কামনা, এবং ভোগলালসা, ব্রহ্মবিদ্যা-বিরহিত বহির্বিজ্ঞান, আজ জগতকে এই শিক্ষা দিল যে, ইহাই যথেষ্ট নহে, আরো কিছু চাই—তাহা সমগ্রভাবে চাই—সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বান্তঃকরণে চাই এইবার আবার নূতন করিয়া তাহার সাধনা আরম্ভ কর।

ইউরোপের গতি পরিবর্ত্তনে আমোদেরও যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। আমাদের উন্নতিপথের অনেক বাধা দূর হইবে। আমরা বিলাসিতার দিকে—জড়াসক্তির দিকে যে প্রকার প্রবলভাবে যাইতেছিলাম, এই ধনক্ষয়ে অন্ততঃ পক্ষে তাহাতেও যে ধাক্কা না লাগিল এমন নহে। সে-টা আমাদের পক্ষে মঙ্গলেরই বিষয়।

তার পর সাম্রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও আমাদের এখন ক্রমশ উন্নতি ভিন্ন অবনতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, ভারতবাসী দায়িত্ব জ্ঞানে এবং চরিত্রবলে যত উন্নত হইবেন, ইংরাজ জাতির নিকট ততই সম্মানিত হইয়া উপযুক্ত কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

তার পর শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের যে হঠাৎ অধিক উন্নতি হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না, তবে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্তবশত ভারতে কাঁচামালের রপ্তানীতে ও কিছু কিছু কৃষির উন্নতিতেও এখন ভারতের অনেক উন্নতি হইবে, আর উচ্চপদের চাকরীতো আছেই। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতা প্রধান দেশ, এখানে ঠিক্ ইউরোপের ন্যায় কলকারখানার উন্নতি

যদি সম্ভবপর বলিয়া মনে নাও হয়, আমাদের প্রয়োজনানুরূপ জাগতিক উন্নতির সঙ্গে মানসিক—আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। ভারতের কর্ম্ম-শক্তি যদি একান্ত প্রবল হইত, তাহার পরিচয় এই সময় কিছু পাওয়া যাইত।

চুণী

—০—

(সাঁওতালী গল্প)

লতা পাতায় ঘেরা প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি (কিস্‌কু আতো) সেই ছোট গ্রামখানি মেঘেরকোলে সুনিপুনচিত্রকরের একখানি চিত্রের মত।

সে গ্রামে কেহ দুঃখী ছিল না। নিঃস্ব থাকিয়াও কেহ কখন অন্ন-কষ্ট ভোগ করে নাই। এমনই সে গ্রামের মহিমা—এমনই সে গ্রামের প্রাণ। কি করিয়া জানি না, মাতার স্নেহ-হস্ত দিয়া সেই গ্রামখানি সকলকে সমানভাবে প্রতিপালন করিত।

সেই 'কিস্‌কু' গ্রামে মনের সুখে বাস করিত 'চুণ্ডা'। সে কিন্তু নিঃস্ব—দরিদ্র—কপর্দ্দকহীন। আজ বাদে কাল কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই চুণ্ডার, তথাপি সে সুখী, তাহার যে-টি কাম্যবস্তু সে-টি সে প্রাণের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে সুখী। সে প্রাণের জিনিষ চুণী। দাশো মাঝির কন্যা সে। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের ভিতর দিয়া যেন তাহার সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছিল। প্রথম যৌবনের মধুর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের উপর সৌন্দর্য্যের জোয়ার বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই যৌবনঅর্ঘ্য সে চুণ্ডার পদতলে উবুড় করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে পাইয়া চুণ্ডার অন্য কোন চিন্তা ছিল না—ছিল কেবল চুণীর ঢল ঢল মুখখানির চিন্তা। যখন তাহারা নির্ম্মল (ঝারনা) ঝরণার পার্শ্বে বসিয়া নিজ নিজ সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিত, তখন চুণীর কথাগুলি যেন (রাড়ে'র) সুরের মতো চুণ্ডার কানে আসিয়া বাজিত। তাহার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সে যেন কোন স্বপ্নদেশে উধাও হইয়া যাইত। আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িত। চুণী যখন মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিত (ওনে যে বুরুঞেলঃ কানা অমা হানা সাহারে ওকাদিশম্‌ মোনাঃ চুণ্ডা ?) ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওর ওপারে

কোন্ দেশ আছে চুণ্ডা? এই ষোড়শী যুবতীর মন প্রাণ এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানির মধ্যে আবদ্ধ দেখিয়া চুণ্ডা বড় খুসি হইত। হায়, সরলা চুণীর প্রাণ যদি চিরদিন এইরূপ থাকে! চুণ্ডা আবেশ-বিহ্বলকণ্ঠে একটু মধুরহাসি হাসিয়া বলিত, (আরও আম্‌দা দিশম্ হেনাঃ চুণী) অন্য অনেক দেশ আছে চুণী, সে সকল আমাদের এ দেশের মত নয়, সে সকল কেবল একটা প্রলোভনের রাজ্য—এমন আনন্দ সেখানে পাওয়া যায় না। চুণ্ডা মাঝে একবার 'কিসকু আতো'র বাহিরে গিয়াছিল বলিয়া এই কথাগুলি বলিল। সেখানে সে মুহূর্ত্তের জন্যও চুণীর মুখখানি দেখিতে পায় নাই। পাহাড়ের ওপারে যে সকল গ্রাম আছে, সেই সকলের প্রতি তাই তাহার এত ঘৃণা।

বিকচোন্মুখ পুষ্পের ন্যায় চুণীর মুখখানির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চুণ্ডা বলিল, চুণী আমাদের জীবনটা যদি এই রকম সুখে কেটে যায়, তা হ'লে আমাদের দুঃখ আর থাক্‌বে কোথায়?" চুণী মনের আনন্দে একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া চুণ্ডার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বেদনা-মধুর স্বরে চুণ্ডা জিজ্ঞাসিল, তোর বাপ যদি তোকে আমায় না দেয় তা হ'লে সব-আনন্দ ঘুচে যাবে চুণী, তোর বাপ বড় লোক আমায় তোকে দেবে কেন? বলিয়া চুণ্ডা ছল ছল নেত্রে একবার চুণীর পানে চাহিল, বড় কাতর করুণ সে-দৃষ্টি। চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল। ঐ দুই বিন্দু অশ্রুই যেন চুণীর প্রতি তাহার সব হৃদয়ের ভালবাসাটুকু দেখাইয়া দিতেছিল। চুণ্ডার প্রাণে একটা মস্ত আঘাত লাগিয়াছে বুঝিয়া চুণী বলিল—কাঁদচিস তুই? কেন কাঁদচিস্ চুণ্ডা? তোর কান্না দেখলে আমার মন ভেঙে যায়—চোখে জল আসে, বাপ মার অনুরোধে প্রেমের গতি রুদ্ধ হবে না, এটা মনে রাখিস চুণ্ডা। আমি আজ কালীর নামে এই শপথ ক'রে বলচি তোকে ভিন্ন আর কাকেও বিয়ে কর্ব্ব না। চুণ্ডা চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—(কিরিয়া এলাম?) দিব্যি করে ফেল্লি? এ কথা মনে রাখ্‌তে পার্ব্বি ত? চুণী অভিমানেরসুরে মুখ ফিরাইয়া কহিল, এত অবিশ্বাস করিস্ আমাকে—চুণ্ডা? চুণ্ডা তাহার ব্যথা মুছাইবার জন্য চুণীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গানটি বাঁশীর সহিত সুর মিলাইয়া গাহিল—

"সানাম সাকা এমঃইঃদো
আপাহন ধরম জিতিহো
সের্মা আর মঞ্চ পুরিয়ে
উনি বাড়ে সাইাঙেপে।"

অর্থাৎ—সর্ব্ব আশীর্ব্বাদের দাতা—পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মা। স্বর্গ এবং এ পৃথিবীতে তাঁহারই প্রশংসা গান হউক।

সে গানের সুর যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া সারা গ্রামখানির উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সে গীতে চুণীর হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। যখন সে গীত নিস্তব্ধ হইল, তখন একটি গভীর নিশ্বাস চুণীর অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রাণে যে তুফান বহিতেছিল, তাহা আরও বেগে বহিয়া চলিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মধুর অলস-সৌন্দর্য্য কিস্কু গ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই মৌন-সন্ধ্যায় তাহারা অলস-পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, সেই গীতে তাহাদের প্রাণে যে ভাবের হিল্লোল বহিয়াছিল সে হিল্লোল চিরকাল বহিবার জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট কামনা করিল।

* * * * * *

চুণীর সৌন্দর্য্যে পাগল হইয়াছিল, আর একজন—সে ধনী-সন্তান মুন্না। বলিষ্ঠ সুডৌল তাহার দেহ। অমানিশার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাহার গাত্র। মুন্নাকে দেখিলেই প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইত। আর চুণ্ডার শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাহার উপরে কে যেন এক কমনীয়তাররাশি ছড়াইয়া দিয়াছিল। তাই সে চুণ্ডাকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রামে বহু সুন্দর ধনী যুবক থাকিতেও চুণী অপর কাহাকেও ভালবাসে নাই. কি জানি কেন কিসে ভুলিয়া সে চুণ্ডাকেই ভালবাসাটুকু নিঃশেষে দান করিয়া ফেলিয়াছিল। আর চুণ্ডাও চুণী ভিন্ন অন্য কাহাকে ভালবাসিতে শিখে নাই। চুণী নাম শুনিলে সে দিশেহারা হইত। এই রকমভাবে তাহারা জীবনটাকে কাটাইতেছিল।

কিন্তু সে সুখের মাঝে এক কণ্টক আসিয়া জুটিল, সে—মুন্না। বহুবার গোপনে সে চুণীর নিকট তাহার ভালবাসার কথা জানাইয়াছিল। তাহার হৃদয় যে এতদিন তাহারই পানে অবিশ্রান্তগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহাও সে জানাইল। কিন্তু চুণী সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল। সে চুণ্ডাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা দিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা পাইয়াছে। তবে কি করিয়া সে ব্যাভিচারিণী হইবে। যে প্রেম একজনের প্রতি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে সে প্রেমের গতি অন্যেরপানে কি করিয়া ফিরাইবে। তাই সে বলিয়াছিল, ও-যে হ'তে পারে না মুন্না, একজনকে যে ভালবাসা দিয়ে ফেলেচি, সে

ভালবাসা আবার নেব কি কোরে? তা পারব না। তুমি যাও, আমায় জ্বালিও না। প্রলোভন দেখিও না। প্রেমের কাছে প্রলোভন তুচ্ছ। শত প্রলোভন দেখালেও এ-প্রেমের অধিকারী তুমি হবে না এ টা জেনো। মুন্না কাতর-করুণ দৃষ্টিতে বলিয়াছিল, (চুনী—আম্‌বাং খান্দোং ইঞা জিউই বিরথা গেয়া। ইং সেওে দয়াঃ মে) চুনী তুমি না হোলে আমার জীবন ব্যর্থ হোয়ে যাবে—তুমি আমায় কৃপা কর। বলিয়া চুনীর পদতলে পড়িয়া তাহার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু চুনী তবুও সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার হাত দুইখানি সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, মুন্না বড় অন্যায় কোরচ তুমি। এখুনি যদি চুণ্ডা এসে পড়ে তাহলে আস্ত রাখবে না। তুমি চলে যাও। আমি যদি এ কথা চুণ্ডাকে জানাই ত সে একটা অনর্থ ঘটাবে. যাও বলছি। মুন্না ব্যথিত হৃদয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে চুনীর হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আর তাহার প্রেমের গতি ফিরাইতে পারে না, তাই সে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হৃদয়ে মুন্নার ব্যথা জানিয়াও আকাশের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

আর একদিন একটি বৃক্ষের নীচে বসিয়া চুনী কি চিন্তা করিতেছিল। তখন অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান তেজহীন আলোক, দূরস্থিত পাহাড়ের উপরে পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল। চুনী যেখানে বসিয়াছিল. সেখান হইতে তাহার বাড়ী দূরে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঝোপের আড়ালে এই বৃক্ষটির নিম্নে বসিয়া চুণ্ডার প্রতীক্ষা করিত। সে দিনও সে তাহারই আশায় বসিয়াছিল। চুনী হাঁটুর উপর মুখটি গুঁজিয়া অধোমুখে কি ভাবিতেছিল। এমন সময় তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া তথায় মুন্না আসিয়া বলিল, (চুনী আদো বাঁই সাহাও দাড়েয়া কানাই. আমদো ইনিঃ হ'য়ো মে) চুনী আর সইতে পারি না। তুমি আমার হও। চুনী চমকাইয়া উঠিল। আজ যেন মুন্নার স্বর কিছু উগ্র কিছু তিক্ত। চক্ষু রক্ত জবার ন্যায় লাল। চুনী ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, আবার এসেছ? আগে যা বলেচি আজকার উত্তরও তাই। মুন্না. সে-দিন আর থাকিতে পারিল না। চুনীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিবার আশায় ছুটিয়া গেল, কিন্তু পারিল না। পশ্চাদ্দিক হইতে কে আসিয়া তাহার হাতের কব্জিটা সজোরে চাপিয়া ধরিল। চুনী সভয়ে দেখিল—চুণ্ডা। চুণ্ডা সেই সুরাপানোন্মত্ত মুন্নাকে ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। চুনী চকিতে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ছিঃ মেরে ফেলবে না-কি? তুমিও আমায় যেমন ভালবেসেচ মুন্নাও

তেমনি ভালবেসেছিল। ভালবেসেছিল বলে কি তার এত অপরাধ। দোষ কর্ত্তে যাচ্ছিল তা স্বীকার করি, কিন্তু তার এ রকম শাস্তি দিয়ে কি হবে? ছেড়ে দাও ওকে। বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

মুন্না উঠিয়া চুণ্ডার সম্মুখবর্ত্তী হইল। বলিল, চুণ্ডা! আজ হোতে তুমি আমার শত্রু। তুমি কত দুর যাও একবার আমি দেখব। বলিয়া ত্বরিত পদে সে চলিয়া গেল! চুণ্ডা শুধু একবার হাসিল, তার পর সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া বামহস্তে চুণীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, তুই যে আমার এতদুর ভালবাসিস্ তা আমি জানতাম! বাস্তবিক আজ আমার হৃদয়ে বড় আনন্দেরতুফান লেগেছে।

চুণী শুধু একবার সহাস্য আস্যে তাহার পানে তাকাইল, কিছুই বলিল না, শুধু তাহার মনে মুন্নার সেই কথাই হইতেছিল—"তুমি কত দুর যাও আমি একবার দেখব।" একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

* * * * * *

তার মাস খানেক পরে একদিন চুণী সেই বৃক্ষতলে বসিয়াছিল। কত রকম চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়ে ঘা দিতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে একটা তীর শণ্ শণ্ করিয়া আসিয়া তাহার পদতলে পতিত হইল, চুণী সচকিতে চাহিয়া দেখিল, পাহাড়ের উপর হইতে একটি লোক তীরটি ছুঁড়িয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। চুণী তীরটির পানে চাহিয়া দেখিল, তীরের মাথায় একখানি পত্র। পত্রে লেখা ছিল—

("চুণী! তেহেং যদি আম ইংরিনিঃ বাম হ'য়োঃ খান আমা। সাধরেয়া জিউরেসা হুরিব গাপাইং নাশাও গিড়িয়া। আর যদি ইংরিনিঃ এম্ হোয়ো খান্ অনা দারি গুণ্ডির 'হেঁ' কাথা অলহটকাঃ মে। নিনাঃ গে—মুন্না।") চুণী তুমি যদি আজ আমার হ'তে না চাও ত তোমার সাধের—প্রাণের—ভালবাসার জিনিষকে কাল নষ্ট করব, আর যদি আমার হইতে চাও ত ঐ বৃক্ষের গায়ে 'হাঁ' কথাটী লিখিয়া যাইও, ইতি মুন্না। চুণীর সাধের প্রাণের ভালবাসার জিনিষ 'চুণ্ডা' ভিন্ন অপর কিছুই নয়। চুণ্ডার কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণটা একবার শিহরিয়া উঠিল।

চুণ্ডা আসিতেই তাহাকে সকল কথা বলিয়া পত্রখানি দিল। চুণ্ডা পত্রখানি পড়িয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিল ও শুধু ভয় দেখানো বুঝলি চুণী? ও-সব কথা আবার মনে আনতে আছে? চুণীও সাহস পাইয়া বলিল, তাত

ঠিক। তবে কি না তোর কোন অনিষ্ট হয় এই জন্যে—এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে একজন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পিছন্‌ ফিরিয়া উভয়ে দেখিল—মুন্না। মুন্না একটু ক্রুরহাসি হাসিয়া বলিল, চুণ্ডা তোদের শুধু ভয় দেখাচ্ছিলাম না, বলিয়া বাম হস্তস্থিত সিঙ্গায় ফুঁ দিল। চকিতে মুন্নার প্রায় বিশজন গুণ্ডা প্রজা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পুনরায় কঠোরহাসি হাসিয়া মুন্না বলিল, ভয় দেখাচ্ছি না চুণী ? এখনও আমার হ'তে চাও ? চুণী নির্ভীক হৃদয়ে উত্তর করিল—না, সঙ্গে সঙ্গে চুণ্ডার বক্ষে একটি তীর আসিয়া বিঁধিয়া গেল। ছিন্ন তরুর ন্যায় চুণ্ডা সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। চুণী একবার হাসিল—বলিল, মনে ক'রেচ চুণ্ডাকে মেরে তুমি আমাকে পাবে। তা মনে কোর না মুন্না। এই তোমার প্রেম ? এই জন্য আমাকে পেতে আশা ক'রেছিলে ? বলিয়া নত জানু হইয়া পত্রবাহক তীরটি তুলিয়া নিজ বক্ষে আমুল বিদ্ধ করিয়া দিল। ম্লান নির্ব্বাক হৃদয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় মুন্না দেখিল—চুণী ও চুণ্ডা কোন্‌ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীসতিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

শান্তিপথে

প্রথমভাগ—পূর্ব্বকথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ফেরীওয়ালা

আশ্বিন মাসের বর্ষাস্নাত বঙ্গ-প্রকৃতি সুচিক্কণ মাধুরীতে দশদিক পূর্ণ করিয়া নরনারীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। উচ্ছল-সলিলা ভাগিরথী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া কল্লোলময় তরঙ্গভঙ্গে নব-যৌবনের চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছে। ধান্য ক্ষেত্রের উপর বায়ুর আনন্দ-নৃত্য কৃষকের প্রাণে আশার আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে। মেঘ-নির্ম্মুক্ত শরদাকাশের নিম্নে, কৌমুদীর স্নিগ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া, বিরহ-বিধুরা বঙ্গ ললনা-কুল আশার প্রতীক্ষায় দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছে।

আশ্বিন মাস বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূর্ণতার সংবাদ প্রচার করিয়া যায়। নদী স্রোতধারায় পূর্ণ, কৃষিক্ষেত্র ধান্যে পূর্ণ, বিরহিণীর প্রাণ আশায় পূর্ণ, ব্যবসায়ীর প্রাণ লাভেচ্ছায় পরিপূর্ণ। এই মাসে জড়ে ও চেতনে, আকাশে

ও ভূতলে মানবের প্রাণে ও ইতর প্রাণীর জীবনে, ক্ষুদ্রে ও বৃহতে, সর্ব্বলোকে এই পূর্ণতা বিরাজ করে। আশ্বিন মাস কেবল পূর্ণতা আনয়ন করে না, ইহা অভয়দান করে, ইহা শান্তি প্রেরণ করে। বঙ্গদেশে এই মাস প্রেম ও আনন্দ উপভোগের অতি শুভ অবসর। বাঙ্গালীর জাতীয় পূজার দেবীও তাই এই সময়ে দশদিক-পালিনী, দশ-প্রহরণ-ধারিনী, শান্তি-রূপিনী, বরাভয়-দায়িনী শারদা। বাঙ্গালী এই সময়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে, আকাশে ও পাতালে নদী ও তড়াগে, উদ্যানে ও উপবনে, নগরায়তনে ও পল্লীবেষ্টনে সর্ব্বত্রই এই দেবীকে দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর অপরাহ্নে ভাগিরথীর পশ্চিম-কূলস্থ কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী সুরপুর গ্রামে, প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত হরকান্ত মিত্র মহাশয়ের অট্টালিকা বেষ্টনীর সম্মুখে, আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল।

জমিদার বাটীতে দুর্গাপূজার বোধন বসিয়াছে। নানাবিধ সাজসজ্জায় গৃহ আজ আনন্দময়ী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুশোভিত পূজার দালানে উজ্জ্বল-ভূষণা দেবী-প্রতিমা দর্শক বৃন্দের লোলুপ-লোচনের আগ্রহ-দৃষ্টিকে তৃপ্তিদান করিতেছে। যাত্রার আসর, ঝাড়, লণ্ঠন ও আলেখ্যমালায় এবং পট্ট-মণ্ডপের আচ্ছাদনে, সু-সজ্জিত হইয়াছে। পরিচারকগণ কমনীয় ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিরীহ পল্লীবাসীর নিকট আপন আপন পদ-গৌরব প্রচার মানসে অনর্থক ব্যস্ততায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দ্বারবানগণ আপনাদিগের সুবৃহৎ পাগড়ী-সমেত সুবিশাল বপু দুলাইয়া, দীর্ঘতর লগুড় আন্দোলিত করিয়া, দর্শক দলের প্রাণে আতঙ্ক ও ভীতি উৎপাদন করিতেছে। যাত্রার দলের লোকেরা জমিদার বাটীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য-পরিচায়ক আসবাব পত্র দেখিয়া মুগ্ধ-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া ফিরিতেছে। পল্লী-সারমেয়-কুল রন্ধনশালার পশ্চাদ্ভাগে স্তূপীকৃত উচ্ছিষ্টরাশি ভক্ষণে ও পরস্পরের সহিত কলহে ব্যস্ত রহিয়াছে। সরল প্রাণ বালক বালিকাগণ তরল হাস্যে ও চপল চরণে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। সকলেরই প্রাণ আজ আনন্দ উপভোগের উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ।

এমন সময়, এই কল্লোল-মুখর পল্লীপথের একপার্শ্ব হইতে এক ফেরীওয়ালা আপন সুপরিচিত কণ্ঠে হাঁক দিল ঃ—

"অবাক কস্তুরু মীন,
পয়সায় রকম তিন,
যদি না খাবে মীন,
দ্বিজ রমানাথের কিসে যাবে দিন ?
কেট্ কেট্ গেড়াম,
(বাবু) সুজি আছে, চিনি আছে, জল নেই ;
(পেটে) ক্ষিদে আছে.
(ঘরে) বউ আছে,
(ট্যাঁকে) পয়সা নেই।"

ছেলে মেয়েরা—"আজকের এ পূজোর দিন,
কেন' অবাক কস্তুরু মীন।"

ফেরীওয়ালা দ্বিজ রমানাথের এই ধ্বনি সকলেরই সুপরিচিত। বহুবার সে পল্লীপথে আসিয়া বালক বালিকাদিগের নিকট দ্রব্য-সম্ভার বিক্রয় করিয়া আপনার পূর্ণ পেটিকা শূন্য করিয়া এবং পয়সার শূন্য থলিয়া পূর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আজিকার এই বোধনের দিনে, সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিত, ভোগাকাঙ্ক্ষী বালক-যূথের সম্মুখে তাহার সু-পরিচিত মিঠাইয়ের পেটিকা লইয়া অনেক আশায় সে উপস্থিত হইয়াছে।

রমানাথ ফেরীওয়ালার আগমন সংবাদে পল্লীপথে কলরব উপস্থিত হইল। যে সকল বালকের হস্তে পয়সা ছিল, তাহারা ফেরীওয়ালার সঙ্গীত-কণ্ঠে ঘোষিত সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদনের ইচ্ছায় তাহার নিকট উপস্থিত হইল। যাহাদের পয়সা ছিল না তাহারা দ্রুতপদে স্ব স্ব গৃহমধ্যে যাইয়া মাতার নিকট পয়সা চাহিতে আরম্ভ করিল, আর যাহাদের গৃহে পয়সা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহারা ক্ষুধা-কাতর কুকুরের ন্যায় মিঠাই ভক্ষণকারী কোন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া কাতর নয়নে তাহার মিঠাই চর্ব্বণ ও লেহন ক্রিয়া দর্শন করিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়াছি ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন হয়; দর্শনে কি সিকি ভোজন হয় ?

ফেরীওয়ালার হাঁক শুনিয়া কোন বইঠকখানার পাশাক্রীড়ারত একজন বাবু মৃদু হাসিলেন, অপর একজন বিদ্রূপ করিলেন আর তৃতীয় একজন পুত্রের মিঠাই ভক্ষণের জন্য পয়সা প্রার্থনার কথা ভাবিয়া ফেরীওয়ালাকে অস্ফুটস্বরে গালি দিলেন।

একস্থানে কয়েকজন পরিচারিকা সুন্দর পরিচ্ছদ-ভূষিত শিশু ক্রোড়ে করিয়া, পল্লীপথের আনন্দ উৎসবের কোলাহল মধ্যে দাঁড়াইয়া, আপন আপন প্রভু-পত্নীর স্ফুট বা অস্ফুট নিন্দা করিতেছিল। তাহারাও ফেরীওয়ালার ডাক শুনিল, তাহারাও সেই ডাকে, কেহ হাসিল, কেহ গালি দিল।

এমন সময় জমিদার বাবুর পূজা বাটীর দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে ফেরীওয়ালার ডাক পড়িল। বারাণ্ডায় দুইটি সুসজ্জিতা সুন্দরী বালিকা এই জাতীয় উৎসবের দিনে, পরিচারিকাগণ পরিবৃতা হইয়া, এই আনন্দ-মুখর পল্লী-পথ-প্রান্তে বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়াছিল। এই বালিকাদ্বয় যে জমিদার বাটীর দুহিতা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সকলের আগ্রহপূর্ণ আহ্বানে ফেরীওয়ালা উপরে নীত হইলে, সে বারাণ্ডায় বসিয়া আপনার স্ব-রচিত মিঠাইএর গান গাহিয়া, বালিকাদ্বয় ও পরিচারিকাগণকে হাসাইতে লাগিল।

এই প্রকার হাস্য-কোলাহলের মধ্যে একজন পরিচারিকা ফেরীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁগা, অবাক-কস্তরুওয়ালা, তুমি বামনের ছেলে হ'য়ে মেঠাই ফিরি করে বেড়াও কেন? অন্য কোন কাজ করলেই পার?

ফেরীওয়ালা বলিল, অন্য কাজ আমি কি জানি, ঝি দিদিরা? অন্য কাজ জানলে কি এই রকম করে রোদে বৃষ্টিতে চেঁচিয়ে বেড়াই?

দ্বিতীয়া পরিচারিকা বলিল, কেন বামনের ছেলে, রাঁধতে কি ঠাকুর পূজো করতে ত জান। কোন গেরস্ত বাড়ীতে সেই রকম কোন কাজ কর না কেন?

ফেরীওয়ালা বিষণ্ণমুখে বলিল, না দিদি, আমি তাও জানি না।

প্রথমা বলিল, ওমা! কি ঘেন্নার কথা! বামনের ছেলে হ'য়ে ঠাকুর পূজো, কি রান্না, কিছুই শেখনি? কি ঘেন্না! এ সব ত বামনদেরই কাজ।

ফেরীওয়ালা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল দেখিয়া দ্বিতীয়া বলিল, আচ্ছা, তা না জান, এইসব মেঠাইএর একখানা দোকান কর না, কেন! তবু ত সেটা একটা ভদ্দর নোকের মত কাজ হয়, গা!

ফেরীওয়ালা এই প্রশ্নের উত্তরেও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দোকান করার টাকা কোথায় পাব, দিদি? আমার যে দু'কড়ারও মুরোদ নেই। দিদিরা, বরাতে যা লেখা আছে তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে?

শেষোক্তা পরিচারিকা বলিল, তা না থাকুক, হাতে পয়সা। ভিক্ষে শিক্ষে করেও ত তোমার দোকানের পুঁজি যোগাড় করিতে পার।

ফেরীওয়ালা বলিল, সে সব কথায় কাজ কি দিদিরা, বামন হ'য়ে কি চাঁদে হাত দেওয়া যায়? এখন দিদিমণিরা, কে, কি নেবে, নেও। মা দুর্গা তোমাদের ভাল করুন, আজকের দিনে আমায় কিছু বকসিস দিতে হবে।

ফেরীওয়ালার কথায় জ্যেষ্ঠা বালিকা ওষ্ঠ স্ফীত করিয়া বলিল, ইস্ তোকে আবার বকসিস্ দেবে, তোর খাবার ও নেবনা, তোকে বকসিস্ও দেবনা, বাবাকে বলে তোকে দেশ ছাড়া করাব। তোকে এখানে থাক্‌তে দেব না।

ফেরীওয়ালা বলিল, কেন দিদিমণি? আমার কি দোষ? আমায় তাড়াবে কেন? তোমরা আমায় তাড়ালে আমি সংসার করব কি করে?, না খেয়ে মরব কি?

জ্যেষ্ঠা বালিকা বলিল, তুই মরবি, কি বাঁচবি, তাতে আমাদের দরকার কি? আমরা তোকে এখানে রাখব না।

ফেরীওয়ালা দুই একবার এই ভর্ৎসনার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া অনন্যোপায় হইয়া নিরাশ মনে আপন পেটিকা লইয়া গমনোদ্যত হইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠা বালিকা বলিল, না গো, অবাক-কস্তুরুওয়ালা, তুমি যেও না; আমি তোমায় বকসিস্ দেব। আচ্ছা, তুমি পড়তে শেখ না কেন? পড়তে শিখলে ত সকলে তোমায় ভাল বলবে।

ফেরীওয়ালা বলিল, ছোট দিদিমণি, আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি এখন আর পড়া শুনো করতে পারি? আর কেইবা আমায় পড়াবে দিদিমণি?

কনিষ্ঠা বালিকা। কেন বাবা পড়াবে? আমি বাবাকে বলব। বাবা অনেক পাশ করেচে।

কনিষ্ঠার কথায় জ্যেষ্ঠা ঘৃণা-জড়িত-স্বরে বলিল, ইস্ তোর বাবার কাছে ও পড়বে কেন? তোর বাবার জাত নেই, বিলেত গিয়েচে। কেমন ফেরীওয়ালা, তুমি কি পিসেমশাইয়ের কাছে পড়বে?

ফেরীওয়ালা বিষম বিপাকে পড়িল। সে বলিল, আমি আর কি পড়ব, দিদিরা? আমার আর কি পড়বার বয়স আছে?

জ্যেষ্ঠা বলিল, দেখ্‌লি ললি, ও পড়বে না।

কনিষ্ঠা বলিল, আচ্ছা তুমি যদি না পড়ত দোকান কর না কেন?

ফেরীওয়ালা বলিল, দোকানের টাকা কই, দিদিমণি?

কনিষ্ঠা বলিল, আচ্ছা আমি তোমাকে টাকা দেব। তুমি দোকান করবে?

জ্যেষ্ঠা বলিল, তুই টাকা পাবি কোথায়, ললি।

কনিষ্ঠা বলিল, কেন? আমার অনেক টাকা আছে। দাদামশাই দিয়েচে, মা দিয়েচে। আমি সেই টাকা ওকে দেব।

এই বলিয়া কনিষ্ঠা বালিকা আনন্দ-চঞ্চল নৃত্যে পায়ের নুপুর বাজাইয়া, অঞ্চল দুলাইয়া, অঙ্গের আভরণ কাঁপাইয়া, অন্দর মহলে দৌড়াইল।

কনিষ্ঠার গমনোদ্যম দেখিয়া জ্যেষ্ঠা কঠোরস্বরে বলিল, ললি, বাড়াবাড়ি করিস্ নি, বলচি। আমি এখনি বাবাকে বলে দিয়ে তোকে মার খাওয়াব।

কনিষ্ঠা বলিল, আমার টাকা আমি দেব, তার জন্যে মামাবাবু আমাকে মারবেন কেন?

বালিকা আর অপেক্ষা করিল না। কনিষ্ঠা গমন করিলে তৎপশ্চাৎ জ্যেষ্ঠাও অন্দর মহলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কনিষ্ঠা বালিকা সত্য সত্যই একটি সুবর্ণমুদ্রা আনিয়া অবাক-কস্তুরু-ওয়ালাকে প্রদান করিল।

ফেরীওয়ালা তাহার সমুদায় জীবনে কখনও সুবর্ণমুদ্রা চক্ষে দেখে নাই। আজ জমিদার দুহিতার অযাচিত দানে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, বিস্ফারিত নয়নে, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বসনাঞ্চলে বাঁধিতেছে দেখিয়া, পরিচারিকাগণ তাহার অংশ পাইবার আশায় ফেরীওয়ালার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন সময় জ্যেষ্ঠা বালিকা, তাহার পিতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ানজি মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। নগেন্দ্র নাথ তিরস্কার আরম্ভ করিতেছেন এমন সময় কনিষ্ঠা বালিকা চিৎকার করিয়া বলিল, ঐ যে, বাবা আস্চে! হোঃ! হোঃ! হোঃ! বড় মজা, বাবা আস্চে।

এই কথা বলিয়াই সে বারাণ্ডা ত্যাগ করিল। নগেন্দ্রনাথও বালিকার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঝটিকার ন্যায় দ্রুতগতিতে বালিকার পশ্চাদানুস্মরণ করিলেন, ফেরীওয়ালা সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিল।

জ্যেষ্ঠা বালিকার নাম সুধাময়ী আর কনিষ্ঠার নাম ললিতা। ললিতা জমিদার বাবুর পৌত্রী। নগেন্দ্রনাথ ললিতার মাতুল ও জমিদারীর দেওয়ান। সুধা নগেন্দ্রনাথের কন্যা! জ্যেষ্ঠার বয়ক্রম ১০ বৎসর আর কনিষ্ঠার বয়ক্রম ৬ বৎসর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যালক ও ভগ্নিপতি

ললিতা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পূজাবাটীর বারাণ্ডা হইয়া, চতুষ্পাঠীর দরদালান অতিক্রম করিয়া, কাছারী বাটীর দ্বিতলের সোপানশ্রেণীর উপরে যাইয়া, পিতাকে দেখিয়া, তাঁহার জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিল। পিতাও কন্যাকে দেখিয়া, স-স্নেহে তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সোপান বাহিয়া, উপরের বারাণ্ডার পথ দিয়া অন্দরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এমন সময় পূর্ব্বকথিত নগেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, এস, এস, সুবোধ এস ; তোমারই জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধরে এ-ঘর ও-ঘর করচি।

নগেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায় ললিতার পিতা ভ্রূ-দ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কেন, নগেন দা, আমার জন্যে আপনি এত উদ্বিগ্ন হ'য়ে ঘুরচেন ?

নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, দরকার আছে, সুবোধ, খুব বেশী দরকার আছে। তোমার সঙ্গে একটু গোপন পরামর্শ করার দরকার আছে।

ললিতার পিতার নাম শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র: এম, এ, ডি, এস, সি। ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে এম. এ, ও ডি এস সি, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা করিতেছেন। বিলাত গমনের পূর্ব্বে তিনি এই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত পাশ করিয়া আপনার যশস্তম্ভ কৃতিত্বের সহিত প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিলাত যাত্রায় তাঁহার পিতা, জমিদার শ্রীযুক্ত হরকান্ত মিত্র মহাশয়ের সম্মতি ছিল না। তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদের পুরাতন দেওয়ান পরলোকগত মাধবচন্দ্র দত্তের সুন্দরী কন্যা ও বর্ত্তমান দেওয়ান নগেন্দ্রনাথ দত্তের একমাত্র ভগ্নী, বালিকা বীণাবাদিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবোধ যখন বিলাত গমন করেন, তখন বীণা গর্ভবতী। সুবোধের বিলাত যাত্রার পর ললিতার জন্ম হয়, এবং এই নবজাত শিশুকে তিনি ফটোগ্রাফেই সর্ব্বপ্রথম দর্শন করেন। সেই অবধি প্রতি বৎসরে কন্যার এক একখানি নূতন ফটো সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত বহুপ্রকার স্নেহ-স্মৃতি বিজড়িত করিয়া রাখিতেন। বৎসরান্তে এই ফটো লইয়া বিদেশে প্রবাসে তাহার জন্মোৎসব করিতেন এবং উৎসবের চিহ্নস্বরূপ বহুবিধ ক্রীড়নকাদি, কন্যার জন্য পাঠাইতেন।

পিতার হৃদয়ের এই স্নেহোচ্ছ্বাস শৈশব হইতেই বালিকার কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিত, এবং সর্ব্বকণ্ঠে নিনাদিত পিতার প্রশংসা শ্রবণে বালিকার হৃদয়ও পিতার প্রতি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হইত না। তদুপরি পিতার উপঢৌকন-রাশিও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে পিতার বৃহত্তর হৃদয়ের সহিত সহজেই মিলিত করাইয়া দিত। বিলাতের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জয়পত্র লাভের পর, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবোধ যে দিন, ললিতাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বনে, আলিঙ্গনে ও উপহার-স্তূপে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, সে দিন তাহার বালিকা-জীবনের এক স্মরণীয় দিন। উপকথায় শ্রুত কোন অদ্ভুত-কর্ম্মা পরীকে তাহার ক্ষুদ্র বাহু-বেষ্টন মধ্যে পাইলে সে ইহাপেক্ষা অধিকতর সুখী হইত কি না সন্দেহ। এই প্রথম সাক্ষাতের পর, অবসর পাইলেই সুবোধ স্বগ্রামে আসিয়া কন্যার সহিত গল্প করিয়া এবং তাহাকে বহুপ্রকার উপহার প্রদান করিয়া, তাহার কোমল হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাইতেন।

বিলাত-যাত্রার পর সমুদ্রবক্ষ হইতেই সুবোধচন্দ্র বীণাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন-পথে পত্নীকে সহায়তা করিতে বলেন এবং বহুপ্রকারে পত্নীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করেন। বীণা স্বামীর এই পত্রের কোনই প্রত্যুত্তর দেন নাই। কেন, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

সুবোধের বিলাত গমনের কথা সকলের নিকট প্রচারিত হইলে তাঁহার আত্মীয়গণ জানিলেন যে, বীণা সুবোধের বিলাত গমনের ইচ্ছার কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলেও স্বামীর অনুরোধে সেই সংবাদ গোপন করিয়াছিলেন। এই সামান্য একটি কারণে অভাগিনী বীণা সকলের বিষ-নয়নে পড়িলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতৃজায়া চম্পকবরণী,সরোষ শাসনে, বীণার বিরহ-জীবন ভয়সঙ্কুল করিয়া তুলিলেন। সাগরবক্ষ হইতে সুবোধ পত্নীকে যে পত্র লিখিলেন তাহা নগেন্দ্র হস্তগত করিয়া বীণাকে দিলেন না। প্রতিসপ্তাহেই সুবোধ পত্নীকে পত্র লিখিতেন, নগেন্দ্র সে সকল গোপন করিয়া, সুবোধের নামে গ্লানিকর নানা মিথ্যা কথা, বীণা ও হরকান্ত বাবুর নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবাসীপতির বিরহ-ব্যাকুলতার কথা, বিরহিনী বীণাবাদিনী ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। অপরদিকে তিনি শুনিলেন যে, স্বামী বিলাতে কোন এক ইঙ্গ-সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন।

সুবোধ-চরিত্রের যে-সকল কলঙ্ক-কথা অন্তঃপুর-চারিণী সরলা বীণার নিকট প্রচার করা হইয়াছিল, বহির্বাটীতে গৃহস্বামী বৃদ্ধ মিত্র মহাশয়ের নিকটেও সেই সকল কথা বিবৃত করা হইয়াছিল। এই সকল কথায় উভয়েরই হৃদয়ে বিরক্তি উৎপাদিত হইয়াছিল। ছয় বৎসরের প্রবাসে সুবোধচন্দ্র পিতা ও পত্নীর নিকট হইতে কোন পত্র প্রাপ্ত হন নাই, শত অনুরোধেও নহে। এই সকল কারণে এই তিনজন পরম আত্মীয় পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে ক্রমশ দূর হইতে দূরতর হইতে লাগিলেন।

পিতা ও পত্নী সুবোধকে দূরে রাখিলেও ললিতা কিন্তু তাহা করিতে পারিল না। ইহার প্রধান কারণ ললিতা সর্ব্বদা যাঁহাদের অধীনে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইত, তাঁহারা দুইজনই ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

ললিতা যে দুইজন ব্যক্তির নিকট অধিকাংশ সময় বাস করিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র শাস্ত্রী, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল, বাটীর প্রাচীনা পরিচারিকা—হরির মা। সুবোধের বাল্যকালে তাহার মুমূর্ষু মাতা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী এই দুই ব্যক্তির হস্তে স্বীয় পুত্রের ভারার্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

পত্নী-বিয়োগের পর বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় জমিদারীর উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলে দেওয়ান নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সহায়তা করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার প্রসার বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত হইলেন। আর পুত্র সুবোধচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে শম্ভুচন্দ্রের শিক্ষাধীনে থাকিয়া নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও জনসেবা কার্য্যে আত্মোন্নতি করিতে লাগিলেন। বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য সুবোধ কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের শিক্ষাগুণে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতির মার্গ উল্লঙ্ঘন করেন নাই। বিলাতের ন্যায় প্রলোভন-সঙ্কুল স্থানেও সেই শিক্ষাবলে তিনি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সুবোধচন্দ্র স-গৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নগেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধ মিত্র মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সময় তিনি পুত্রের সহিত যতই কঠোরতা দেখাইবেন ততই পুত্রকে আপনার করিয়া লইতে পারিবেন। অপর দিকে দুর্ব্বলতা দেখাইয়া তাহার সহিত কোমল ব্যবহার করিলে সে যথেচ্ছাচারী হইয়া তাঁহার শেষজীবন দুঃসহ করিয়া তুলিবে। বিষয়ী হরকান্ত নগেন্দ্রের কুটিল পরামর্শে অন্তিমকালে, পুত্রকে অধিকতর নিকটে পাইবার আশায়, হৃদয়কে কঠোর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বহির্বাটীতে নগেন্দ্রনাথ যাহা করিলেন অন্দরমহলে নগেন্দ্র-পত্নী, চম্পকবরণী, অতি সহজেই তাহা সম্পন্ন করিলেন। তিনি নানা অকথা কুকথা রটনা করিয়া, ননদিনীর হৃদয় গরলময় করিয়া তুলিলেন। সুবোধের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চম্পকবরণী কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু দুর্গাপূজার সময় তাহাকে পুনরায় সুরপুরে লইয়া আসিতে বাধ্য হন।

বীণার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়া সুবোধচন্দ্র আজ আশাপূর্ণ হৃদয়ে, ব্যথাপূর্ণ প্রাণে আপন ভবনে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই কন্যার প্রেমালিঙ্গন পাইয়া দুর্ব্বল ও ক্ষীণ আশাকে কিছু সবল ও সতেজ করিয়া লইলেন। কিন্তু অনতিকাল-মধ্যে নগেন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া সুবোধের হৃদয়ের সমুদয় আশা মুহূর্ত্তমধ্যে যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া গেল।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, সুবোধ তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ আছে। তোমায় কিছুক্ষণের জন্যে নির্জ্জনে চাই।

সুবোধ পূর্ব্ববৎ ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়াই বলিলেন, নগেন দা, আমার সঙ্গে আবার আপনার কি গোপন-পরামর্শ থাকতে পারে? বিষয়ের পরামর্শের জন্যে ত বাবাই আছেন, আমাকে আর তা'তে জড়াবেন না।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, না, হে, না। তোমার সঙ্গে বিষয়ের পরামর্শ আমি করব না; তুমি বিষয়ের কি বোঝ যে তার জন্যে তোমায় ডাকব?

সু। তবে আমার সঙ্গে আপনার আর এমন কি দরকার থাকতে পারে যাতে গোপনে পরামর্শ করতে হবে?

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তোমায় আমায় কোন গোপন পরামর্শের দরকার কি থাকতে পারে না, সুবোধ? আমি হলুম তোমার বড় কুটুম—তোমার স্ত্রীর ভাই—তোমার ললিতার মামা। তোমার সঙ্গে যদি আমি গোপনে পরামর্শ না করব ত কার সঙ্গে করব' সুবোধ? কলিতে মাকে দশমাসের গুদোম ভাড়া দিয়ে তাড়াতে পার, বাপকেও অগ্রাহ্য করতে পার, কিন্তু শ্যালককে অনাদর করতে পার না। তোমার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শেরই সম্বন্ধ।

সুবোধচন্দ্র এই রহস্যাত্মক মন্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কন্যাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া নগেন্দ্রের নির্দ্দেশানুসারে কাছারী বাড়ীর মধ্যস্থিত নগেন্দ্রের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সাবধান, সুবোধ, নগেন্দ্রের কক্ষে সাবধানে প্রবেশ করিও। ইহা

সাধারণ গৃহের মত ইষ্টক-প্রাচীর বেষ্টিত হইলেও তোমার পক্ষে ইহা সামান্য কক্ষ নহে। ইহা নগেন্দ্রের বিশ্রাম-কুঞ্জ, ইহা তাহার কুটিল ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণালয়, ইহা তাহার সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন মন্ত্রের সাধন-মন্দির। তান্ত্রিক সাধক অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন নিশীথে, ভীষণ শৃগাল কুক্কুর পরিবেষ্টিত শ্মশানে, শবদেহে আসন পাতিয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হন, আর নগেন্দ্রনাথও এই কক্ষের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার গহ্বরে, আলোক রশ্মি-রেখা-শূন্য স্থানে সন্দেহ ও অবিশ্বাস রূপ শ্বাপদ-ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া দুরভিসন্ধির শবদেহের উপর স্বার্থসিদ্ধির আসন বিছাইয়া লুণ্ঠন-মন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তান্ত্রিক শব সাধনা অপেক্ষা স্বার্থপরতার শব-সাধনার মূল্য বোধহয় অধিকতর। নগেন্দ্রনাথ এই কক্ষমধ্যে সেই সাধনাই করিতেন। সাবধান, সুবোধ, এই সাধন-গুহায় তুমি ধীরে ও সতর্কার সহিত প্রবেশ করিও।

নগেন্দ্রনাথের বয়ক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর আর সুবোধচন্দ্রের বয়ক্রম ষড়বিংশতি বৎসর। নগেন্দ্র ও সুবোধ উভয়েই সুশ্রী। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, নগেন্দ্রের নাসারন্ধ্রের স্ফীতি কিছু অধিক, চক্ষুদ্বয় নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং কেশাগ্র রক্তাভ; আর সুবোধের নাসা তিলফুল সদৃশ, চক্ষুদ্বয় হরিণ নয়নের ন্যায় এবং মস্তকের কেশদাম ঘন-কৃষ্ণ। একজন ছিলেন মাঙ্গোলিয়ানের ন্যায় আর অপর জন ছিলেন গ্রিসিয়ানের আদর্শ। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবে

—০—

নিরানন্দ জীবনের অফুরন্ত দীর্ঘ-পথ-বেয়ে,
অবিশ্রান্ত চলিয়াছি জানিনাকো কার পানে চেয়ে।
সংসারের দৃশ্যাবলী অগ্নি-দগ্ধ বালুরাশি সম,
দহিতেছে দিবানিশি দীন দুটি আঁখি তারা মম ;
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ নিদাঘের খররৌদ্রতাপে,
দুর্ব্বহ জীবনভারে শ্রান্ত শীর্ণ পা দু'খানি কাঁপে ;
কে আসিবে শান্ত স্নিগ্ধ নবীন-নীরদ-ছত্র-রূপে,
বিরাজিতে শিরোপরে, জ্বালাময় দীপ্তবহ্নি স্তূপে।
নিবিড় নীরব শান্ত সুমধুর সৌম্য শ্যাম ছায়া,
নয়নে অমৃত ঢালি রচি' দিতে কি অপূর্ব্ব মায়া!
স্নেহধারা বরিষণে জুড়াইবে তনু মন প্রাণ—
জীবনের দীর্ঘ-পথ কবে চলা হ'বে অবসান!

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

মনোরমা



১৯

দ্বিপ্রহরের সময় বাগানের মালতীমঞ্চের ছায়ায় মনোরমা অনেকক্ষণ একা বসিয়াছিল, সুদূর দিগন্তের নীলিমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত কথাই সে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া ধীরপদে নিজের ঘরে আসিবামাত্র দেখিল, তাহার নবনিযুক্তা দাসী শৈল, বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মনোরমার ব্যবহৃত "জবাকুসুমতৈল" ও চিরুণী লইয়া নিজের প্রসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। মনোরমা দাসীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিল আহা, ওদেরও তো প্রাণ আছে, সখইবা না থাকিবে কেন? তাই কোমলকণ্ঠে কহিল, শৈল, আমার চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিস কেন? তোদের মাথায় উকুন থাকে, সে-গুলো এসে আমার মাথায় ঢুকবে। ও চিরুণী তুই নে, আমি অন্য চিরুণীতে মাথা আঁচড়াবো।

শৈল অপ্রতিভ হইল, কিন্তু সে খুব চতুর, কহিল, মাপ কর বৌ-দিদি, আর আপনার চিরুণীতে হাত দেবো না। আসুন, আপনার চুল বেঁধে দিই, আমি অনেক রকম চুল বাঁধতে জানি।

"রকমারীর দরকার নেই, একটু আঁচড়ে দিস্ তো দে।" শৈল মনোরমার চুলগুলির সংস্কারে মন দিল। সেই আগুল্ফ-লম্বিত ঘনকৃষ্ণবর্ণ মাথাভরা চুলগুলি যত্নাভাবে প্রায়ই জটা বাঁধিয়া যাইত, শৈল সেগুলি ছাড়াইয়া দিতে দিতে কহিল, আপনি চুলের যত্ন করেন না কেন বৌ-দিদি? এত চুল কি সবার হয়? মনে মনে কহিল, হে ঠাকুর, তোমার কাছে কি মানসিক করলে এমন গা ভরা রূপ আর মাথা ভরা চুল পেতে পারি?

মনোরমা কহিল, আগে কোথা কাজ করতিস্ শৈল? শৈল কহিল, কেন বৌদিদি, সে দিন যে বোল্লাম, হীরালাল বাবুর বাড়ী। তাঁদের বাড়ী এই যে কাছেই ওঁরা খুব বড় লোক। ঘিয়ের কারবার, হুণ্ডীর কারবার। এদেশে কেঁইয়ারা খুব ধনী। ওঁদের বাড়ী ছালায় (থলে) ভরে টাকা আসে, সের বাঁটখারায় করে ওজন করে। মেয়েরা সব খুব সুন্দরী, কিন্তু কি মজা, হীরালাল বাবুর স্ত্রী বাবুর চাইতে ঢের বড়, হি, হি, হি!

মনোরমার কাণে এ কথা নূতন ও বিচিত্র বোধ হওয়ায় সে কৌতূহলী হইয়া কহিল, ও রকম বিয়ে ও-দের চলে না-কি ?

শৈল উৎসাহের সহিত কহিল, খুব চলে। ওরা সব মাছ খায় না, কোন জীবের প্রাণ বধ করে না। আমার কাজ ছিল সকালে উঠে বহুজীর বিছানা থেকে ছারপোকাগুলি বেছে রূপার একটি কৌটায় ভরে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসা। একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত মারতে দেয় না, এমন কি, রাত্রি হবার আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে ন্যায়, যদি রাতে খাবার সময় অন্ধকারে কোন পোকার জীবনহানি ঘটে।

মনোরমা বাঙালীর সাংসারিক জীবন ভিন্ন অন্য কোন জাতির আচার ব্যবহার বিষয়ে কিছুই জানিত না, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আরও জানিতে তাহার বিশেষ আগ্রহ হইল। মনোরমা কহিল তোকে কি কি কাজ করতে হোতো ?

"কেবল বহুজীর কাছে থাক্‌তাম, তার বিছানা করা সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া, চুল বাঁধা, আর কাপড় দুবেলা সাবান দিয়ে কেচে রং কোরে দেওয়া। ওদের বাড়ীর মেয়েরা খুব বেশী রং করা কাপড় ব্যবহার করে, প্রত্যহই রকম রকম রংয়ে কাপড় রঙিয়ে দিতে হয়।"

"হীরালাল বাবুর স্ত্রীটি কেমন দেখতে ?"

"বেশ সুন্দরী, কিন্তু হ'লে কি হয়, বাবুরা তো রাত্রে বাড়ী থাকেন না।" শৈল চোখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা সবিস্ময়ে কহিল, সবাই কি ঐ রকম ? মেয়েরা কিছু বলে না ?

শৈল বিজ্ঞভাবে কহিল, বলবে আবার কি ? নতুন ব্যাপার তো কিছু নয়, মেয়েরা খাওয়া পরা আর সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত, বাবুরা বাইরে যা করুক, মেয়েদের সে খোঁজে দরকার কি ? তাদের খাওয়া পরার কিছু দুঃখু নেই। বাগান বাড়ী না থাকলে—বাইজী না থাকলে বড় লোক ব'লে চিনবেই বা কে ? মনোরমার কাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল, সমাজের একি রীতি ? একি ব্যবহার ? এই অসংযত চরিত্রের ইন্দ্রিয়লালসার চরিতার্থতাই আবার বড় মানুষীর একটা লক্ষণ বলিয়া গণ্য ? দেশ কি এতই অধঃপতিত ? এই পুরুষ জাতিই আবার প্রতি কথায় নারীর সতীত্ব, বাক্যে এবং চিন্তায় পর্য্যন্ত কতটুকু আহত হইয়াছে তাহার বিচার কঠোর ভাবে করিয়া আসিতেছে ?

সহসা মনোরমার দৃষ্টি দেওয়ালে লম্বিত চিত্রখানির উপর পতিত হইল,

এতদিন সেখানি সে ভাল করিয়া দেখে নাই, চিত্রের বিষয় কি সুন্দর—কি মর্ম্মস্পর্শী ! রাজনন্দিনী, রাজবধূ, রাজরাণী সীতা, পতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে পরিত্যক্তা হইয়া বাল্মীকি কুটীরবাসিনী !

গর্ভবতী জানকী—লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিতা হইয়া রামের নিকট হইতে দূরে বাস অপেক্ষা সরযূ সলিলে জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভে যে ভাবীরাজবংশধর। নিজে কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বংশ নাশ মহাপাপকে তিনি কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবেন ?

নির্জ্জন বনমধ্যে একাকিনী বটবৃক্ষমূলে দীনবেশে করতলে কপোল রাখিয়া জানকী বসিয়া আছেন। সম্মুখে নির্ম্মল সলিলা প্রবাহিণী বহমানা, সেই নদীর বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গের প্রতি উদাস দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া আছেন চিত্রকর নিপুণ তুলিকাস্পর্শে দেবীর হৃদয়ের করুণ ভাবটুকু চোখে ও মুখে অতি সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে প্রাণাধিক প্রিয়তম বোধে ভালবাসিয়া—ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনি নির্ম্মম হৃদয়ে কলঙ্কিনী বলিয়া সতী নারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রিয় পতির প্রতি রমণীর কতখানি ব্যথাপূর্ণ অভিমান হইবার কথা! এমন কি স্বামীর প্রণয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হইবারই বিষয়, কিন্তু সীতার প্রাণ কি সে-জন্য একবারও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, স্বামীকে প্রাণহীন পাষাণদেবতা বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তাঁহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে না, তাহা হয় নাই। তিনি স্বামীর প্রণয়ে গভীর বিশ্বাস শালিনী। রামচন্দ্রের অকপট প্রাণপূর্ণ ভালবাসায় তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে, সেই জন্যই তিনি এতখানি বেদনা, এত বড় গুরুতর আঘাত বুক পাতিয়া সহিতে পারিয়াছেন। তিনি জানেন, কঠোরকর্ত্তব্যের কর্কশ অঙ্গুলী নির্দ্দেশেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, কি অনল বুকে ধরিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, সীতা-বিরহে তাঁহার হৃদয় কতখানি ভাঙিয়া গিয়াছে। বরং এইটুকু নিঃসংশয়ে জানেন বলিয়াই দেবী এখনো বাঁচিয়া আছেন। স্বামীর প্রণয়-স্মৃতিই তাঁহার জীবনীশক্তি, দেহের শোণিতকণা, মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ। সুনিপুণ চিত্রকর সীতার সুকুমার মুখখানিতে নিটোলললাটে, ও পুষ্পিত ওষ্ঠাধরে যুগপৎ বিষাদ ও প্রেমের এমনি একটি সুন্দর ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনোরমা চিত্র দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময় হইয়া গেল, সীতার বেদনা যেন সে সম্পূর্ণ

আপন হৃদয়ে অনুভব করিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথাও স্মরণ হইল, মনে মনে ভাবিল ভাগ্যবতী সীতা, পতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা, পরিত্যক্ত হইলেও পতির হৃদয়ে তাঁহার আসন সম্পূর্ণ অটুট ছিল, পতির প্রণয়ে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য বঞ্চিতা হন নাই, এর চাইতে নারী আর কোন মহৎ সম্পদ কামনা করিবে? আর রামচন্দ্রের ন্যায় পতি! রাজপুত্র, রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত, চরিত্র বলে, সাধুতা ও শীলতায় বীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে, কি অপূর্ব্ব মহত্ত্বে এক দেবোপম উদার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল, যাহার কল্পনা ও চিন্তাতেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, কি একটি মহত্তর আদর্শ চক্ষুর সম্মুখে জাগাইয়া দেয়! মনোরমা সসম্ভ্রমে যোড়করে দেবদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইল, শৈল যে কখন চুলবাঁধা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। বারেন্দায় আসিবামাত্র মনে হইল, পাশের ঘরে অস্পষ্টস্বরে কে কথা কহিতেছে, মনোরমা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু সে যাহা দেখিল, তাহাতে ঘৃণায় ও লজ্জায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শৈলের হাত ধরিয়া সন্তোষ কি যেন বলিতেছে, মনোরমাকে দেখিবা মাত্র সন্তোষ চলিয়া গেল। মনোরমা শয়ন গৃহে ফিরিয়া আসিল।

১০

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি, প্রখর গ্রীষ্মে, আম কাঁঠাল লিচু প্রভৃতি রসনা তৃপ্তিকর সুরসাল ফলগুলি প্রাণ ভরিয়া খাইয়াও লোকে পোড়া গ্রীষ্মকালকে গালি দিয়া, বর্ষার শীতল বারি বর্ষণের আশায় সতৃষ্ণ নয়নে আকাশপানে চাহিয়া আছে। কয় দিন এক একবার মেঘ আসিয়া জ্বালাময় রৌদ্র দীপ্ত দিনগুলিকে ছায়া শীতল করিয়া তুলিলেও বৃষ্টিপাত মোটেই হয় নাই। আজ কিন্তু বৃষ্টি আসন্ন প্রায়, সকাল হইতেই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীতল বাতাস সকলের দেহে অমৃত স্পর্শ বুলাইতেছে, গঙ্গার ঘাটে ছেলে মেয়ের দল মহোল্লাসে সাঁতার কাটিতে কাটিতে বৃষ্টির ছড়া বলিতেছে, আজিকার দিন সকলেরই মনে যেন একটা নবীনআনন্দ—নবীনভাবাবেশ জাগাইয়া তুলিয়াছে। কৃষকগণ সাগ্রহে নববর্ষার প্রথম দিনটিকে প্রফুল্লনেত্রে অভিনন্দন করিতেছে, কত শত বৎসর পূর্ব্বে, এমনি একটি দিন, কবি কালিদাসের অন্তরের কল্পনা-বধূকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার সোনার কাঠির স্পর্শে গোপন-হৃদয়বাসিনী বিরহিণী জাগিয়া উঠিয়া এমন করুণ গাথা গাহিয়াছিল, যাহা কবির অমর লেখনী মুখে নিস্যন্দিত হইয়া জগতের নরনারীকে আজো মাতাইয়া রাখিয়াছে।

প্রতি বৎসরে এমনি দিন, নূতন করিয়া নূতন ভাবে আসিয়া দেখা দেয়, আর সকলেরই হৃদয় কি এক অজ্ঞাত বস্তুর বিরহে কাতর হইয়া, চঞ্চল-চরণে যেন অভিসার যাত্রা করে, কিন্তু সে অজ্ঞাত যে কি, তাহা না জানাতেই যেন সকল রহস্য, সকল আনন্দ নিহিত। আজিকার শীতল বাতাস কি হনুমান গুলাকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে? দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ হনু—স্ত্রী-হনু বুকে শাবক বাঁধিয়া কেহ বা শাবককে সঙ্গে লইয়া এ গাছ হইতে ও গাছে, এ বাড়ীর ছাদ হইতে ও বাড়ীর ছাদে আলিসায় লম্ফ দিয়া ফিরিতেছে। বহরমপুরের দিকে হনুমানের অত্যন্ত প্রভুত্ব। গাছগুলির কাঁচা পাকা ফল ছিঁড়িয়া পাতা ফুল নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া কতক খাইয়া, কতক ফেলিয়া তাহাদের সে-কি উল্লম্ফন ও আনন্দধ্বনী! হাজার উপদ্রব করিলেও কেহ তাহাদিগকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে বা লাঠি লইয়া খোঁচাইতে পারে না। মুখের তাড়া তাহারা গ্রাহ্যও করে না। মনোরমার চক্ষে এ দৃশ্যও নূতন, সে কৌতুকের সহিত এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল, পাশে পাড়ার জানকীয়ার মা দাঁড়াইয়াছিল, মনোরমা কহিল, ওরা তো বড় অত্যাচার করে দেখছি, গাছপালা লতাপাতা সব যে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেল্‌লে, ঐ তোমার চালে ব'সে কচি কচি কুমড়ো গুলো খাচ্ছে, কাদের চাল থেকে ছিঁড়ে এনেচে আর কি?

জানকীয়ার মা কহিল "দু'দশ দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বেশ উপদ্রবও করে, আর এক একদিন যেন মাতুনি আরম্ভ হয়, কেঁইয়ারা আবার সাধ ক'রে এক একদিন ওদের রুটী, ফল ছড়িয়ে খাওয়ায়, সে দিন কি ব্যাপার! পালে পালে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়, আর দু'হাতে খায়।

মনোরমা কহিল, দেখতে বেশ মজা লাগে তো, কেঁইয়ারা কি ওদের জন্য থাকবার বাড়ীও দিয়েছে না কি? থাকে কোথা এত?

জানকীয়ার মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, বলেচেন মিথ্যে নয়, ওদের জন্যে একটা ধর্ম্মশালা ক'রে দিলে হয়। বাড়ী না ক'রে দিলেও কেঁইয়াদের শাসনে কেউ ওদের ঢিল পর্য্যন্ত ছুঁড়ে মারে না, একবার একটা বাবু গোঁয়াতুমি ক'রে বন্দুক ক'রে একটা হনু মেরেছিল, পর দিন কলেরা হয়ে সে লোকটি ম'রে গেল; ওরা রামের চর, তবে ওদের উপদ্রবে ক্ষেতের পটল, শসা, কাঁকুড়, গাছের ফল বড় লোকসান হয়।

এই সময়ে দরোয়ান কালীসিংয়ের সহিত একটি ভদ্রলোককে আসিতে

দেখিয়া মনোরমা বাগান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিবা মাত্র, স্নেহাস্পদ কণ্ঠে কে ডাকিল, "মনু মা।" কত দিন এ স্নেহ-আহ্বান মনোরমার কাণের ভিতর অমৃতধারা ঢালিয়া পরাণের বালিকা ভাবকে নাচাইয়া তুলে নাই, মনোরমা চকিতে ফিরিয়া পুলককম্পিত বক্ষে পিতার পদধূলি লইল। রমাকান্ত বাবু সস্নেহে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

মনোরমা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহোজ্জ্বল-কণ্ঠে ডাকিল, বাবা, কেমন আছ? মা কেমন আছেন?

"সবাই ভাল, তোর জন্যে তোর মা সারা হ'য়ে যাচ্চেন, কিন্তু মনু, এ-কি হয়ে গেছিস মা?" রমাকান্ত বাবু শিহরিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বর্ণপ্রতিমা অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী মনোরমা একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে, এ-কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন। চক্ষু যেন নিষ্প্রভ, গণ্ড দুটি পাণ্ডুবর্ণ, সুগঠিত দেহখানি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, বিদ্যুৎকান্তি সতীর পিতা দক্ষরাজ, সতীর কালিমামূর্ত্তি দেখিয়া যতটা মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু বুঝি ততোধিক ব্যথা অনুভব করিলেন।

পিতার প্রাণস্পর্শী বেদনাসূচক প্রশ্নে মনোরমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, পিতার চরণে আছাড়িয়া পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়। কিন্তু দুঃখের ভার তখনি তার বুকের মধ্যে বিরাট বোঝার সম হইয়া নিশ্বাস পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরিত, যখন সে নিজের কাহিনীর একটি মাত্র কথাও অপরকে জানাইতে পারিত না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া, হাস্যমুখে মনোরমা কহিল, এসো বাবা ঘরে এসো, তুমি যে হঠাৎ এলে?

"তোর গর্ভধারিণী তোর জন্যে বড় অস্থির হয়েচে, কান্না কাটি করচে, আমি তাই তোকে নিতে এলুম, জামাই কই?"

মনোরমা পিতাকে লইয়া গৃহে আসিল, অন্নপূর্ণা আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। রমাকান্ত বাবু প্রণাম করিয়া কহিলেন, মনুর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? আমাকে যদি একবার জানাতেন নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা পত্র করাতুম, ভিতরে হয় তো কোন অসুখ বিসুখ হয়েচে।

অন্নপূর্ণা জানিতেন, মানসিক ব্যাধিই মনোরমার স্বাস্থ্য ভঙ্গের মূল। কোন কথা এখন আর গোপন করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আমার পোড়া কপাল বেহাই মশাই, মনের অসুখেই বৌমা এমন হয়ে যাচ্ছে। বাছার

মুখের দিকে চাইতে আমার চোখে জল আসে, আমি কতবার আপনাদের কাছে যাবার জন্যে বলেচি, তা যেতে চায় না। সন্তোষ তো আর শোধরাল না, দুটো দুটো সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম কিন্তু ছেলের মতি-গতি ফিরলো না।

রমাকান্ত বাবু সকলি বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন আমি আজই মনুকে নিয়ে যাচ্ছি, আর দশদিন পরে এলে বোধ হয় মেয়েটাকে ফিরে পেতুম না, আপনারাও কলকাতায় চলুন, অনেকদিন এসেচেন, মনোরমার জননী মেয়ের জন্য পথ চেয়ে আছেন। মেয়ে চিঠিতে কোন কথাই লেখে না—জবাবই বড় একটা দেয় না।

অন্নপূর্ণা সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, সন্তোষ আজ বৈকালে আসবে বলে গেছে, সে এলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েই যান।

রমাকান্ত বাবুর ক্রোধাগ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, পরুষকণ্ঠে কহিলেন কেন? আমি কি তাকে না জিজ্ঞেস করে নিয়ে যেতে পাবো না? সে যদি নাই আজ আসে, বা নিয়ে যেতে না দেয়? আমার মেয়ে আমি নিয়ে যাব, তার হুকুম আমি চাই না, বিয়ে ক'রে কিনে ফেলেচে আর কি? একেবারে হত্যে করতে বসেচে! যার কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই, তাকে আমি পশু বলে মনে করি। যে মেয়েকে আমরা বুক দিয়ে ঢেকে মানুষ করেচি, তার এ নির্য্যাতনে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। মনু, তুমি প্রস্তুত হও।

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিলেন না, মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া কহিল, বাবা, চুপ করো, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমার শাশুড়ি মাটির মানুষ তাঁর দোষ কি?

রমাকান্ত বাবু আজ বড় দুঃখে রাগিয়াছেন, সুতরাং কহিলেন, দোষ তো তাঁরই, ছেলেকে তিনি প্রথম হোতে শাসনে রাখতে পারেন নি, নইগে এতটা বাড়া বাড়ি হোতো না। আজ বড় অসহ্য হয়েচে বলেই বলচি. তিনি বিয়ের সময় ছেলের বিষয় সমস্ত গোপন করেছিলেন,তার জন্যেই আমার এ সর্ব্বনাশ।

অন্নপূর্ণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চলিয়া গেলেন, হায় হায় পুত্রস্নেহান্ধ হইয়া, পুত্রের হিতের জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে দোষের ভাগী হইতে হইয়াছে, পুত্রের সুখের জন্য তিনি যে কতখানি দিয়াছেন, ও এখনও দিতে পারেন, অপরে তাহা কি বুঝিবে! কিন্তু ওহো, এমনি সন্তান-স্নেহ তো সবারি! রমাকান্ত বাবুরই বা দোষ কি!

অন্নপূর্ণাও পিতার সহিত মনোরমার চলিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। সন্তোষ আসিয়া অনর্থ বাধাইবে? তা আর কি করা যায়! এদিকে রমাকান্ত বাবু কহিলেন,মনু,প্রস্তুত হও তোমায় আমি রেখে যাব না।

মনোরমা করুণ-কণ্ঠে কহিল বাবা, আজকের দিনটা থাকো, আমি চলে গেলে আমার খাশুড়ী ক্ষুণ্ণ হবেন, উনিও দু'একদিনে যাবেন, আমি ওঁর সঙ্গেই যাব। রাগ কোরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।

রমাকান্ত বাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, তাঁহার মনে হইল হয়-তো মনোরমা স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতে চায়, তবে হয়-তো তিনি যতটা ভাবিয়াছেন, ততটা নয়, উভয়েরমধ্যে কতকটা অনুরাগ জন্মিয়াছে। কহিলেন মনু, তুমি যাতে খুসী হও, আমি তাই কোরবো মা, তোমার অনিচ্ছায় তোমায় আমি নিয়ে যাব না, কিন্তু বাছা, তোমার গর্ভধারিণী আমায় তোমাকে নিতে পাঠিয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে কি জবাব দেবো?

ঠিক এই সময়ে নৌকাযাত্রী কোনও আরোহী সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী,
হেরিতে সে মুখ বিলম্ব সহে না"

প্রাণাধিকা দুহিতার জন্য, হিমালয় মহিষী মেনকার এই প্রাণস্পর্শী মাতৃস্নেহ বাঙালীর ঘরে, মাতা ও কন্যার মধ্যে এমন একটি করুণরস-সিক্ত আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে, যাহা জগতের অপর কোনও সাহিত্যে সুদুর্লভ।

মনোরমার বক্ষ আবেগভরে কাঁপিয়া উঠিল, পিতার চরণে লুটাইয়া বিবসার ন্যায় কহিল বাবা, আমি কি দোষ করেছিলাম যে আমায় তোমরা পর করে দিলে। কতখানি অব্যক্ত বেদনা ঐ কয়টি কথারমধ্যে ফুটিয়া উঠিল! রমাকান্ত বাবু অশ্রু-সজল-চক্ষে কন্যাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরসীবালা বসু,

বিবিধ

—:o:—

দাদাভাই নৌরজী—ভারতের রাজনৈতিক ঋষি, অকৃত্রিম দেশ-সেবক দাদাভাই নৌরজী, ৯২ বৎসর বয়সে, গত ৩০শে জুন দেহত্যাগ করিয়াছেন। সহযোগী সঞ্জীবনী সত্যই বলিয়াছেন, "তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ গেল. কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর মন-মন্দিরে স্বদেশ-সেবক চিরকাল পূজ্য হইয়া থাকিবেন।" পিতার গৃহে তাঁহার আত্মা চিরশান্তিতে বিরাজিত থাকুক।

ধূমপান নিষেধ পরোয়ানা—ছাত্রদিগের মধ্যে ধূমপানাসক্তি ক্রমশ প্রবল হইয়া দাড়াইতেছে, অনবরত চুরুট, সিগারেট প্রভৃতির ধূমপান করিয়া কিশোর-বয়স্ক বালকগণ তাহাদের ফুস্ ফুস্, মস্তিষ্ক ও দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে; সুখের বিষয় সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দুর্নীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের এ্যাঃ ডিরেক্টর মিঃ এফ, সি, টর্ণার বাহাদুর বিভিন্ন বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরগণকে, মাদ্রাসা ও কলেজ সমূহের অধ্যক্ষগণকে. সরকারী স্কুলের মাষ্টারগণকে ও ডেপুটী ইন্স্পেক্টারগণকে একখানি সার্কুলার লেটার বা ইস্তাহার পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"কলিকাতা ২৪শে এপ্রেল, ১৯১৭। মহাশয়, বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় জানিতে পারিয়াছেন যে. এই প্রেসিডেন্সী স্কুল ও কলেজ-সমূহের ছাত্রগণের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার কু-অভ্যাস প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্রমেই তাহা বাড়িতেছে। এত অল্প বয়সে ইহাতে অভ্যস্ত হইলে বালক-গণের শরীর গঠনে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, এই কারণে ইহার প্রতিষেধ ব্যবস্থা প্রয়োজন। অতএব, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় বিবেচনা করেন যে. ছাত্রেরা যাহাতে সিগারেট খাইতে অভ্যস্ত না হয়, তাহার জন্য স্কুল কলেজ সমূহের হেডমাষ্টার প্রিন্সিপালগণ যেন স্কুল ও কলেজ বাড়ীতে সিগারেট বিক্রয় এবং স্কুল কলেজ বাটীতে বা বাহিরে ছাত্রগণের সিগারেট খাওয়া বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা যেন মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে পড়াইতে পড়াইতে অবান্তরভাবে সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা বুঝাইয়া দেন। তামাক খাওয়া বা কোনরূপ মাদক ব্যবহারে যে তরুণ বয়স্ক বালকগণের

শরীর গঠনে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়া শিক্ষকেরাও যেন স্কুল বাড়ীতে তামাক সিগারেট প্রভৃতি না খাইয়া, ছাত্রদের উপর অক্ষুণ্ণ আদর্শের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন, ইহাও অভিপ্রেত। অন্তত তাঁহারা যেন ছাত্রগণের সম্মুখে ধূমপান না করেন। বালকেরা এই আদেশ অমান্য করিলে প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া, পুনরায় করিলে তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে হইবে।"

শ্রীমতী বেসান্ত—শ্রীমতী বেশান্ত ও তাঁহার সহকারী দ্বয়ের আবদ্ধের বিরুদ্ধে আজ দেশময় প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। তত্ত্ব-দর্শীর চক্ষু কোন ঘটনাকে নিষ্ফল জ্ঞান করেন না, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এই ঘটনাতেও বোঝা যায়। স্বাধীনচিন্তা, স্পষ্ট বাদিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি মহৎগুণগুলি একপ্রকার আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু আজ কিসে এই সকল ভাব জাগ্রত হইল? ইংরাজজাতির স্বাধীনভাব এবং ইংরাজী শিক্ষাই আমাদিগকে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—এ-কথা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি স্বাধীন-চিন্তা দ্বারাই উন্নত হইয়াছে।

দেশ সেবকের সম্মান—স্বদেশ-সেবক বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতসচিবের কাউন্সলের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে সমস্ত বাংলাদেশ আনন্দিত। সহযোগী বাঙ্গালী যথার্থই বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্মের প্রভাব যেমন করিয়াই হউক আত্মপ্রকাশ করিবেই। কোন বাধা-বিঘ্ন উহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে; যে ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাসনের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন, আজ নয়বৎসর পরে তিনি যে ভারত-সচিবের শাসনপরিষদের অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন এ কথা কে ভাবিয়াছিল।"

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা গলান নিষেধ—ভারত রক্ষা আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট এই হুকুম বাহির করিয়াছেন। এতদনুসারে কেহ কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা অলঙ্কারাদি প্রস্তুতের জন্য গলাইতে পারিবে না, গলাইলে ভারত রক্ষা আইনের আমলে আসিতে হইবে, অর্থাৎ দোষী ব্যক্তি অবরুদ্ধ হইবে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

বর্ষাকাল আসিয়াছে। দেশে ম্যালেরিয়ার মরসুমও আগত প্রায়। যাঁহারা অধিকাংশ সময় কর্ম্মকাজ লইয়া সহরে থাকেন, তাঁহারা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দেশের মধুর-আহ্বানে সানন্দে প্রিয় স্বদেশের ক্রোড়ে আসিয়া শান্তি অনুভব করেন। বাগানের আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুপক্ক ফলের রসাস্বাদনে সপরিবারে কতই আনন্দ সম্ভোগ করেন। কিন্তু হায়, সে কয়টি দিন অন্তে বর্ষা-সমাগমে সেই প্রিয় জন্মভূমির এ-কি মূর্ত্তি! তাই সভয়ে তাঁহারা একে একে আবার যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কিন্তু যাঁহাদের দেশ ভিন্ন আর অন্যত্র স্থান নাই তাঁহারা নিঃশব্দে ম্যালেরিয়ার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন আর কি করিবেন!

ম্যালেরিয়া নিবারণের কত উপায় নির্দ্ধারণ হইল—এখনও হইতেছে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া ক্রমাগত ম্যালেরিয়া-নিবারণ-তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু জানি না, তাহাতে পল্লীবাসিগণ কর্ণপাত করিয়া কতদূর সাবধানতা অবলম্বন করেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া যে বিষয়ে উপকার পাইয়াছি,তাহার কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে আমাদের প্রিয় কুশদহবাসী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত নরনারীগণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি; সকলে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিবেন কি? বিষয়গুলি এমন কিছু নূতন নহে, সকলেই জানেন—বোঝেন, কিন্তু আলস্য ও অগ্রাহ্য করিয়া নিয়মগুলি পালন করেন না। তথাপি আমরা উল্লেখ করিলাম।

(১) পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইয়া পান করা। প্রত্যহ দুই বেলা রান্নার পর উনানে বড় হাঁড়িতে জল বসাইয়া রাখিলে বৃহৎ পরিবারেও জলের অনাটন হইবে না।

(২) রাত্রে সল্পাহার করা, এবং প্রাতে কিছু খাওয়া ও কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান করা।

(৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত পরিশ্রম করা, কিছুক্ষণ ভ্রমণ করা, হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগা।

(৪) সাধ্যমত বাস-গৃহ—বিশেষ শয়নকক্ষ স্যাঁৎসেঁতে নিবারণ করা,

স্বাস্থ্যতত্ত্ব কিছু কিছু পাঠ করা. পরীক্ষা করা, নিয়মপালনে যত্নশীল থাকা, ইহা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইবে।

দৈনিক বাঙ্গালীতে গোবরডাঙ্গার নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতে আমরা দেখিতে পাই। যদিও তাহাতে জনহিতকর বিশেষ কাজের কথা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গত ২৪শে আষাঢ়ের কাগজে "মজানদী" হেডিংএ যমুনানদী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য ঐ বিষয়ে যথাসময়ে কুশদহে যথেষ্ট লেখালিখি হইয়াছে, এবং উপস্থিত নদী সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্যের আশা নাই বলিলেই হয়, তথাপি এ বিষয়ে যদি কেহ কিছু আন্দোলন করেন, আমরা তাহার সঙ্গে সহানুভূতি—প্রতিধ্বনী না করিয়া পারি না। দ্বিতীয়কথা যাহা লিখিয়াছেন, যমুনা নদীর স্নানের ঘাটগুলি পরিস্কার করা সম্বন্ধে—সে জন্যও আমরা বারম্বার লিখিয়াও বিশেষ কোন প্রতিকার হইতে দেখিলাম না। অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া স্নানের ঘাট পরিস্কার করিবার কথা যাহা লিখিয়াছেন সে আশা সুদূরপরাহত। আমরা মনে করি, গোবরডাঙ্গা-মিউনিসীপালিটীরই এই কর্ত্তব্য। তার পর, স্ত্রীলোকের স্নানের স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্ধারণ জন্যও পূর্ব্বে কত কথা আমরা লিখিয়াছি, কিন্তু তাহারও কখন কোন প্রতিবিধান হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, উহা হইতে পারে না। যেখানে "হয় না" "হইতে পারে না" সকল বিষয়ে এই একই উত্তর, সে দেশ যে নিদ্রিত!

গত ২১শে, মাঘ খাঁটুরা স্কুলের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ সভায় ও স্কুল গৃহে ছাত্রগণের সম্মুখে ধূমপানের বিরুদ্ধে আমাদের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে যাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য সম্প্রতি বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের এ্যাঃডিরেক্টর মিঃ এফ, সি টর্ণার বাহাদুর বিভিন্নবিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরগণকে, সরকারী স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার এবং ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরগণকে একখানি সার্কুলার লেটার বা ইস্তাহার পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অন্যত্র "বিবিধ" বিষয়ের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইল তাহা একবার তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স্‌ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৪ { চতুর্থ সংখ্যা

সঙ্গীত

—০—

(ঝিঁঝিট—একতালা)

তোমারি জয়, তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়।

যে জন চায়, সেত তোমায় পায়, যে জন না চায় সেও তোমায় পায়।

ঘোর পাপের পাপী মানব তনয়, প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়; তব প্রেম ফাঁদে যখন প'ড়ে যায়, তখনই সে তৃণসম হয়।

অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্ত প্রায়, ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়; তব প্রেম-আস্বাদন, যদি একবার পায়, শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায়।

তোমার কথায় তোমার সেবায়, যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়; মম মন প্রাণ, সততই যেন, তব প্রেমসুধা পানে মত্ত হয়।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

বিলাতী বর্জ্জন না বিলাসিতা বর্জ্জন

স্বদেশী আন্দোলনের সময় সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিলাতীদ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। স্বদেশীদ্রব্য নিকৃষ্ট—মূল্যাধিক্য হইলেও তাহাই অনেকে কিনিয়াছেন, তথাপি উৎকৃষ্ট সুলভ বিলাতী জিনিষ সকলে ব্যবহার করেন নাই। এখন সে অগ্নি নির্ব্বাপিত। ঘটনা স্রোতও প্রতিকূল অবস্থায় প্রবাহিত। এখন ইউরোপীয় দ্রব্য অভাবে - অগ্নি-মূল্যের জন্য সাধারণের অন্তর্দাহ উপস্থিত।—জনসাধারণ বলিতেছেন, "এই যুদ্ধের সময় বড়ই দুঃসময়, ব্যবসায় কর্ম্ম বন্ধ, চাকরীর পথ সংকীর্ণ, অপর দিকে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য," সুতরাং সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছেন, কবে যুদ্ধ মিটিবে, কবে আবার পূর্ব্ববৎ বিলাতী দ্রব্য-সম্ভার অক্লেশে পাওয়া যাইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যও সচ্ছন্দে চলিবে।

এই সময়ে দেশের শিল্পোন্নতি যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য একটা 'উচ্চরব' চারিদিকে শুনা যাইতেছে, দেশানুরাগী দেশহিতৈষীগণ এজন্য আন্তরিক আকাঙ্খা প্রকাশ করিতেছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদক, লেখক প্রভৃতি একদল লোক বলিতেছেন, "দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইবে। দারিদ্র্যতাই ভারতের দুঃখের কারণ, অতএব দেশের ধন বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা করিতেই হইবে।" কিন্তু সকলেই মনে মনে বুঝিতেছেন, দেশের জিনিষে দেশের অভাব পূর্ণ হইবার আশা কোথায়? বস্তুত এ পর্য্যন্ত স্বদেশী ক'টা জিনিষ হইয়াছে, আর মুষ্টিমেয় যাহা হইয়াছে, তাহা মোজা, গেঞ্জী, চিরুণী আর সাবান; অর্থাৎ সবগুলিই বিলাস-দ্রব্য।

অবশ্য একদিন না একদিন যুদ্ধ মিটিবেই, আবার ইউরোপীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া ভারতে আসিতে পারিবে। কিন্তু এই যুদ্ধে যে পরিমাণে কর্ম্মী শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, লোকক্ষয় হইয়াছে—সবরকমে শিল্পবাণিজ্যের অবাধগতিতে যে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা কি সহজে পূর্ণ হইবে? আবার দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলেও পূর্ব্ববৎ মূল্য-সুলভ কি শীঘ্র হইতে পারিবে? এ-দিকে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যেরও যখন এই অবস্থা, তখন কাজে কাজেই আমাদের বিলাস-দ্রব্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যও (যেমন ঔষধাদি) আকাঙ্খানুরূপ সুলভে না পাইয়া ব্যথিত হইতে থাকিব, অথবা বিলাস-বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইব? কিন্তু বাধ্য-কৃত কাজে আন্তরিক কল্যাণ হয় না। বুঝিয়া শুনিয়া স্ব-ইচ্ছায় যাহা করা যায়, তাহাই স্বাভাবিক—জ্ঞানগত ক্রিয়া।

গতবারে আমরা "যুদ্ধের পর আমাদের অবস্থা" প্রবন্ধের শেষাংশে বলিয়াছিলাম, "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতা-প্রধান দেশ, এখানে ঠিক ইউরোপের ন্যায় কলকারখানার উন্নতি যদি নাও হয়, আমাদের প্রয়োজনানুরূপ জাগতিক উন্নতির সঙ্গে মানসিক—আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। ভারতের কর্ম্ম-শক্তি যদি একান্ত প্রবল হইত, তাহার পরিচয় এই (অভাবের) সময় কিছুওতো পাওয়া যাইত।"

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করি না। কিন্তু আমাদের শিল্পোন্নতির আদর্শ ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় শিল্প পৃথিবীকে যে প্রকার বিলাস-ব্যসনের দিকে লইয়া যাইতেছে, আমরাও যদি সেই ভাবে শিল্পোন্নতিতে আকৃষ্ট হই, আমাদেরও দ্রব্য-সম্ভারের প্রকৃতি যদি ঐ ছাঁচের হয়, তবে তাহা ভারতের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক হইবে না, কারণ প্রাচ্য সভ্যতার প্রকৃতি ভিন্নরূপ। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য বাহ্যদ্রব্য-সম্ভার যতখানি প্রয়োজন, ততখানি আমরা চাই। অবশ্য পাশ্চাত্য সঙ্ঘর্ষে আমাদের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদনুসারে আমাদের অভাব বোধেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমরা কতকটা ইউরোপীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া পারিব না, কিন্তু এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে পৃথিবীর ওলট-পালট দিনে, আমাদের একটি শুভ অবসর আসিয়াছে—তাহা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের আদর্শ-স্থির করিয়া চলিবার জন্য।

প্রয়োজনানুরূপ শিল্পোন্নতি ও তাহার ব্যবহার, আর বিলাস-ব্যসনোদ্দেশ্যে শিল্পোন্নতি এক আদর্শ নয়। শিল্পবাণিজ্যের একান্ত উন্নতিপ্রয়াসী হইয়া ইউরোপ ভারতবর্ষকে যে শিক্ষা দিলেন, ভারতবর্ষ যদি আবার সেই পথেই প্রলুব্ধ হইয়া চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা কি পারিবেন ? অথবা তাহা কি ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে ?

এ বিষয়ে স্বভাবত আমাদের যাহা মনে হইয়াছে, যে আদর্শের আভাষ মাত্র দেওয়া হইল, সুখের বিষয় এইরূপ ভাবের সহিত কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের সায় পাইতেছি। সম্প্রতি একখানি সাপ্তাহিক পত্রের একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"পাশ্চাত্য অনেক বিজ্ঞ অর্থনীতি শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরও এই মত যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দুর্দ্দশার মূল কারণই এই Industrialism এই পাশ্চাত্য Industrialismএর স্রোতকে প্রতিহত করিবার একমাত্র উপায় আমাদিগের হাতে আছে—'বিলাস-বর্জ্জন' এবং কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।"

লেখক আর একস্থানে বলিতেছেন—"সত্য বটে, পরিবর্জ্জন করিতে হইবে; কথাটা যত সহজ কাজটা তত সহজ নহে। বন্যার বেগকে শুধু বালির বাঁধান দিয়া কখনও আকটাইতে পারা যায় না। গভীর স্বদেশ-প্রেম ও অটল প্রতিজ্ঞা ব্যতীত কখনই যে আমরা এই পাশ্চাত্য স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে পারিব না, তাহা সুনিশ্চিত। * * * * আমাদের ন্যায় সর্ব্বোতভাবে পরমুখাপেক্ষী জাতি ত্যাগের পথ ব্যতীত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে কেবল বক্তৃতায়। যে পথেই যাই না কেন, বিলাস-বর্জ্জন ব্যতীত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্য পথ আর নাই। যিনি গায়ের জ্বালায় যতই বলুন না কেন কেহই আজ পর্য্যন্ত কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।"

এইবার বোধহয় আমাদের বক্তব্য অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বলিতে চাই,—

(১) যুদ্ধ মিটিলেও শীঘ্র বিলাতী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাইবার আশা করা যায় না, কিন্তু না পাইলেও তত ক্ষতি হইবে না, যদি আমরা বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে পারি।

(২) ভারতের দারিদ্রতা দুর করিতে হইলে বিলাস-ব্যসন বর্জ্জনই তাহার অন্যতম পন্থা।

(৩) দেশের ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে, যদি সংযম না থাকে, তবে তাহা সফল হইবে না।

(৪) কেবল উৎপন্ন বৃদ্ধিতে মানব-সমাজের দুঃখ দুর হইতে পারে না, যদি তাহার সঙ্গে চরিত্রে সংযম না থাকে। সংযমই সকল দিক দিয়া শান্তি আনয়ন করে।

একদিন আমরা যাহা বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম, এখন তাহা আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। বিলাতী-বর্জ্জন সূত্রে স্বদেশীর উদ্বোধন হইয়াছিল, এখন তাহাকে লাভ করিতে হইবে বিলাসিতা বর্জ্জনে। মঙ্গলময় বিধাতা সম্মুখে সেই দিন আনিতেছেন।

ভারতবাসী—বঙ্গবাসী সকলেই বিলাসিতা-বর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাচ্য-সভ্যতার পুনপ্রতিষ্ঠা করুন।

ম্যালেরিয়া ও মশক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একদিন এই ফলফুলশালিনী শস্যভরা বঙ্গভূমিকে Paradise on earth অর্থাৎ ভূ-স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ১৮০৭ সালেও তাৎকালিক গভর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো মহোদয় বাঙ্গালীর দৈহিক গঠন দেখিয়া আনন্দে লিখিয়াছিলেন—

"I never saw so handsome a race, They are much superior to Madras people, whose forms I admire also. Those are slender, these are tall, muscular, athletic, figures perfectly shaped and with the finest possible cast of Countenanece and features. The features are of the most Classical European models with great variety at the same time,"

এখন আর সে বাঙ্গলা বা সে বাঙ্গালী নাই। "ভূস্বর্গ" এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাহার পল্লীগুলি বুঝি নিষ্প্রদীপ হইতে বসিল। ম্যালেরিয়া জীর্ণ পল্লীবাসীর দেহ এখন ব্যাধির সামান্য তাড়নায় পরাভূত হইয়া জীবন-বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন, এই মানব-শত্রু ম্যালেরিয়া এক প্রকার জীবাণু সম্ভূত ব্যাধি। এই জীবাণু (Plasmodium) এত ক্ষুদ্র যে আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে উহাদিগকে দেখিতে পাই না। সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে উহারা এক একটি বৈঁচ ফলের ন্যায় দেখায়। চক্ষুর চক্ষু অণুবীক্ষণের সাহায্যে আজ কাল অনেকেই উহাদিগকে নয়নগোচর করিতেছেন।

ঐ অণুদেহিজীবাণু "এনোফিলিস্" জাতীয় এক প্রকার মশকের দ্বারাই মানব-দেহে সংক্রামিত হয়। সাধারণ মশক হইতে "এনোফিলিস্" মশকের কিছু পার্থক্য আছে। উহাদের হুলের উভয় পার্শ্বে দুইটি শুঁড় ও পক্ষোপরি ছিট্ ছিট্ শ্বেত কৃষ্ণ চিহ্ন দেখা যায়। ইহারা গৃহ ভিত্তিতে বাঁকাভাবেই বসে;—কখনই সোজা হইয়া বসিতে পারে না।

"এনোফিলিস্" মশক রোগীর দেহে হুলবিদ্ধ করিয়া রোগ-জীবাণু টানিয়া লয়। কয়েক দিন পরে মশক-দেহে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই

অবস্থায় ঐ মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণু দষ্ট ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রোগানয়ন করে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, "এনোফিলিস্" মশককে দেশ হইতে দূর করিয়া, উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে—আর ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িতে হয় না। তাই এখন সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ মশক বংশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং উহাদের দংশন-জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

অল্প দিন হইল, বিলাতের অধ্যাপক ডাক্তার এ, ই, সিপ্‌লে মহোদয় মশকের গতি প্রকৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুরুষ মশকের দ্বারা রোগ বিস্তারের কোন ভয় নাই; মশক পত্নীরাই বিষবাহিকা। উহারা দংশনকালে দষ্টস্থানে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। ঐ ডিমের সহিত রোগ-জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে।

মশকগণ যেমন সকলে মিলিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে গীত গাহিতে থাকে, মশকীরা সেরূপ করে না। তাহারা চোরের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়াই আমাদের দেহে হুলবিদ্ধ করে।

মহাত্মা সিপ্‌লে দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মশক সম্বন্ধে আরও যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই—

ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা ও মধ্যে মধ্যে গাত্রে হরিদ্রা লেপন করা ভাল। হরিদ্রা মশকের প্রধান শত্রু,—হরিদ্রার গন্ধে উহারা মরিয়া যায়। যে ঘরে অধিক পরিমাণে হরিদ্রা চুর্ণ থাকে, তথায় মশকের প্রবেশাধিকার নাই। ইহারা ঐ দ্রব্যকে এত ভয় করে যে, হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের উপর বসিতেও সাহস করে না।

নীল রঙ্‌টি মশকের বড়ই প্রিয়। তাই তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া নীলাম্বরেই বসিয়া থাকে। নীলাম্বর পাইলে আর কোন স্থানে তাহারা বসিতে চাহে না। সিপ্‌লে যখন আফ্রিকার মশক-প্রধান স্থানে বাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার তাম্বুর কাপড় নীল রঙ্ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে রাত্রিতে যখন তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন, তখন একটি মশকও তাঁহাকে দংশন করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইত না, সকলে সেই নীল তাম্বুর উপর বসিয়া মজ্‌গুল হইয়া থাকিত।

সিপ্‌লে বলেন, মশকের ঘ্রাণশক্তি একেবারেই নাই। তাহারা শব্দ

শুনিয়া আহার অন্বেষণে সেই দিকে ধাবিত হয়। যে সকল ব্যক্তি বেশ স্থির ভাবে বসিয়া থাকে, কোন প্রকার শব্দ করে না তাহাদের দংশন জ্বালা বড় একটা সহ্য করিতে হয় না। বেশী কথাবার্ত্তা কহিলে অথবা যে কোন প্রকার শব্দ করিলেই এই ক্ষুদ্র রাক্ষসের দল পালে পালে আসিয়া ঘাড়ে পড়ে। নিদ্রাবস্থায় যাহাদের নাসিকা গর্জ্জিতে থাকে, তাহাদের আর রক্ষা নাই। খাটের শব্দ, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শব্দ বা ঐরূপ কোন একটি শব্দ শুনিতে পাইলেই উহারা সেই দিকে ছুটিয়া যায় এবং শায়িত ব্যক্তির অঙ্গে বসিয়া হুল ফুটাইতে থাকে।

মশক দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় পর্য্যাপ্তরূপে তৈল মাখা। ডাক্তার সিপ্‌লে দেখিয়াছেন যে, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত তৈল মাখিয়া থাকে। এমন কি তাহারা রাত্রিতেও তৈলাক্ত দেহে শয়ন করে। কোন কোন দেশের লোক নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিয়া গাত্রে লেপন করে এবং শিশুসন্তানগণকে মাখন মাখাইয়া পুষ্ট করে। ইহার ফলে তাহাদের চর্ম্ম এমন স্থূল হইয়া উঠে যে, সহসা কোন মশকই তাহাতে হুলবিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশে বাস করিতে হইলে নিত্য সাবান ব্যবহার করা উচিত নহে। ডাক্তার সিপ্‌লের মতে সাবান মাখিয়া গাত্র পরিষ্কৃত করিলে নাকি মশকদিগের দংশন করিবার বড়ই সুযোগ ঘটে।

দিবারাত্র পোষাক পরিচ্ছদ আঁটিয়া থাকাও অনুচিত। যাহারা সর্ব্বদা বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া রাখে, তাহাদের চর্ম্ম নিতান্ত পাত্‌লা হইয়া যায়। কাযে কাযেই মশকগণও অতি সহজে তাহাদিগকে দংশন করিতে পারে। তৈল, জল ও রবিতাপে গাত্রচর্ম্ম মোটা (tough) করিতে পারিলে অনেকটা বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। সিপ্‌লে দেখিয়াছেন, সুসভ্য ইউরোপীয়গণ যত সত্বর ম্যালেরিয়া বা পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়, আফ্রিকার নগ্ন অসভ্য জাতিরা তত সত্বর আক্রান্ত হয় না। আবার ইহাও দেখা হইয়াছে যে, মশকেরা ঐ সকল অসভ্য লোকদিগের মুখমণ্ডলে দংশন করিলেই লোকগুলি পীড়িত হয়; অন্যত্র দংশনে হয় না। ইহার কারণ গাত্রচর্ম্ম অপেক্ষা মুখের চামড়া পাত্‌লা।

ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সাহিত্য-বিশারদ)

কুশদহের ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)



বাংলার সেন রাজগণের রাজত্বকালে কুশদ্বীপ একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। গঙ্গার পূর্ব্বদিকে এবং বাকলা চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে যে কয়টী ক্ষুদ্র ভূভাগ ছিল, তাহা দ্বীপ নামেই অভিহিত হইত এবং প্রত্যেক দ্বীপেই এক একজন ভূস্বামী ছিলেন। কিন্তু এই দ্বীপগুলি খণ্ডরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত অথবা এক একটী শাসনবিভাগ ছিল, তাহা ঘটক গ্রন্থ হইতে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এড়ু মিশ্রের কারিকা হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে এই দ্বীপ গুলিকে খণ্ডরাজ্য বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ কুশদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আর কয়েকটী দ্বীপের নাম দেওয়া হইল।

অন্ধুদ্বীপের মহিন্ত্যা শ্রীমাধব রায়।
গুড়ী শরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায়॥
সূর্য্যদ্বীপ অন্ধুদ্বীপ বেত্রবতী তীরে।
ভৈরব করতোয়া কপোতাক্ষ নহে দূরে॥

* * * * *

পাড়িহাল চক্রপাণি চাকু নামে খ্যাত।
জয়দ্বীপে নিজ বাস দুর্গাস্থিরে স্থিত॥
ঠোটরায়িগ্রামী চক্রদ্বীপে যার বাস।
কাঞ্চনপল্লী কুমারহট্টেতে প্রকাশ॥
ডিস্তী জনার্দ্দন শ্রীনগরেতে যার স্থান।
উহাও চক্রদ্বীপের অন্তর্গত গ্রাম॥
জগহড় অতি সুধী কুশদ্বীপ নৃপ।
ইচ্ছাপুর চতুধুরী শান্তমতি ভূপ॥
ঘণ্টা নিশাপতি প্রবাল দ্বীপে ঈশ।
জয়নগর পলাবাড়ী দেশে ক্ষিতীশ॥
শীতমুন্তী মনোহর এড়ুদ্বীপ শাস্তা।
গঙ্গাধারে আঁড়িয়াদহ যমুনা পূর্ব্বস্থা॥

কুলভির গুহিনাম, চক্রদ্বীপবাসী।
সে হলো এই সর্ব্বদ্বীপে জলবিসাসী॥
বৃদ্ধদ্বীপ প্রদেশ নাম খ্যাত বুড়ন।
দীর্ঘাঙ্গী মুণ্ডিকের মনতে জুভান॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে গঙ্গার ব দ্বীপে তখন কয়েকটী দ্বীপ ছিল। সে দ্বীপের শাসনভার সেনবংশীয় রাজাদের কর্তৃক যোগ্য-পাত্রে প্রদত্ত হইত। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে সেই সকল বিভাগের শাসনকর্ত্তা থাকিতেন এবং রাজোচিত সম্মান ভোগ করিতেন।

আমাদের দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাঘবসিদ্ধান্ত বাগীশ হইতে কুশদ্বীপের ভূস্বামিত্ব ইছাপুরের চৌধুরীগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এড়ুমিশ্রের কারিকা দেখিয়া সে ধারণা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। হড় চৌধুরীরা জগোহড়ের সময়ে লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে কুশদ্বীপের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে।

ইহা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে,কুশদ্বীপের পুর্ব্বে বুড়ন, পশ্চিম দক্ষিণে এঁড়েদহ, দক্ষিণে প্রবালদ্বীপ বা হাতিয়াগড়, পশ্চিমোত্তরে চাকদহ ও সুবর্ণপুর কুমারহট্ট প্রভৃতি এবং উত্তরে শ্রীনগর ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এক্ষণে কুশদহ বলিলে যে স্থান বা ভুভাগ বুঝায়, পূর্ব্বে তাহার ৮।১০ গুণ অধিক ছিল। এরূপ জানা যায় যে, এক্ষণে যাহাকে উখড়া পরগণা বলে পূর্ব্বে তাহা কুশদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। ঘটকগ্রন্থও তাহারই সমর্থন করিতেছে পূর্ব্বে নদীর ধারা অনুসারে শাসনবিভাগের নির্দ্দেশ হইত। হিন্দুরাজত্বকালে যে নদী যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত. তাহা স্থির করিয়া কুশদ্বীপের সীমা নির্দ্দেশ করা দুরুহ ব্যাপার। সম্ভবতঃ এ কার্য্য একেবারে অসম্ভব। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে যেরূপ মানচিত্রাদির সৃষ্টি, হিন্দু বা মুসলমান শাসনকালে সেরূপ ছিল না। তবে যে জরিপ কার্য্য হইত তাহা হইতে কতকটা মহলের পরিমাণ ও সীমা স্থির করা যাইত। সে সকল কাগজ পত্র তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সীমানির্দ্ধারণে কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

এড়ুমিশ্র হইতে জানা যায়, যে তের জন গৌণকুলীন গঙ্গার ব দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার একজন কুলীনও ভুমিদান গ্রহণ করেন নাই।

প্রতিগ্রহ করিতে কুলীনেরাই কোন কালে সম্মত ছিলেন না। আদিশূরের নিকট তাঁহারা যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ। সেন রাজাদের নিকট ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সন্তানেরা ভূমিদান লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। এখানে কথা হইতে পারে যে, বল্লালসেন কোন সময় সূর্য্যগ্রহণকালে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানের সময় তাঁহার মাতা রাসবিলাস দেবী দ্বারা ভরদ্বাজগোত্রীয় ও বাসুদেব শর্ম্মাকে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত সীমালী নামে একখানি গ্রাম দান করিয়া তাম্রশাসন লেখাইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত শর্ম্মা যে কুলীন বা সমাজে পূজিত ব্যক্তি ছিলেন এরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহা হইলে তিনি সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গঙ্গাতীরে স্বর্ণদান বা ভূমিদান গ্রহণ দ্বারা আপনাকে পতিত করিতেন না। ঐ দানগ্রহণান্তর তিনি যে, সমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়েন নাই, ইহার উত্তর কোথায়।

এখানে এইরূপ বিবেচনা হয় যে, সেন রাজগণ এই সকল স্থান একেবারে দান করিয়া হস্তান্তরিত করেন নাই। গৌণকুলীনগণকে ঐ সকল দ্বীপের পুরুষানুক্রমে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখনকার সময়ের জমিদারগণের ন্যায় ঐ সকল স্থানের উপসত্বভোগ করিতেন মাত্র। নহিলে সমস্ত দ্বীপের আয় কমিয়া গেলে তাঁহাদের রাজ্যও অল্পায়তন হইয়া পড়িত। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরাজগণের সময় হইতে ব্রাহ্মণ বংশীয় ভূস্বামীগণ গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব ভূভাগ শাসন করিতেছিলেন। এই সকল ভূস্বামীগণের মধ্যে ইছাপুরের হড় ও মহেশপুরের গুড়েরা এখনও বিদ্যমান আছেন।

মুসলমান আমলে তাঁহারা অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াও নিজ নিজ অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। বাংলা বিজয়ের পর প্রায় একশত বৎসরকাল পাঠানেরা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অধিকার স্থাপনে অগ্রসর হন নাই। সুবর্ণপুরের নিকটবর্ত্তী লাউপালা সিমহাটে বোধহয় তাঁহারা প্রথম মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদ নির্ম্মাণের তারিখ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং তৎপূর্ব্বে তাঁহারা গঙ্গার পূর্ব্বপার স্থিত ভূভাগ বশে আনিতে চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ নদীবহুল ও বর্ষায় প্লাবিত দরিদ্র পল্লীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি-এ)

শান্তিপথে



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"আমি পালিয়ে যাব"

কাছারী বাটীর মধ্যে দেওয়ানজির ব্যবহারের জন্য তিনটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রথমে একটি সু-বিস্তৃত হল-ঘর—এই স্থানে দেওয়ান বাবু অন্যান্য কর্ম্মচারী ও সাধারণ প্রজাবর্গের সহিত কার্য্য করেন। ইহার পরের কক্ষে কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য এবং তৃতীয়টি তাঁহার বিশ্রাম, চিন্তা, গোপন-পরামর্শ প্রভৃতি কার্য্যের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজ সুবোধচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের পশ্চাতে এই শেষোক্ত কক্ষেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কক্ষের বাহিরের বারাণ্ডা দিয়া অন্দর মহলে যাওয়ার পথ। এই বারাণ্ডার নিম্নে উদ্যানবাটীকা। সুবোধচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের পশ্চাদানুসরণ করিলে ললিতা বিষণ্ন মনে অন্দরমহলে গমন করিল।

সেই নির্জ্জন সুসজ্জিত কক্ষে শ্যালক ও ভগ্নিপতিতে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা প্রকাশ নাই। তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা দুইজনে বহুক্ষণ উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। অবশেষে সুবোধচন্দ্র বিরক্ত হইয়া চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, নগেন দা, আর কথায় কাজ নেই, এখন বাবার কাছেই যাই, তাঁর নিজের মুখেই সব কথা শুনি। যদি বুঝি যে আপনি যা বলচেন, তাই তাঁর আদেশ, তা হ'লে সেই মতই কাজ করব।

এই কথা বলিতে বলিতে সুবোধ অন্দরমহলে যাইবার বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আগতপ্রায় সন্ধ্যা। দিবসের ম্লান আলোক বিষণ্ন মুখে মিত্রবাটীর প্রাঙ্গন হইতে ধীরে ধীরে বৃক্ষ শিরে আসিয়া বিদায়-গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্লান্ত বিহঙ্গমকুলও উদাসপ্রাণে শাখায় শাখায় বসিয়া সঙ্গীত-তানের ভাষায় সকলকে জানাইয়া যাইতেছে, আমি যাই, যাই গো। রৌদ্র বলিল, আমি যাই, কর্ম্ম বলিল আমি যাই, পক্ষী গাহিল, আমি যাই। ঠিক সেই সময়ে সুবোধও নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে পলাইবার আশায় বাহিরের বারাণ্ডা-পথের খোলা হাওয়ায়, আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুবোধ বাহিরে আসিলে নগেন্দ্রনাথও অতি দ্রুত তাহার নিকট আসিয়া

সুবোধের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, দেখ সুবোধ, তুমি বিদ্বান ও সহৃদয় লোক, তোমার কি উচিত হবে যে, তুমি আজকের দিনে জ্যাঠা মশাইএর কাছে গিয়ে তাঁর প্রাণে ক্লেশ দেবে? নগেন্দ্রনাথ মিত্র-মহাশয়কে জ্যাঠামহাশয় বলিয়াই ডাকিতেন।

সুবোধ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, আমাকে ত্যাগ কর্‌তে যদি তাঁর ক্লেশ না হয়, আমি একবার দেখা করতে গেলে তাঁর কি বেশী ক্লেশ হবে নগেন দা?

নগেন। এ-টা তো তোমার কেবল একবার দেখা করা হ'চ্চে না, এ-টা হচ্চে তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া। অমনিই ত তিনি পুড়্‌চেন, তার ওপর তাঁকে আর বেশী দগ্ধাও কেন?

সুবোধ বাবু বলিলেন, আমারও ত একটা হৃদয় আছে নগেন দা। চিরদিনের জন্যে নিজের বাড়ী থেকে নির্ব্বাসিত হবার আগে বাবাকে একবার প্রণাম করবার ইচ্ছেও ত আমার হ'তে পারে। এই সামান্য ইচ্ছেটা পূরণ করতেও কি দোষ আছে?

নগেন। দোষ নিশ্চয়ই আছে। তুমি কি বলতে পার যে দেখা করতে গিয়ে তুমি তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস না ক'রে কেবল তাঁকে প্রণাম করেই চ'লে যাবে?

সু। তা কেমন ক'রে বলবো? আমি ত আর চোর নই যে, চুপি চুপি পালাব? আমি বাবার নিজের মুখে শুনব যে, তিনি আমার চেয়ে সমাজকেই বেশী ভালবাসেন।

সেই ম্লান দিবালোকে, সন্ধ্যাসমাগমের স্নিগ্ধ বায়ু করস্পর্শের মধ্যে যখন তাঁহারা উভয়ে বিদায় গ্রহণের প্রণালীর কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন পশ্চাৎ হইতে এক তৃতীয় ব্যক্তি ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলাপে বাধা দিয়া বলিলেন, বাবা সুবোধ, মিত্র মশাই তোমার জন্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে তাঁর বসবার ঘরে অপেক্ষা করচেন। তুমি অনেকক্ষণ বাড়ী এসেচ, অথচ, তাঁর সঙ্গে দেখা কর নি বলে তিনি একটু অধীর হয়েচেন। আমি তোমায় এই খবর দেবার জন্যেই এলুম।

যিনি পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞোপবীত, দীর্ঘ শিখা, গাত্রাবরণে নামাবলী, পদে কাষ্ঠ পাদুকা শোভা পাইতেছে। তাঁহার শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন বদন-মণ্ডলে শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া বিরাজিত, আয়ত

চক্ষুর্দ্বয়ে প্রতিভার উজ্জ্বলদীপ্তি দেদীপ্যমান। তাঁহার সু-প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ নাসা, সু-বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, সু-গঠিত ভুজযুগল ও উন্নত তাঁহার বপু। গাত্রবর্ণ তাঁহার উজ্জ্বল-শ্যাম। ধীর, প্রশান্ত, গম্ভীর তাঁহার মূর্ত্তি; স্নিগ্ধ, উদার, কোমল তাঁহার দৃষ্টি। অপরিচিত হইলেও প্রথম দর্শনেই তাঁহার পদধূলি লইতে ইচ্ছা করে, একবার তাঁহার কথা শুনিলে বারবার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার নাম শম্ভুচন্দ্র শাস্ত্রী; ইনি যৌবনকাল হইতেই এই পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ রূপে বাস করিতেছেন। ইনি চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ এবং বিদেশে সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত। বৃদ্ধ হরকান্ত মিত্র মহাশয় সুবোধের বিলাত গমনের কিছুদিন পরে সংসারে বিরক্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ মত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন. বর্ত্তমানকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তিনি উপনিষদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়া সুবোধচন্দ্র তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কাকাবাবু, আমিও বাবার কাছে যাবার জন্যেই উঠিচি। কিন্তু নগেনদা বলচেন, আমি এখন তাঁর কাছে গেলে তিনি বড়ই ক্লেশ পাবেন; কেন না, তিনি নাকি ঠিক করেচেন যে, আমায় বর্জ্জন ক'রে শান্তিতে সংসার করবেন।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন. এই সময় যখন চারিদিকে গোলযোগ উপস্থিত হয়েচে, তখন তুমি দেখা করলে তাঁর দুর্ব্বল হৃদয় বড়ই চঞ্চল হবে, তিনি হয় ত তোমাকে দেখে কান্নাকাটি করবেন। পুজোবাড়ীর আনন্দ উৎসবের মধ্যে সেটা কি ভাল হবে সুবোধ? তুমি ত' স-হৃদয় লোক, বল ত' সে কাজটা সুখের হবে?

শাস্ত্রী মহাশয় এইবার নগেন্দ্রনাথের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, সে কি কথা, নগেন বাবু? আনন্দময়ীর পূজার দিনে পিতা পুত্রের মিলন হ'লে নিরানন্দ হইবে? আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারলুম না।

নগেন্দ্রনাথ কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, আপনি শাস্ত্রব্যবসায়ী, সামাজিক কথা আপনি কি বুঝবেন! এ-ত, পিতা পুত্রের মিলন হচ্চে না, এ হচ্চে সমাজদ্রোহীর সঙ্গে সমাজপতির সাক্ষাৎ। এ সাক্ষাতে অশান্তি হবে না ত' কি শান্তি হবে?

শাস্ত্রী মহাশয় ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে চাই না। আমি সুবোধকে কেবল এই কথাটিই জানাতে এসেছিলুম যে,

মিত্র মশাই সুবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করচেন।

এই কথা বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলে, আরও কিছুক্ষণ তাঁহাদের তর্ক চলিবার পর, ললিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; সে বালিকা সংসারের কুটিলতারও সংবাদ লয় নাই, অথবা তর্কশাস্ত্র বা ইতিহাস বিজ্ঞানের সহিতও পরিচিত হয় নাই। সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমের অমোঘ অস্ত্র লইয়া সহাস্যমুখে আসিয়া পিতাকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি বাড়ীর ভেতরে আসবে না, খালি খালি মামাবাবুর সঙ্গে কথা কইবে। চল শীগ্‌গির, ঠাকুর্দ্দা তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতে বল্লেন।

শুনিয়াছি উত্তাল তরঙ্গের উপর তৈল সিঞ্চন করিলে বীচিমালার উন্মত্ত বিক্ষোভ মুহূর্ত্তেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। আমাদের এই নগেন্দ্র বনাম—সুবোধচন্দ্রের তর্ক-তরঙ্গে ললিতার ক্ষুদ্র বাক্যের 'স্নেহ' সিঞ্চিত হওয়াতে এস্থলেও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ললিতার কথায় সুবোধচন্দ্র তর্ক-কোলাহল ত্যাগ করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া ও তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, চল, মা, চল, এইবার বাড়ী যাই, বাবাকে প্রণাম করিগে।

কন্যাকে আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া শ্যালককে বলিলেন, নগেন দা, আর তর্কে দরকার কি? বাবা ডাকচেন, তাঁর কাছে যাই। তাঁর মুখেই সব কথা শুনব।

এই কথা বলিয়া আর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সুবোধচন্দ্র পিতার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই বারাণ্ডার পথ দিয়া কাছারী বাড়ীর সীমা অতিক্রম করিয়া বৈঠকখানা বাড়ীর প্রান্তভাগে মিত্র মহাশয়ের সুরম্য ও সুসজ্জিত কক্ষ সমূহের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই কক্ষ সমূহের পশ্চাতেই অন্দরমহলে যাইবার বারাণ্ডা।

কন্যা ক্রোড়ে সুবোধচন্দ্র সত্য সত্যই অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নগেন্দ্র নাথ বলিলেন, সুবোধ আমার কথা না শুনে ভাল করলে না; এর ফল ভীষণ হ'বে। পরিবারের শান্তি চাও ত এখনও ফের, এখনও সাবধান হও।

নগেন্দ্রনাথের এই সাবধান-বাক্যে সুবোধ কেবলমাত্র একটু হাসিলেন কোন উত্তর দিলেন না।

নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া ললিতা তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, মামাবাবু কি বলচেন, বাবা?

সুবোধ কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, উনি আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে বলচেন। বাড়ীর ভেতর গেলে আমায় নাকি বাবা মারবেন।

ললিতা তাহার বালিকা-হৃদয়ে পিতার এই কথার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইল না। কেবল তাহার ইন্দিবর-তুল্য নয়ন বিস্ফারিত করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মারবেন?

সুবোধ বলিলেন, জানি না। মিত্র মহাশয়ের কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সুবোধ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা ললি, মা, বল্‌ত, বাবা যদি আমায় তাড়িয়ে দেন, তুই কি করবি?

ললিতা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুবোধ। বাবা যদি তোকে যেতে না দেন?

ললিতা। 'আমি পালিয়ে যাব।'

সুবোধ হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক'রে পালিয়ে যাবি?

ললিতা বলিল, কেন, গাড়ীতে উঠে কোচোয়ানকে গাড়ী তোমার বাড়ী নিয়ে যেতে বলব।

সুবোধ একটু হাসিলেন, কোন কথা বলিলেন না, পরে পিতার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধুলি মস্তকে লইলেন। বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় পুত্র ক্রোড়ে পৌত্রীকে দেখিয়া গড়গড়ার নল মুখ হইতে নামাইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, কি গো দিদি, একেবারে যে বাবার কোলে উঠে সোহাগী করা হচ্চে। সুবোধ ত তোর বাবা নয়, ও যে আমার বাবা।

ললিতা পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—ইস্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সদাচার না কদাচার

ললিতা বলিল, ইস, এ ত আমার বাবা, আমায় কত পুতুল দেয়, তোমায় কি দেয়?

সুবোধচন্দ্র কন্যাকে লইয়া পিতার নিকট উপবেশন করিয়া দু'চারিটা

অবান্তর কথার পর জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, সত্যিই কি আমি আপনার কাছে এসে বসলেও সমাজের কর্ত্তারা আপনাকে শাসন করবেন ?

মিত্র মহাশয় পুত্রের মুখের উপর কাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কি জানি বাবা, তাঁরা কি করবেন না করবেন ? কিন্তু সে সব কথায় এখন কাজ কি ? আজ পূজোর ষষ্ঠী, বছরের আনন্দের আজ উদ্বোধন। নিরানন্দের কথা আজ থাক্।

সুবোধ বলিলেন, কিন্তু নগেন দাদা বলছিলেন, আজই নাকি এই কথার মীমাংসা হবে। আমি বাড়ীতে এসেচি জানলেই সমাজপতিগণ আজই এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইবেন।

মিত্র মহাশয় কোন কথা বলিলেন না, কেবল গড়গড়ার নল মুখে দিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া, নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে কুণ্ডলায়িত ধূমরাশি মিত্র মহাশয়ের ললাটের লিখন পাঠ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য রাজ্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। দেয়ালের ঘটিকা-যন্ত্র টক্ টক্ করিয়া কালের বিচিত্র গতির কথা জানাইতে লাগিল। ললিতা কিছুক্ষণ সেই স্থানে ক্রীড়া করিয়া পিতামহের পার্শ্বে মখমল শয্যার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইল। সম্মুখের দেয়ালে লম্বিত মিত্র মহাশয় ও তাঁহার পরলোক-গতা সহধর্ম্মিণীর দুইখানি বৃহদাকার তৈলচিত্র মানব-জীবনের নশ্বরতার কথা প্রতি নিমেষে জানাইতেছিল. শয্যার একপার্শ্বে সুবোধ আর অপর পার্শ্বে শাস্ত্রী মহাশয় সোৎসুক নয়নে মিত্র মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব চিন্তার পর মিত্র মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তা এত গোলযোগে কাজ কি ? তুমি সমাজের কাছে দোষ করেচ, তাই স্বীকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব গোল চুকে যাবে।

সুবোধ বলিলেন, আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আমি প্রায়শ্চিত্ত একবার নয়, একশ'বার করতে পারি, কিন্তু সমাজ-শাসকগণের কাছে আমার দোষ স্বীকার কর্ত্তে পারব না ; আমি ত কোন দোষ করেছি ব'লে মনেই করি না।

মিত্র মহাশয় বলিলেন, সমাজের বিধি লঙ্ঘন করাই দোষ ; এই দোষ স্বীকার করতে আর আপত্তি কি ?

সুবোধ বলিলেন, সমাজের এ বিধি অর্থশূন্য এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সমাজের সনাতন নিয়ম এ নয় যে, সমুদ্র-যাত্রা মাত্রেই দূষণীয়। কি বলেন কাকাবাবু, বিধি কি তাই ?

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্র-বিধির কথা ছেড়ে দাও সুবোধ ; আজ কাল শাস্ত্রের চেয়ে লোকাচারই বেশী প্রমাণ্য। তা না হ'লে প্রাচীনকালে এ দেশে যে সমুদ্র-যাত্রার প্রচলন ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে।

মিত্র মহাশয় তখন শাস্ত্রী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তবে কি আপনি সমুদ্র যাত্রা দূষণীয় মনে করেন না ?

শাস্ত্রী মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনার সঙ্গে এ বিষয় বহুবার আলোচনা হয়েচে, আজ আর নূতন কথা কি বলব ? সমুদ্র-লঙ্ঘনের জন্যই বিলাত-যাত্রা দূষণীয় নয়। ম্লেচ্ছাচার অবলম্বন করাতেই বিলাত যাওয়া দোষের, কিন্তু সুবোধ বাবাজির আচার তো ম্লেচ্ছভাবগ্রস্ত হয় নি।

মিত্র মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মশাই, সে সব কথা আজকাল কেই বা তলিয়ে দেখে। অনেকেই বাইরে দেখেই বিচার ক'রে কাটান, মন্ত্রটা ঠিক রাখলেই সব চুপচাপ থাকে। প্রায়শ্চিত্তটা হ'ল, সমাজের একটা হজমিগুলি। এইটে গলাধঃকরণ করলে সকল কদাচরই হজম করা যেতে পারে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, সে কথা সত্য, কিন্তু এই সকল কপটাচরণের দ্বারা সমাজে অসত্যেরই রাজত্ব বাড়চে। কপটতা কপটতারই সৃষ্টি করে ; সরলতাই সরলতার জনক। সমাজকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সত্য ও সরল আচরণের দ্বারাই তা সাধিত হবে, কদাচারী ব্যক্তি সাময়িক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা কিছুতেই সৎ হয় না।

এই ভাবের আলোচনা কতকক্ষণ হইলে সুবোধচন্দ্র অন্দরমহলে পত্নীর সন্ধানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন সমাজপতি সমভিব্যবহারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কলস দুগ্ধ মধ্যে এক বিন্দু গো-মূত্র পতিত হইলে দুগ্ধের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন-রত ব্রাহ্মণদিগের কদলিপত্রে কুকুরে মুখ দিলে নিমন্ত্রণ সভার যেরূপ অবস্থা হয়, পদ্মা-নদীর মধ্যস্থলে নৌকা আসিবার পর আকাশে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইলে আরোহীদিগের মনের যেরূপ অবস্থা হয়, এই সময় এই পিতা পুত্রের শান্তি-সংস্থাপন চেষ্টার মধ্যে, নগেন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গীগণের অকস্মাৎ আগমনে তাহাই হইল। গৃহস্থিত তিনজনই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ মিত্র মহাশয়ের হস্ত হইতে সট্‌কার নল আসনে পতিত হইল; শাস্ত্রী মহাশয়ের গম্ভীর মুখের দৃষ্টি স্থিরতর হইল, সুবোধের চক্ষু ক্রোধে ও ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল, গৃহের আলোকমালাও যেন ম্লান হইয়া আসিল। এই দুর্য্যোগ-আগমনে নিরাপক্ষ থাকিল কেবল ললিতা ও দেয়ালের ঘটিকা। ললিতা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল, আর ঘটিকা যন্ত্রও আপন মনে টক্ টক্ করিতেছিল।

সমাজপতিগণ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে মিত্র মহাশয় শুষ্ক ও বিরসমুখে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আর অপর দুইজন কোন কথা বলিলেন না। এইস্থানে আগন্তুকদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

যাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রথম ব্যক্তির নাম ভবানীচরণ সান্যাল। ইনি গবর্ণমেণ্টের পেন্সন-প্রাপ্ত সদরালা, বর্ত্তমানে গ্রামের সর্ব্ববিধ দলাদলির এক প্রধান নেতা, অপরাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানায় গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকদের তাস, পাশা, ও দাবা খেলার বৈঠক বসিয়া থাকে। এবং সেই সঙ্গে অফুরন্ত পর-চর্চ্চা এবং অবিরাম তাম্রকুট-সেবন হইয়া থাকে। আহার, পান ও আর একটি বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদার মতাবলম্বী। তাঁহার এক বিষম অখ্যাতি ছিল। যুবকদল নাতি সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলে তিনি বুদ্ধিমানের মতো তাহা হাসিয়া উড়াইতেন। তাঁহার আরও একটি গুণের কথা এই ছিল যে,কেহ তাঁহাকে"জজবাবু"বলিয়া না ডাকিলে তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল ৫৮ বৎসর।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কামাখ্যানাথ ঘোষ। ইনি একজন তান্ত্রীক সাধক, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে সিন্দূরবিন্দু, অহরহ কারণ-সেবায় চক্ষুর্দ্বয় সর্ব্বদাই আরক্ত। সাধারণের বিশ্বাস ভৈরবী চক্রে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম প্রায় ষাট্ বৎসর, তিনি বিপত্নীক বলিয়া বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম তুলসীচরণ মিত্র। ইঁহার মুণ্ডিতমস্তকে শিখা দোদুল্যমান, কণ্ঠে শ্রীতুলসীর মালা, নাসাগ্রে লবঙ্গকলি আকারে তিলক, গৃহে তাঁহার এক পত্নী ছিলেন এবং বাহিরে উদ্যানবাটীকায় এক সুন্দরী যুবতী রজক নন্দিনীকে তাঁহার সেবাদাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রজকিনীর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি সম্প্রতি সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া গ্রামে যশ ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কুসীদ ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং ইঁহার বয়ঃক্রম ছিল, ৫৬ বৎসর।

চতুর্থ ব্যক্তির নাম অনন্তরাম দত্ত, বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর। বয়ক্রমে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও গ্রামে ইঁহার একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। যাত্রা, বাইনাচ, হাপ-আখড়াই, জিম্‌নাষ্টিক, তাস, পাশা, দাবা খেলা প্রভৃতি কর্ম্মে তিনি নেতৃ স্থানীয় অর্থ-বলে তিনি সকলকে অধীনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গভর্ণমেণ্টের রসদবিভাগে (Commissariat Departmentএ) কর্ম্ম করিয়া অসদুপায়ে সঞ্চিত বহু অর্থ পুত্রের অপব্যবহারের জন্য রাখিয়া মহাযাত্রা করিয়াছেন। পুত্রও পঞ্চমকার সাধন করিয়া কৃপণ পিতার সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার গর্ভধারিণী এই সকল অপকর্ম্মের প্রতিবাদ করায় পুত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্ব-পাদুকা মাতার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। একবৎসর পরে আত্মীয়গণ মাতার শবদেহ বহন করিয়া পুত্রের বাটীর দ্বারে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিমান পুত্র তাঁহাদিগের মস্তকে কলসপূর্ণ গোময় জল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

সমাজের এই সকল নেতৃবর্গ স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিয়া দুই চারিটী

অবান্তর কথার পর "জজবাবু" সুবোধের সহিত তাহার বিলাত-বাসের আলাপ করিয়া বৃদ্ধ হরকান্ত মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, দাদা, আপনার ছেলে লেখা পড়া শিখলে কি হবে, বড় নির্ব্বোধ। ছোকরা বিলেত গিয়ে জাতই যদি দিলে ত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট একটা কিছু হ'ল না কেন? হ'য়ে এল কি না, স্কুল মাষ্টার, আরে ছ্যাঃ। ছেলে আপনার মুখে চুণ কালি দিলে, দাদা!

মিত্র মহাশয় এই মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হুঁ।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, তা যা হোক্, বাবাজী আমাদের বিদ্যামন্দিরের অ-গৌরব করেন নি। বিদ্যাদেবী ওঁকে বিনয়, চরিত্র, সদাচার ও ধর্ম্ম দিয়েচেন। এই সকলই বিদ্যার শ্রেষ্ঠ দান।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথায় আগন্তুক সকলেই যেন একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন. আপনি ও-কি কথা বলচেন? আপনি শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক হ'য়ে বিলেত ফেরতকে সদাচার-নিষ্ঠ বল্লেন?

তুলসী বাবু বলিলেন, শাস্ত্রী মশায়ের কথাটা—হরি হে মাধব,স্ব-বিরোধী।

জজ বাবু বলিলেন, ঠিক্ ঠিক, তাই বটে। বিলেত ফেরৎ মানেই আচার ভ্রষ্ট হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের আবার সদাচার কি?

অনন্ত বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, শাস্ত্রী মশায়ের মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। তাঁর জন্যে মধ্যমনারায়ণ তেলের ব্যবস্থা করার দরকার হয়েচে দেখচি।

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, না' হে মধ্যমনারায়ণ নয়, মহামায়ার কারণ-বারি সেবা করা চাই। সাধে কি বলি, বেশী লেখাপড়ার চেয়ে, মহামায়ার সাধনা শ্রেষ্ঠ?

আমাদের কামাখ্যা বাবুর বিদ্যা উপার্জ্জন. গ্রাম্য পাঠশালার উপরে উঠে নাই। কোন কর্ম্মোপলক্ষে নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে, অঙ্গুলি সমেত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইত। তিনি কামাখ্যা কথার নূতন বানান করিতেন, তিনি লিখিতেন—

"কামাকৃখা।" সেকালে সেদেশে বাংলা বানাণ সংস্কার-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে ঘোষ মহাশয় নিশ্চয়ই সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সেই সমিতির সভাপতি পদে বৃত হইতেন।

এই সকল নিন্দা গ্লানির কথায় কর্ণপাত না করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, আপনারা যাই বলুন, আমাদের সনাতন শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেই আমি বলচি সুবোধ আমাদের সদাচার সম্পন্ন; আমার হাতে প্রাচীনকালের মতো ক্ষমতা থাকলে আমি সুবোধকে ব্রাহ্মণ ক'রে দিতুম। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়.—(বি-এ)

সাধ

ভেঙ্গে যাক্ লোহার প্রাচীর, স্বর্গ মর্ত্ত্য হোক্ একাকার,
টুটে যাক্ নিয়ম বন্ধন, মন মোর হোক্ নির্ব্বিকার।
ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত প্রাণ মোর, উন্মুক্ত আকাশতলে,—
খুলে ফেলি' সর্ব্ব আভরণ, যাক্ মুক্ত বায়ু পথে চ'লে।
সীমাহীন প্রেম মোর, দিক্ হারা হ'য়ে চ'লে যাক্ ছুটে,
যেখানে যে শ্রান্ত আর্ত্ত আছে, নিক সবে স্নেহরাশি লুটে'।
শুধু তৃপ্তি, শুধু শান্তি, শুধু আনন্দের অমৃত-কল্লোল,
ব'য়ে যাক্ দিগন্ত প্লাবিয়া সুখময় সঙ্গীত হিল্লোল।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, কণ্ঠ ভরি' ঢেলে দিক্ ধারা,
প্রাণ ভরি' গাহি' নিশি দিন ছন্দহীন গীত অর্থ হারা।
সাগর ভূধর মরু সবে এক হ'য়ে টেনে নিক্ মোরে,
বিস্তারি' অনন্ত বাহু, বেড়ি' লক্ষ পাকে লক্ষ লক্ষ ডোরে।
বাজুক্ শ্রবণ ভরি' মোর, অনন্তের সম্মোহন বাঁশী,
উদ্দাম উন্মত্ত স্রোতে পড়ি' অবিশ্রান্ত যাই যেন ভাসি'।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

মনোরমা



২১

মাষ্টার-গৃহিনী বিরজাসুন্দরী বৃহৎ আঙিনায় কয়েকখানি কালো পাথরে আমসত্ব শুকাইতে দিয়া, একটা বড় পাত্রে একরাশি আম ছাঁকিয়া মাড়ি তৈয়ার করিতেছিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় রুগ্নকায় বালক সনৎ ওরফে সোনা, নিকটে বসিয়া তৃপ্তির সহিত কয়েকটা আম চুষিতেছিল, মুখে গায়ে পেটে যথেষ্ট আমের রস লাগিয়া ভোক্তার ভোজনপটুতার পরিচয় দিতেছিল।

বিরজা, মাষ্টারের দ্বিতীয় সংসার, তথাপিও তিনি স্বামীর মনটি যথেষ্টরূপে বাঁধিতে পারেন নাই। গান বাজনা শিখাইবার জন্য হরকুমারকে অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকিতে হয়, বিরজা এজন্য অনেক সময় বকাবকি করেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় না। আজ তিন দিন হইতে হরকুমার বাড়ী আসেন নাই, বিরজা আপন মনে এই বলিয়া বকিতেছিলেন,—পয়সা রোজগারের কপালে আগুণ, কি বিদ্যেই শিখেছিলেন। এমন লোকের হাতেও মানুষ পড়ে। আজ আসুক একবার, নিজের ঘর দোর, স্ত্রী পুত্তুর কিছু মনে থাকে না গা! ছি ছি গলায় দড়িও জোটে না, এমন বেহায়া মানুষ!

সোনা নিবিষ্টচিত্তে আম চুষিতে চুষিতে বলিয়া উঠিল, মা, বাবার কাছে যাব। বিরজার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, ঝঙ্কার করিয়া কহিল, তাই যা, সে তো যমের বাড়ী গেছে, তার কি আর—

"সে যমের বাড়ী গেলে সামনের পূজোয় নূতন প্যাটানের তারের বালা পরাবে কে গো? লাল ফুলের চওড়া পেড়ে রেশমী বালুচরী শাড়ীর অর্ডার দেওয়া হ'য়ে গেছে যে।"

কথা গুলা বড়ই মোলায়েম! বিরজাসুন্দরী ঝগড়া করিবার জন্য যতগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, পোড়া মনের মধ্যে এখন আর কোনটারই খোঁজ পাওয়া গেল না। মুখ ভার করিয়া কহিলেন, ভ্যালা যা হোক্, ছেলে মেয়ে দুটো হেদিয়ে মোলো, একটু খোঁজ খবরও নেই, আমি না হয় পরের মেয়ে, পেটের সন্তান তাদের তো খোঁজ রাখতে হয়?

হরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমার পেটের না, তোমার পেটের? আয় খোকা, বিনী কই?" খোকা বাপকে দেখিয়া কোলে উঠিবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত ধুইতে গিয়াছিল, আসিয়া কোলে উঠিয়া কহিল, বাবা, বিনী ক্ষান্ত দিদির বাড়ী বেড়াতে গেছে।

"মেয়েটাকে ওদের বাড়ী যেতে দাও কেন? দিন দিন বড় হচ্ছে, তোমার কি আক্কেল নেই?

য়্যাত বড় কথা! বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিলে চটে না কে? বিরজা রাগিয়া উঠিয়া কহিল, আমার আক্কেল নেই, না, তোমার? নিজে ছোট বেলা থেকে হ্যাওট করিয়ে দিয়েচ, এখন বাগ মানবে কেন? ক্ষেনিকে গান শেখাতে যেতে ওকেও নিয়ে যেতে—সেই থেকে ক্ষেনিও ওকে না দেখলে বাঁচে না, মেয়েটারও ক্ষান্ত দিদি বলতে তর সয় না, এখন আবার আমায় দুষচেন, মিন্‌ষের মতিচ্ছন্ন আর কি? বলি খেয়েচ না, ভাত টাত খাবে?

"খেয়েচি গো, যে টুকু খিদে ছিল, তোমার মিষ্টি কথাতেই পেট ভোরে গেলো?"

"আর রসিকতা করতে হবে না, সংসারী লোক যে এমন ক'রে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা এই তোমাকেই দেখচি।" বিরজা আম মাড়া শেষ করিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন, হরকুমার কহিলেন, অতো চটো কেন? তিনদিনের পর বাড়ী এলাম, দুটো মিষ্টি কথা কও। পয়সার ফিকিরে থাকতে হয়, বুঝতে পার না। ঝি কোথা গেল, বাড়ী গেছে বুঝি? আচ্ছা, তুমি পান আন, খোকা হুঁকা কল্‌কেটা আনতো বাবা, আর একটা টিকে।

খোকা দৌড়িয়া হুঁকা কলিকা আনিতে গেল, বিরজা এক ডিবা পান লইয়া আসিল। হরকুমার কলিকায় আগুণ ধরাইয়া তামাকুতে টান দিতে দিতে কহিলেন, সন্তোষকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েচি, সে খুব উৎসাহে গান বাজনা শিখচে, দু'শো টাকা মাইনে দিচ্ছে, অমন দাঁও কি ছাড়তে আছে? মেয়েটা বড় হলো, বিয়ে দিতে হবে, বরের যে বাজার, টাকা পয়সার জোগাড় চাই

তো, তোমাদের ভাবনা ভাবি না তো আর ভাবচি কি ? ঝি রয়েচে, হরেন রয়েচে, ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে আছ, জলে তো পড়ো নি। সেকরাকে তোমার চুড়ির বায়না দিয়ে দিয়েচি. কাল একখানা বালুচরে শাড়ীর বায়না দিয়ে এলাম, টাকা ত্রিশ দাম হবে।

এমন সময়ে ক্ষান্তর সঙ্গে বিণী আসিয়া উপস্থিত হইল, বাবাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দুই হাতে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আর আস না কেন ? আমায় আর ভালবাস না বাবা। হরকুমার কহিলেন, এই রে পাগলী শুদ্ধ পাগলীর মায়ের মতন ঝগড়া সুরু করেচে, তোদেরই জন্যে আসতে পারিনি, পাঁচ ফিকিরে ঘুরি। কি ক্ষান্ত, খবর কি ? ভাল আছিস তো ?

ক্ষান্ত বসিয়া কহিল হ্যাঁ, বাবু, ভাল আছি। মেয়েটা বড় আপনাকে খোঁজ করে। রোজ ঘরে এলেই হয়, ছেলে পিলে অস্থির হয়, পাঁচবার জিজ্ঞেস পড়া করে—এই আর কি ?

বিণী বাম হাতের মুঠাটি বন্ধ করিয়া সোনাকে কহিল. খোকা বল্ দেখি. এতে কি আছে ? সোনা কহিল, কিছু না, ফোকা !

বিণী কহিল, আচ্ছা বাবা বলো দেখি, টোকা না ফোকা ? হরকুমার তামাকুতে টান দিয়া, হা করিয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, ফোকা, ফোকা নয় রে খোকা ?

খোকা হাত তালি দিয়া কহিল, কেমন ? বাবা আমার দলে। বিণী তৎক্ষণাৎ সকলের সমক্ষে মুঠাটি মেলিয়া দিল, ঝকঝকে দুটি ছোট সোনার মাকড়ী। খোকা ছোঁ মারিয়া একটি তুলিয়া লইল, বিণী চীৎকার করিয়া উঠিল। বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা পেলি লো ! ক্ষেনির কীর্ত্তি আর কি ? ও-সব ওর হাতে কেন দেওয়া, ওর তো সে দিন কাণ বিঁধিয়েচে, এখনও শুকোয় নি।

ক্ষেনি কহিল, শুকিয়ে যাবে—আমি একটা ওষুধ লাগিয়ে দিয়েচি, মাকড়ী বাক্সয় এখন তুলে রাখো, আমি ওর নাম ক'রে কিনেছি। খোকা তোকে একটা জিনিষ দেবো,ওর মাকড়ী দিয়ে দে। অনেক সাধ্য সাধনায় খোকা বিণীর মাকড়ী ফেরৎ দিল, বিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে ক্ষান্ত, কি হলো রে, সে ছেলেটার কি গতি হলো, সরকারে নিয়ে গেল, না কি করলে ?

হরকুমার কহিলেন, ওঃ সেই পশ্চিমাদের ছেলে-? যার মা গঙ্গা নাইতে এসে ম'রে পড়েছিল ? একটা হুজুগ আজ সকালে শুনছিলুম বটে।

ক্ষান্ত কহিল, আহা বাবু, সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি। কি জাত, কোথাকার লোক,কিছু বোঝা গেল না, দোকানদাররা বল্লে রাতে দু'পয়সার কচুরী কিনেছিল,সকালবেলা সবাই দেখে যে, অশ্বত্থ গাছের তলায় মেয়েমানুষটি শুয়ে আছে,খাস ধরেচে,মুখে চোখে মাছি ভ্যান ভ্যান করচে,কোলের

ছেলেটা এক বছরের হবে আর কি, ব'সে ব'সে মা মা ক'রে—কাঁদচে, মাকে ঠেলা দিচ্ছে,একবার ক'রে মাই চুষচে দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে, গেল,মেয়েমানুষটো তখুনি স্থির হয়ে গেল—মরে গেল আর কি ? ছোট ছেলে সে তো বুঝছে না, সেই মরা মারই মাই খাচ্ছে আর কাঁদচে, আর এত মাছি, সেই মরার গায় তখন বসেচে, ছেলেটাকে শুদ্ধু ছেঁকে ফেলেচে। কত লোক ছেলেটাকে খাবার দেখিয়ে হাত ইসারা ক'রে ডাকতে লাগলো, যদি মরাটাকে ছেড়ে একটু সরে' এসে বসে। তা সে পোড়া ছেলে মাকে ছেড়ে একটুকুও নড়লো না। কত লোক খাবার কিনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছেলেটার গায়ে ফেলতে লাগলো। ছেলেটা তাই একবার একটু খায়, একবার মরার মাই চোষে, আবার মাকে ঠেলা দেয়, দেখে চোখ দিয়ে জল আসছিল।

বিরজা কহিলেন, আহা, মায়ের বাছা, মা এমনি জিনিষ রে! কোন রোগ টোগ হ'য়ে কাহিল হয়েছিল, বোধহয়, গঙ্গা নাইতে এসেছিল, এইখানে তার মাটী কেনা ছিল আর কি।

কান্ত কহিল, রোগ হয়েছিল বই কি? চেহারা যেন কাঠ হয়েছিল, দেহে মাংস ছিল না, সে যদি বাছা একবার চোখে দেখতে—ছেলেটাকে কেউ ছোঁয় না, কি জাত—ডোম কি ম্যাথর, কাপড় গোপড় মাগীর যে ময়লা', আর দুর্গন্ধ, কাযেই কে ছোঁবে বল ?

বিরজা কহিলেন, তা তো বটেই, তারপর কি হলো ?

কান্ত কহিল, তারপর মা অবাক্ কাণ্ড, ঐ হীরালাল বাবুর পিসী গঙ্গা নাইতে এসে সব দাঁড়িয়ে দেখলে। দেখে দেখে নিজের ঝিকে বল্লে ছেলেটা মরার মাই চুষচে, ওকে তুই সরিয়ে নিয়ে আয়, নাইয়ে আমাদের বাড়ী নিয়ে চল, কোম্পানীকে খবর দিলে এখুনি নিয়ে যাবে। ঝি তো রেগে অস্থির। বলে পরের বোঝা বইতে গেলাম কেন ? কিসের মরা তাই আমি ছুঁয়ে মরি আর কি ? ম্যাতো আমার দায় নেই বাপু। তখন হীরালাল বাবুর পিসী নিজে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে ক'রে হুসহুস ক'রে গঙ্গায় চুবিয়ে কোলে নিয়ে সটান বাড়ী চ'লে গেল,অত বড় লোকের বাড়ীর মেয়ের এই কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হ'য়ে রইল। তারপর শুনলুম, সরকারের লোক এসে মরাও পোড়াতে নিয়ে গেছে, ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে।

হরকুমার কহিল তা বেশ করেচে, ওদের দয়ার শরীর, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি, আর হা হুতাশ করছিলি, তিনি কাযের মতন কায করলেন।

বিরজার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল, বিণী স্তব্ধ ভাবে মায়ের কোলে বসিয়া হাঁ করিয়া করুণ-কাহিনীটি শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, মা মরে গেল ? তাই কি হয় ? কান্ত দিদি এ কি রকম বিশ্রী গল্প বলচে।

আহার করিতে করিতে সহসা মুখ তুলিয়া সন্তোষ মাতাকে কহিল, মা, দিদিকে

লেখো, আমার আরও দু'শো টাকা চাই. আমি মাষ্টারের কাছে গান বাজনা ভাল ক'রে শিখচি—

অন্নপূর্ণা তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন. আমার লেখায় কিছু হবে না। আর বিদেশে ভাল লাগচে না, চল্ বাবা, বাড়ী ফিরে যাই. সেখানে কত মাষ্টার পাবি, কলকাতায় গান বাজনা শেখবার দুঃখু কি ?

সন্তোষ রাগিয়া কহিল. তোমার না ভাল লাগে মা, তুমি যাও, আমি দিন কতক এখানে থাকতে চাই। ওরা কোথাকার কে এসে জুড়ে বসেচে, ভাল চায় তো বিষয় ছেড়ে দিক্, নয় তো একটা অনর্থ বাধিয়ে তুলবো। বলা বাহুল্য, সন্তোষ দিদিকে একটু ভয় করিয়াই চলিত, কিন্তু এখানে সে অনেক পরামর্শ দাতা, অভয় প্রদানকারী বন্ধু-বান্ধব পাইয়াছে।

অন্নপূর্ণা রাগিয়া কহিলেন, তবে তোর যা ইচ্ছে কর, বৌ-মাকে নিয়ে কালই আমি চলে যাচ্ছি, ভাল তো আর এ জন্মে হলি নে, ভাল কথা কাণে তুলবি নে, পরের মেয়েটাকে শুদ্ধ মেরে ফেলতে বসেছিস। বেয়ায়ের কি কম মনের দুঃখু! ভদ্র লোক সে দিন এলো, জলস্পর্শও করলে না. শুধু মুখে ফিরে গেলো। কি ঘেন্না, কি লজ্জার কথা গা! এত পাপ করেছিলাম আমি!

সন্তোষ কহিল, বড় বয়েই গেল, তাঁকে আসতেই বা সেধেছিল কে ? তাঁর মেয়ে এখন আমার স্ত্রী, তাঁর জোর না আমার জোর ? তুমি যেতে চাও চলে যাও, কিন্তু খবরদার, আমার পরিবারকে নিয়ে যেয়ো না. সে আমার কাছে থাকুক।

অন্নপূর্ণা বেগতিক দেখিয়া কহিলেন, বৌ-মার শরীর খারাপ হয়েচে দেখচিস না ? কি সোনার প্রিতিমে, কি হ'য়ে গেছে. বাপের বাড়ী দিন কতক গিয়ে থাকুক, তারা চিকিৎসাপত্তর করুক।

"কেন ? আমার পয়সা নেই, আমি চিকিৎসা করাতে জানিনে ? বাঁচে বাঁচবে, মরে মরবে, আমার কাছে থাকবে, সে আমি বুঝবো।"

ইতিমধ্যে কমলা আসিয়া দাড়াইল, সন্তোষকে দেখিয়া মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া মনোরমার গৃহে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সন্তোষ ডাকিল, সই যে! কি ভাগ্যি! সূর্য্য কি পশ্চিমে উঠেচে ?

ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কমলা কহিল, কেন, আমি তো প্রায় আসি! সই বড় লোকের গিন্নি, একদিনও গরীবের কুটীরে পায়ের ধূলো দিতে যান না।

সন্তোষ কহিল; যাবে না কেন! তুমি নিয়ে গেলেই যেতে পারে ? আমার হুকুম চাই ? হুকুম আমি দিলাম। মা, তুমি কলকাতায় যেতে চাও যাও, বৌ এখানে বেশ থাকবে, এই পাশেই সইরা রয়েচেন, আমার বন্ধুরাও এক একদিন নিয়ে যেতে চান, তাহাদের স্ত্রীরাও মাঝে মাঝে আসবেন, কোনও ভাবনা নেই।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, কি-যে বলিস্ তার ঠিক নেই, ছেলে মানুষ বৌ, আমি

একলা যাই কোন্ সাহসে ! কার ভরসায় আমি বিদেশ বিভুঁয়ে সোমত্ত মেয়ে রেখে যাবো ?

চক্ষু কপালে তুলিয়া সন্তোষ কহিল, কার ভরসায় ? শুন্‌চ সই ? আমি স্বামী রইলাম, অথচ মা স্বচ্ছন্দে বলচেন, কার ভরসায় রেখে যাই ? স্বামীর চাইতে স্ত্রীলোকের আবার রক্ষক কে আছে ? মা তুমি সেকেলে লোক, কিছু বোঝ সোঝ না, নইলে এমন কথা বলতে না ? বলো তো সই স্ত্রীলোকের স্বামীর চাইতে বড় আর কে ? পতিই সতীর দেবতা !

কমলা হাসিয়া কহিল, আর দেবতা যদি অপদেবতা হয় ?

হা-হা করিয়া হাসিয়া সন্তোষ কহিল, বাঃ সই, বেশ বলেচ ! অপদেবতা হ'লে ঘাড় মটকাবার ভয়ই বেশী, নয় কি ?

অন্নপূর্ণা কহিলেন, তুই যদি মানুষ হ'তিস, সে আলাদা কথা, কত দিন তো বাড়ীই থাকিস না ।

"মানুষ নই তো ভুত না কি ? কি-যে বলচ মা, আমার স্ত্রী তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, তোমার জোর না আমার জোর ?"

কমলা সে-স্থান পরিত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া মনোরমার গৃহে আসিল। মনোরমার হাতে একখানি চিঠি, দুটি চক্ষে অশ্রু টল টল করিতেছে, উদাস-নয়নে খাটের উপর বসিয়া আছে। কমলাকে দেখিয়া মনোরমার মলিন অধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল ? এসো সই-দিদি, আজ ক'দিন আসো নি ।

তুমি তো ডাকতেও পাঠাও নি", বলিয়া কমলা আসিয়া মনোরমার পাশে বসিল। কৌতূহলী নেত্রে গৃহের চারিদিকে দেখিতে লাগিল, বাংলাখানির ভাড়া মাসিক ১০০৲ টাকা, গৃহের মেঝে শ্বেতপাথরে বাঁধানো। ঘর গুলি ঝাড় লণ্ঠন ও বড় বড় তৈল চিত্রে সুশোভিত। মূল্যবান্ টেবিল চেয়ার সোফায় ঘর সুসজ্জিত, কাচের আলমারীর মধ্যে সুন্দর সুন্দর পুতুল ইত্যাদি সাজানো রহিয়াছে। মনোরমার টেবিলের উপর দুই পাশে দুইটি শুভ্র প্রস্তর নির্ম্মিত পরীর হাতে শামাদান শোভা পাইতেছে। কমলা প্রায়ই আসে, কিন্তু আজ সে যেন মনোনিবেশ সহকারে সকল খুঁটিনাটি জিনিষও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। ঘরের আলনায় মনোরমার মূল্যবান শাড়ীগুলি ঝুলিতেছে, জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া কাপড়ের চওড়া জরীর পাড়গুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

অন্নপূর্ণা ইদানীং বধূর পরিচ্ছদ পারিপাট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। নিজে মনোরমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া কয়খানি রেশমী শাড়ী বৈকালে পরিবার জন্ম বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া কমলা একবার মনোরমার দিকে চাহিল, এত রূপ! অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। স্বাস্থ্য ভগ্ন প্রায়, তবু সর্ব্বাঙ্গে কি অপরূপ লাবণ্য টল টল করিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি কি উজ্জ্বল, কি কোমল। কিন্তু হায়, সন্তোষ এমন রত্ন কেমন করিয়া পায় ঠেলিয়া

দিল। সে সই, সেও তো এমনি সুন্দরী ছিল, সন্তোষের মন সেও তো বাঁধিতে পারে নাই। কমলার মনে হইল, ত্রুটি কাহার? যে বাঁধিতে পারিল না, তাহার? না, যে বাঁধা পড়িল না তাহার?

মনোরমা কহিল, অমন কোরে কি দেখচো সই, মুখে কথা নেই কেন?

কমলা কহিল, দেখচি তোমার রূপ, ভগবান কি নির্জ্জনে বোসে এরূপ গড়েছিলেন? গড়েছিলেন তো পৃথিবীতে পাঠালেন কেন? পৃথিবীর লোক এ রূপ নিয়ে কি করবে? ঈষৎ হাসিয়া মনোরমা চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, যাও, ঠাট্টা কোরচ কেন?

কমলা কহিল, ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলচি, তুমি অমন কোরে চেয়ো না বোন, আমি যদি পুরুষ হোতাম, এতক্ষণ মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

মনোরমা কহিল, মাথা ঘুরে পড়ার দরকার নেই, তাতে বুদ্ধি বিকৃত হোয়ে যায়। সই-দিদি, বলো দেখি, মানুষ রূপে মুগ্ধ হ'য়ে যে ভালবাসে তাই ঠিক, না গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ভালবাসে তাই ঠিক?

কমলা কহিল, ভালবাসা রূপ দেখেও জন্মায়, আবার গুণ দেখেও জন্মায়, কিন্তু রূপের নেশা,যে-টাকে আমরা ভালবাসা বোলে ধ'রে নিই,সেটা ভালবাসা নয়; দু'দিনের মোহ মাত্র, তা থাকে না। কিন্তু অনেক সময়, রূপেই মুগ্ধ হ'য়ে মানুষ ভালবাসে, সেই ভালবাসা আবার অভ্যাসগত প্রকৃতিগত হ'য়ে স্থায়ী ভাবে দাঁড়ায়।

মনোরমা কহিল, জগতে রূপ না থাকতো তো ভালই হোতে। আমার মনে হয় রূপের মোহে মানুষের মন যতটা বিকৃত হয়, অমন আর কিছুতে হয় না, আর সেই বিকৃতির পরিণাম বড় শোচনীয়, নয় কি দিদি?

কমলা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, না বোন তা নয়। যদি দু'দশটা কুফল দেখে তুমি তাই বিচার করো,সেটা তো ঠিক নয়। ভগবানের সৃষ্টির চঃম সার্থকতাই হোচ্ছে সৌন্দর্য্য, তা সে যে বিষয়েই হোক্ না কেন। নর নারীর রূপ, যা দেখে লোক দেবদেবীর সৌন্দর্য্য কল্পনা করেচে, সে কি কখনো খারাপ জিনিষ হ'তে পারে? চক্ষুর সার্থকতা, রূপ দর্শনে, চক্ষু যদি রূপ দেখে পবিত্রতর রূপের ধ্যান না করতে শেখে, সে চক্ষু থাকার চাইতে না থাকাই ভাল।

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল, তাহার কিন্তু মনে হইতে লাগিল, তাহার যদি এতো রূপ না হইত, তাহা হইলে সন্তোষ দর্শন মাত্র মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রয়াস পাইত না। কমলাকে কিন্তু সে আর কিছু বলিল না।

কমলা কহিল, কার চিটি এসেচে? সইমার লেখা না? 'হ্যাঁ' বলিয়া চিঠিখানি মনোরমা কমলার হাতে দিল, অনেক দুঃখ করিয়া তিনি কন্যাকে চিঠি লিখিয়াছেন, কমলা চিঠিখানি পড়িতে লাগিল, এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—

"পরের জন্তই মেয়ে পেটে ধরে জানি, মেয়ে বিয়ে দিলেই পর হ'য়ে যায় পরের ঘরে মনের সুখে থাকলেই বাপ মার মনে সুখ হয়, কিন্তু মেয়ে যে মাকে এমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে, তা আমি জানতুম না। তোমার মনে যদি কোথাও আঘাত লেগে থাকে, তা কি মায়ের কাছে লুকোতে হয়? নিজের দিকটাই শুধু দেখতে শিখলে মা, আর এত দিন যে পেটে ধ'রে, এত কষ্ট ক'রে মানুষ করলুম, আমাদের সে দিকটা একবার ভাবলে না? আমার আর সন্তান নেই, যাদের মুখ চেয়ে জুড়ুবো, আমি তোমার জন্য হা প্রত্যাশ ক'রে বসে আছি, তবু তুমি এলে না। ধন্তি পাষাণী মেয়ে!"

কি প্রাণস্পর্শী স্নেহের অনুযোগ! কমলার নিজের মাকে মনে পড়িল, বঙ্গের জননী! কি অমৃত দিয়ে ভগবান্ তাঁদের প্রাণ গড়েচেন। কন্যার নিগূঢ় বেদনা নিজের প্রাণের হা-হাকার দিয়া কৌশলে ঢাকিতে চাহিয়াছেন।

কমলার চক্ষে অশ্রু আসিল। কহিল, সইমা তোমার জন্য কাতর হয়েছেন. দিনকতক মার কাছে গিয়ে থাক গে, আহা, মার প্রাণ, তায় একটি মেয়ে।

মনোরমা কমলার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া কহিল, তাই যাবো মনে করচি। মা শীগ্‌গির যাবেন, মার সঙ্গে যাবো।

এমন সময়ে সন্তোষ আসিল, মনোরমার হাতে চিঠি দেখিয়া কহিল, কার চিঠি? হ্যাঁ, ভালকথা মনে পড়লো, বিনয় আমায় চিঠি লিখেচে, পিসিমাও শীগ্‌গির লিখবেন লিখেচেন, তা দেখ, বিনয়কে তুমি যেন কোন দিন চিঠিপত্র লিখো না, আগে হ'তে সাবধান ক'রে দেওয়া ভাল, মেয়েমানুষকে অত স্বাধীনতা দেওয়া ভাল নয়, তাতেই বলচি।

লজ্জায় ঘৃণায় মনোরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, ছি ছি এ-কি অপমান! কমলাও থত-মত হইল, নারীর সম্মুখে নারীর অপমান!

সন্তোষ কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রিয়া বাক্স খুলিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইল, যাইবার সময় কমলাকে কহিল, সই, হীরালাল বাবুর স্ত্রী কাল কি পরশু আমাদের বাড়ী আসবে, বাঙালীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়, সে এলে তোমায় ডাকতে পাঠবো, এসো।

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল, কমলা দেখিল, মনোরমার মুখ যেন হঠাৎ সাদা হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় মানসিক উত্তেজনায়! কমলা মনে মনে ভগবানকে কহিল, ধন্যবাদ তোমায় ঠাকুর! আমায় দেবতার ন্যায় স্বামী দিয়েচ, পুত্র কন্যা দিয়েচ, আর কিছু চাই না প্রভু, যেন এই সৌভাগ্যই আমার বজায় রেখে মরতে পারি। সেই একই সময়ে মনোরমার অন্তঃকরণ হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, দয়াময়, কোন্ দোষে আমার প্রতি এ কঠোর বিধান করেচো. ব'লে দাও? দেবতা! কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমার সোনার সংসারে আমায় পাঠিয়েছিলে? শুধু যন্ত্রণা, উৎপীড়ন! আর যে সইতে পারছি না প্রভু!

(ক্রমশ)

শ্রীসুরসীবালা বসু।

দাসের আত্ম-কথা

পশ্চিম গমনের সূচনা।—দোকানের কার্য্য বন্ধ এবং সরল কুমারের জন্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতি মনোযোগ দিতে হইল। তাহার অশক্ত জননী তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যদানে অক্ষম, সুতরাং আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইল। সময়ে সময়ে বিনয়ও সাহায্য করিত। ছয় মাস পর্য্যন্ত বিশেষভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার পর আমার পশ্চিমপ্রদেশে গমনের সূচনা হইল।

আমাদের দোকানে চুণী বাবুর জনৈক আত্মীয়—বাবু বঙ্কুবিহারী বসু কিছু অর্থ সাহায্য (ধার) দিয়াছিলেন। অবশ্য তাহা দোকান বন্ধের পূর্ব্বে পরিশোধ করা হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল বাবু যদুনাথ মিত্র ছাপরায় ওকালতি করিতেন। ব্যবসায়ের দিকে বঙ্কু বাবুর একটু টান ছিল. বোধহয় সেই জন্য তিনি ছাপরা হইতে কিছু কিছু ঘৃত আনাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতেন। কিন্তু সে-কাজের পরিমাণ-প্রসার সামান্য মাত্র। আমরাও বঙ্কু বাবুর ঘৃত ২।৪ টিন লইয়া দোকানে বিক্রয় করিয়াছিলাম।

এই সময় আমার পূর্ব্বের চিনির আড়তের একজন কর্ম্মচারী—যোগীন্দ্রনাথ দে আমার সহিত দেখা করিতে আমাদের বর্ত্তমান দোকানে আসে। তাহার কোন মোকর্দ্দমার পরামর্শ লইবার সূত্রে বঙ্কু বাবুর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তৎপরে তাহারই উৎসাহ এবং পরামর্শে তিনি কানপুরের নিকট কোঁচ নামক মোকামে ঘৃত খরিদের জন্য তাহাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। যোগীন্দ্র কয়েক মাস মোকামের কার্য্য করিয়া তাহারই কোন প্রয়োজন বশত তথায় কায বন্ধ রাখিয়া এখানে চলিয়া আসে। ইত্যাদি কারণে বঙ্কু বাবু তাহার কাজে তেমন সুবিধা মনে করিলেন না। অথচ কাজটি তুলিয়া দিতে গেলে কিছু লোকসান হইবার সম্ভাবনা; অন্যথা উপযুক্তভাবে কাযটি চালাইতে পারিলে, না চলিবার মতো অবস্থা ছিল না।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া শেষ এই কার্য্য ভার লইবার জন্য বঙ্কু বাবু আমাকে অনুরোধ করেন। তখন আমারও সম্পূর্ণরূপে অর্থাভাব। কিন্তু বেতন-ভুক্ত কর্ম্মচারীর ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে, ইহা মনে করিলে বরাবরই আমার মনে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইত। যাহা হউক, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমার ইতস্ততঃ দেখিয়া বঙ্কু বাবু যেন সুবিধাই মনে করিলেন। তিনি মাসিক বেতন দিবার দায়ীত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া, অথচ তাঁহারই নামে কাযটি যেমন চলিতেছে তেমনই চলে, বরং যদি কিছু লাভ হয়. তাহার অর্দ্ধেক অংশ তিনি পাইবেন, অর্থাৎ আমার মাসিক সংসার খরচের জন্য বঙ্কু বাবু এখানে আমার বাসায় নগত টাকা দিবার দায়ী থাকিবেন না; আমি মোকামে যেমন কায চালাইতে

পারিব, মোকাম খরচার ভিতর হইতে সেই পরিমাণ টাকা এখানে পাঠাইতে পারিব—এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

দোকান বন্ধ হইবার পর খরিদ্দারগণের নিকট যে টাকা পাওনা ছিল, তাহা ক্রমশ আদায় হইয়া সংসার খরচ চলিতে লাগিল। শেষে দোকানের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হইল। কিন্তু বড় বাজারের ও অন্যান্য মহাজনের যে দেনা ছিল,তাহা দিবার কোন উপায় রহিল না। আমারই নামে দোকানের দেনা পাওনা চলিত, সুতরাং দেনার দায়ী আমিই হইলাম। কিন্তু ইহার মধ্যেও ভগবানের একটি বিশেষ করুণার প্রকাশ দেখা গেল।

আমার পূর্ব্ব-কৃত রামকৃষ্ণ রক্ষিত কোম্পানী-ফারম ব্যতীত আর যে কয়টি দেনা অবশিষ্ট রহিল, তাহার পরিমাণ প্রত্যেকের সামান্য এবং পাওনা-দারগণ প্রায় সকলেই আত্মীয়। রামকৃষ্ণ রক্ষিত-কোম্পানীর দেনা ৩০০৲ টাকার কিছু অধিক ছিল। কিন্তু শেষ জানা গেল, আমার অংশ নিষ্পত্তির পর, 'নাজাই লহনা' আদায় হিসাবে আমার কিছু প্রাপ্য আছে, তাহার পরিমাণ কত তাহা হিসাব-পত্র দেখিয়া স্থির করিতে ফারমের স্বত্বাধিকারীগণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া আমার এই দেনার দাবী পরিত্যাগ করিলেন। এই মীমাংসা যথেষ্ট জ্ঞান না করিয়া,ততোধিক পাওনার দাবী করিতে আমার আর ইচ্ছা হইল না। দ্বিতীয়,—ঐ নাজাই অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা পরে আদায়ের মধ্যে আমার অংশ পাইতে আইনতঃ আমার দাবী ছিল না, কেন না নিষ্পত্তি কালে আমি ফারখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তবু যে ধর্ম্মতঃ তাঁহারা এই মীমাংসা করিয়া লইলেন, এজন্য আমি বিধাতৃ শক্তির উপর ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অবশ্য এই সম্পূর্ণ মীমাংসা এই ঘটনার আরো কিছু পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল। অতঃপর অন্যান্য যে অল্প অল্প দেনার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে যাঁহারা আমার নিতান্ত আত্মীয় ছিলেন, যথা—বাবু জয়গোপাল পাল, বাবু রামতারণ রক্ষিত তথা সত্যপ্রিয় কোঁচ এবং কার্ত্তিকচন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতি ইঁহারা আমার অবস্থা বুঝিয়া এবং পাওনার পরিমাণ ক্ষুদ্র জানিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার ক্রটী ক্ষমা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের সকলেরই কারবার পরে বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই পরলোকে।

অবশিষ্ট কুমারটুলির এক চাউলের মহাজন এবং পাথুরিয়াঘাটার এক ময়দার দোকানদারেরও কিছু পাওনা ছিল. তাঁহারাও এই মনে করিয়াছিলেন, যে ব্যবসায় কর্ম্মে এইরূপ কখন কখন তো ঘটেই, বিশেষত ঐ পাওনার পরিমাণ অল্প বশতই শীঘ্র তাঁহারা দাবীতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসের শেষভাগে ঘৃত খরিদের কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করি। প্রথমে আমি একাই যাইব কথা হয়, কিন্তু আমার যাত্রার অব্যবহিত সময়ে বন্ধু বাবু বলিলেন, চলুন আমিও একটু বেড়াইয়া আসি। তাহাতে আমার খুব সুবিধা এবং আনন্দ বোধ হইল।

আমরা উভয়ে যাত্রা করিলাম। প্রথমে সদাসর কোঁচ মোকামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আমার বাসার তত্তাবধানের ভার চুণী বাবুর উপর রহিল, বিনয় তখন থার্ড কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে।

বিবিধ

—০—

স্বাস্থ্যোপায়—আহারান্তেই কুলি করিয়া ঐ জল না ফেলিয়া গিলিয়া ফেলিবে, কেননা তাহাতে অতিরিক্ত লালা ক্ষয় হয়, কাজেই উহা ফেলিলে পরিপাক কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। পাককরা জিনিষ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই আহার করা উচিত, শীতল হইলে উহাতে কীট জন্মে। মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে আহার্য্য জিনিষ পাক করিলে স্বাস্থ্যকর হয়। শূন্য উদরে এসিড (অম্ল) বেশী থাকে, তখন কাঁচা ফল খাইলে উহা আচারের ন্যায় শক্ত হয়। মধ্যে মধ্যে উপবাস—পুর্ণিমা অমাবস্যার নিশিপালন উপকারী। পিত্ত প্রধান ধাতে এবং সুস্থ দেহে উপবাস বিশেষ অনিষ্টকারক।

ঘৃতের একটি নাম পরমায়ু। ইহার ন্যায় উপকারী খাদ্য জগতে আর নাই, এবং ইহাই একমাত্র পবিত্র খাদ্য কিন্তু হজম না হইলে অমৃত হইয়াও বিষবৎ কার্য্য করে। কাচা ঘৃত খাওয়া অনুচিত. ঘৃত গরম করিয়া খাইবে, গরম দুগ্ধে গরম ঘৃত দিয়া আহার করিলে তাহার ফল অশেষ। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি ঘৃত বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

পানটি পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে পরে বোটার নিকটের শিরাগুলি সন্ধিস্থান সহিত মধ্যস্থানের বড় শিরাটী ফেলিয়া দিবে, পরে পানের ভিতর দিকে চুণ জড়াইয়া দুই খণ্ড পানই হাতে লইয়া একটী দ্বারা অপরটা মর্দ্দণ করিয়া রাখিবে; সুপারি ভিজাইয়া, তাহার বিষাক্ত কস ফেলিয়া দিবে, চুণ ছাকিয়া লইবে, কখনও উহা অনাবৃত রাখিবে না। (পাথর চুণ বিষবৎ ত্যাগ করিবে, শম্বুক ও ঝিনুকের চুণ ব্যবহার্য্য) কাল খয়ের (সাদা খণ্ডাকৃতি খয়ের বিষবৎ ত্যজ্য) পান সুপারি চুণ একত্র করিয়া মুখে দিয়া চিবাইবে। প্রথম যে রস বাহির হইবে, তাহা বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে তৎপর যে রস বাহির হইবে, তাহাই পরম উপকারী। পরে ছিবড়া ফেলিয়া মুখ ধৌত করিবে। (বঙ্গরত্ন)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—o—

গত ১৪ই শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা-অঞ্চলে অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছিল, এই বৃষ্টিতে ধান্যের পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই বরং উপকারই হইবে। মোটের উপর এবার ফসলের অবস্থা মন্দ নয় এইরূপ সকলের আশা।

এবার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশী হইবে বলিয়াই সকলে অনুমান করিতেছেন; জ্বর এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি স্থানীয় লোকের মধ্যে আমাদের সেই পুরাতন প্রস্তাবটির আলোচনা হইতে শুনিয়া সুখী হইলাম। আমরা ইতিপূর্ব্বে "কুশদহে" লিখিয়াছিলাম যে, পুরাতন আম কাঁঠালের বাগান গুলির সংস্কার করিলে অর্থাৎ পুরাতন গাছ সমূলে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন উত্তম উত্তম গাছ বসাইলে স্বাস্থ্যের পক্ষে তো অনেক উপকার হইতেই পারে, তদ্ভিন্ন লাভ যথেষ্ট আছে। তবে প্রথমে মায়াত্যাগ, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। একমাত্র গৈপুরের পতিরাম বাবু ছাড়া একাজে আর আমরা কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। যাহা হউক এ বিষয় এখন কেহ কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা আর একটি কথা শুনিলাম যে, যমুনা নদীর কূলে যে সকল বড় বড় আগাছা ও জঙ্গল আছে তাহা কাটাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ঐ সকল স্থান জমিদার বাবুদিগের আয়ত্ত, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিলাম যে, ঐ জঙ্গল কাটিয়া লইবার যদি কেহ ভার গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে নাকি তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমাদের মনে হয়, এই সকল কাজ করিবার জন্য যদি একটি 'সমিতির' আকারে সকলে একযোগে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির অথবা আসন্ন মৃত্যুর প্রতিকারের কিছুও চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কাজ হয়। ইচ্ছা করিলে "বঙ্গীয় হিতসাধন সমিতির" পরামর্শ সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইতে পারা যায়। কিন্তু এই সকল প্রশ্ন মনে উদয় হইলেই অগ্রে সকলের মনে অর্থের চিন্তা উপস্থিত হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার অন্ধকারে সকল সৎকাজের সঙ্কল্প ডুবিয়া যায়। কিন্তু জগতের ইতিহাসে মানবচরিত্রে ইহাই দেখা যায়, যে সকল সৎকাজের মূলে আগে আসিয়াছে সদিচ্ছা, বিশ্বাস, স্বার্থত্যাগ, উদ্যম, তারপর অর্থাদি সমস্তই অনুকূল হইয়াছে। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বিষয়, পরীক্ষার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই জয় লাভ করিয়াছে। আমাদের প্রিয় কুশদহ-ভূমিতে-

উদ্যমশীল, বিশ্বাসী, স্বার্থত্যাগী যুবাদলের আবির্ভাব কবে দেখিব। যাঁহারা দেশের কাজে অগ্রসর হইবেন।

আমরা গতবার পানীয় জল সিদ্ধ এবং পরিস্কার করিয়া ব্যবহারের কথা আলোচনা করিয়াছিলাম। দেখিয়া শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ইতিমধ্যে কেহ কেহ ঐ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, যদি সকলেই এই দিকে মনোযোগ দেন তাহা হইলে বোধহয় স্বাস্থ্যের পক্ষে একটা কিছু কাজের মতো অনুভূতি হইতে পারে।

গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটী স্থির করিয়াছেন, গৈপুর বসু মহাশয়দের বাটীর নিকট একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী (রিজার্ভ ট্যাঙ্ক) হইবে, কিন্তু এবার তাহার কায আরম্ভ হইল না কেন, এই প্রশ্ন গ্রাম বাসিগণের মনে উঠিয়াছে।

আমাদের প্রিয় কুশদহস্থ গোবরডাঙ্গার প্রবীন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এল, এম, এস) মহাশয় ছয়মাসাধিককাল বাতরোগাক্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে রোগের আর অন্য কোন উপসর্গ নাই কেবল চলৎশক্তি রহিত হইয়া তিনি দ্বিতল গৃহে নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি জীবনে অনেক ছুটাছুটী করিয়া নরনারীর সেবা করিয়াছেন, এখন সহসা বিধাতা কেন তাঁহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই ? কিন্তু অন্তর্গুরু ভিন্ন সে-কথা আর কে তাঁহাকে শুনাইতে পারে।

গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (সেজোবাবু) স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েক মাসাবধি দেরাদুনে অবস্থিতি করিতেছেন ; ইনি বলিষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ শিকারী, এক্ষণে তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া আমরা চিন্তিত আছি ; বিধাতার কৃপায় তিনি শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করুন। তাঁহার সর্ব্বাগ্রজ রায় বাহাদুর গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সম্প্রতি তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেরাদুন গমন করিয়াছেন।

এবার আমরা দুইটি ছাত্রের বি-এ পাসের সংবাদ পাইয়াছি, একটি স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কাঙ্গালীচরণ পাল, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ আশের পুত্র শ্রীমান্ চারুকর আশ (বি-এ সি-ডিসটিংসন) যদি কেহ কোন কুশদহবাসী ছাত্রের পাসের সংবাদ প্রদান করেন তাহা আমরা প্রকাশ করিব।

এবার স্থানাভাবে আরো কয়েকটি সংবাদ দেওয়া হইল না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

[library stamp, illegible]

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন.

নবম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩২৪ { পঞ্চম সংখ্যা।

প্রার্থনা-সঙ্গীত

—০—

(কীর্ত্তনের সুর—তেওট)

জীবের দুর্গতি দূর কর হরি-দয়াময়।
দিয়ে অভয়-চরণ ঘুচাও ভব-ভয়।
ঘোর অধর্ম্ম-অপরাধে, অপ্রেম ভ্রাতৃবিচ্ছেদে,
হ'ল সোণারসংসার দুঃখের আলয়।
পাপানলে সন্তাপিত, শোক তাপে অভিহিত,
শ্রীচরণ-আতপত্র দাও হে আশ্রয় ;—
দুঃখে কাঁদে সব নরনারী, ধর্ম্ম-পথ পরিহরি,
করে হা-হাকার বিষম বিষের জ্বালায়।
নব-ধর্ম্ম-বিধান, করিলে যদি প্রদান,
প্রেমে বিগলিত কর পাষাণ-হৃদয় ;—
পাপী আসিবে দলে দলে, কাঁদিবে হরি ব'লে,
হ'বে দেশে দেশে তোমার নামেরজয়।

(ব্রহ্ম-সঙ্গীত)

ভারতের আদর্শ

গতবারে "বিলাতী বর্জ্জন না বিলাসিতা বর্জ্জন" প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছিলাম, "এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে পৃথিবীর ওলট-পালট দিনে আমাদের একটি অবসর আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের আদর্শ স্থির করিয়া চলিবার জন্য।" এবং ইউরোপীয় শিল্প হইতে ভারতীয় শিল্পের প্রকৃতি-ভেদ প্রসঙ্গে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিও যে ভিন্ন, প্রবন্ধ মধ্যে তাহারও ইঙ্গিত ছিল। এই ভেদ সকলেই স্বীকার করেন জানি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সর্ব্বতোমুখীন ভাং-গড় আন্দোলন চলিয়াছে, যাহাতে কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে অথবা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য এবং জাতি ধর্ম্ম সকল বিষয়েরই সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে—পূর্ব্বে কি ছিল, আর এখন কি প্রকার হইতেছে, অতঃপর কি হওয়া আবশ্যক—সেই পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, কিম্বা সম্পূর্ণ নূতন গঠন করিতে হইবে, অথবা নবীন ও প্রাচীনে সমন্বয় হইবে, এইরূপ কত বিভিন্ন ভাব লইয়া গভীর আন্দোলন চলিয়াছে।

অন্তত অর্দ্ধ-শতাব্দী হইতে আমাদের দেশে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যে ভাং-গড়-ক্রিয়া চলিয়াছে—যাহার প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া শিক্ষিত নরনারী মাত্রেই আন্দোলিত হইতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু ভাঙিবার প্রয়োজন হয় তখনই, যখন কিছু গড়িবার আবশ্যক হয়।

একটা চলিত কথা আছে, "জগতে ভাং-গড়ই বিধাতার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য" কিন্তু বিজ্ঞানে স্থির হইয়াছে যে, বিধাতা ছেলেখেলার মতো কিম্বা খামখেয়ালে ভাং-গড় করেন না, তিনি তাঁহার সৃষ্ট জগতকে অনন্তের দিকে—পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, অপূর্ণতার অবসান পূর্ণতা দানের জন্য। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যত ভাং-গড় সকলই পূর্ণতা দানের জন্য। স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতকে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন। মানব নিজ অপূর্ণতা বশত গমন পথে যে-টুকু বিকৃতি করে, তাহা ভাঙিয়া বিধাতা পূর্ণতার অনুকূলে আবার গঠন করেন।

সমস্ত গঠনই এক পূর্ণতার অনুকূলে হইলেও দেশ এবং কাল ভেদে প্রাকৃতিক নিয়মে গঠন-বৈচিত্র্য ঘটে। বিচিত্রতার মধ্যে প্রত্যেকের এক একটি বিশেষত্ব থাকে। এক হইতে অন্যের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়।

ইংরেজ বলিলে জাপানীস বুঝায় না, বাঙালী বলিলে ইংরেজ বুঝায় না, প্রত্যেক জাতির পার্থক্য যখন আমরা বুঝি তখন তাহার অন্তর বাহ্যই বুঝি। এই বিশেষত্বকে আদর্শরূপেই নির্দ্দেশ করিতেছি। আদর্শ অর্থাৎ যে-টি শ্রেষ্ঠরূপ। সুতরাং ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপ বা আদর্শ কি ?

নিতান্ত সংক্ষেপে এবং সার কথায় বলিতে পারা যায় যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, এবং বৈরাগ্য। এই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুরূপ তাহার বাহ্যরূপ এবং সমস্ত কর্ম্ম।

এক শ্রেণীর তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মতে ভারতবাসীর ন্যায় মিশ্র জাতি জগতে আর দেখা যায় না। তাই ভারতবাসীর মধ্যে এত বিচিত্রতা। কেবল যে, আর্য্যানার্য্যগত পার্থক্য তাহা নয়, আরো কত কত জাতির সাদৃশ্য ভারতবাসীর মধ্যে দেখা যায়। যাহা হউক, বর্ত্তমানে বৃটিশ পতাকা তলে যত জাতির একত্রে সন্দর্শন হইয়াছে, ইহার ধর্ম্ম ভেদ গণনায় যে সমস্ত প্রধান দেখা যায়, যথা—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় গুলির প্রভাব একত্রে ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তাহার প্রত্যেকের সার-সমাধান ভারতবাসীকেই করিতে হইবে, অন্যথা ভেদ-বিদ্বেষ্ট চিত্তে সমালোচনা করিয়া মঙ্গলের আশা নাই।

ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, ভারতবাসী যেমন সকল ধর্ম্মকে আত্মস্থ করিয়াছেন, অন্যত্র এমন অল্পই দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, এবং বৈরাগ্য। ভারতবাসী অধীশ্বর হইতে ভিক্ষাজীবী পর্য্যন্ত জানে, "সংসার অসার," সংসার অসার খুবই সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান,মনোবিজ্ঞান,এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান—তদুপরি উচ্চ যোগ ভক্তি-তত্ত্ব পর্য্যন্ত, এক নবীন আকার ধারণ করিয়া এই গভীর সত্য বিশেষভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, "সংসার কেবলই অসার নয়, ইহা সেই সারাৎসারেরই রাজ্য! এখানে কেবলই পাপ-তাপ পূর্ণ নয়, পবিত্রতা এবং শান্তির স্থানও আছে; হে মানব, সর্ব্বাগ্রে তুমি সেই স্থান অন্বেষণ কর। তাহা হইলে সকল অসারের মধ্যে সার-দৃষ্টি লাভ করিয়া সত্য-জীবন প্রাপ্ত হইবে। নবযুগের সাধনা তোমার জীবনে প্রমাণিত করিবেন, "স্বর্গরাজ্য" "প্রেম পরিবার" "সুখী পরিবার" ইহ জগতেই তোমার প্রাপ্য।"

ভারতের প্রাচীন আদর্শে যেখানে ছিল, "সংসার অসার" সেখানে নবীন

আদর্শে আসিল "স্বর্গরাজ্য" "প্রেম পরিবার" "সুখী পরিবার ;" কি সূত্রে এই নবীন আদর্শ আসিল. তাহা কি শিক্ষিত ভারতবাসী জানেন না ? এই-খানেই তো প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের প্রকৃত মিলন ! আর্য্য ঋষিদিগের ব্রহ্ম-প্রীতি, মহর্ষি ঈশার নর-প্রীতি যেখানে সন্মিলিত হইল, যেখানে যোগ এবং কর্ম্ম, ত্যাগ এবং কর্ত্তব্য পালন, ধ্যান এবং ইচ্ছা যোগের মিলন হইল, সেইখানে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের প্রকৃত মিলন—বিবাহ হইল।

কিন্তু একদিকে যাঁহারা ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে একান্ত রক্ষণশীল অথবা এদেশের পৌরাণিক ভক্তিবাদীগণ প্রাচীনসংস্কার বশত এই নবীন অধ্যাত্ম-যোগ-তত্ত্বে, মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বাহ্যিক অনুকরণ করিয়া যাঁহারা কেবলই বাহ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন, আর শিল্প বাণিজ্যাদির চিন্তায় ব্যাপৃত, তাঁহারাও এই তত্ত্বে বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া অসার সংসারে কেবলই অশান্তি ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতে এই নবীন আধ্যাত্মিক আদর্শ যে আদৃত এবং গৃহীত হইবে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান যুদ্ধে পৃথিবী-ব্যাপী এই ভাং-গড় বিধানে যে মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে, তাহাতে ভারতের নবীন আদর্শকে ফুটাইবার অনুকূলে সমগ্র পৃথিবী অনুকূল হইবে। ভারতবর্ষও সমস্ত পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সংস্কারে সহায়তা করিবেন। আর ভারতবর্ষকে সাবধান হইতে হইবে—সংযত হইতে হইবে পাশ্চাত্য অন্ধ-অনুকরণে—বিলাসিতা বর্জ্জনে ; আর, করিতে হইবে নিষ্ঠা মিতাচার গ্রহণ, — যেটির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। তারপর প্রাচীন আদর্শ ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে অথবা পরলোকে বিশ্বাস ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি একটু অনুকূল হইলে, নূতন আলোকেই তাহা গৃহীত হইবে। বিধাতা এই পথে ভারতবাসীর সহায় হইবেন, তাহার আয়োজন পূর্ব্বেই করিয়াছেন।

কুশদহের ইতিহাস

———০———

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কুশদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপে ব্রাহ্মণ ভূস্বামী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কুশদ্বীপের

ভূস্বামী জগো হড় চৌধুরীকে আমরা এইরূপ একজন শাসনকর্ত্তা মনে করিতে পারি। এড়ু মিশ্রের নির্দ্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন প্রজাগণের মধ্যে সদাচার ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ দেখাইবার জন্য তের জন গৌণ কুলীনকে তেরটি দ্বীপে সনন্দ প্রদান দ্বারা শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কুলীনগণ রাঢ়দেশে সদাচার ও বিদ্যা চর্চ্চা ও লোকশিক্ষার কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। বঙ্গ ও বরেন্দ্র দেশে আদিশূর আনীত দ্বিজ পঞ্চকের বংশধরগণ সে কার্য্য করিতেছিলেন। কেবল ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগে বিদ্যাচর্চ্চা ও সদাচার শিক্ষা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। না হইবারই কথা। সেন বংশীয় রাজগণের মধ্যে বিজয় সেন গৌড় জয়ে বিব্রত ছিলেন। পালরাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইলেও মগধে রাজত্ব এবং গৌড় পুনরুদ্ধারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালও যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে লিপ্ত থাকায় এবং পরে নিজপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় দেশের অভাব দূর করিতে সম্ভবতঃ তাদৃশ মনোযোগী হইবার অবসর পান নাই। কাজেই লক্ষ্মণ সেন নিজ সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সকল আভ্যন্তরিক বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নয় যে, বল্লালের রাজত্ব সময়ে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থিত ভূভাগে সেন রাজগণের প্রভুত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই সদাচার ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? তখন কুশদ্বীপের অধিবাসী কাহারা ছিল? বহু দিন পূর্ব্বে একবার এ কথার আলোচনা কুশদহে হইয়াছিল। কিন্তু তখন সকল কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয় নাই। এখনও বলা অসম্ভব। তবে যতটুকু সম্ভব তাহাই আলোচিত হইবে। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন, 'ধান ভানিতে শিবের গীত' কেন? কিন্তু তাহা না হইলে ঢেঁকি চলে কৈ?

কুশদ্বীপের সর্ব্ব প্রাচীন অধিবাসী কাহারা সে কথা বলা এক প্রকার অসম্ভব। তবে বাংলার প্রাচীনকালের অধিবাসীগণের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। ঐতরেয় আরণ্যক হইতে পাওয়া যায় যে, 'বঙ্গ' 'ব্যাধ' 'চের' প্রভৃতি জাতি বাংলার আদিম অধিবাসী। আধুনিক পুরাতত্ত্বগণের শীর্ষস্থানীয় বাংলার সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, তাঁহার 'বাংলার ইতিহাসে' বলিয়াছেন যে, "ব্যাধ" হয় মগধের প্রাচীন নাম, অথবা লিপিকর প্রমাদের ফল।"

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যাধ লিপিকর প্রমাদ নহে। মগধও নহে। 'ব্যাধ' যথার্থই ব্যাধ। এই ব্যাধ জাতি এখনও ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে বিদ্যমান। চলিত ভাষায় ইহাদের নাম বাগ্দী। * ইহাদের জাতীয়তার লোপ হয় নাই। অন্যান্য জাতি আর্য্যসংস্রবে আসিয়া হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু বাগ্দী এখনও পূর্ব্ব 'রীতি' বজায় রাখিয়াছে। যদিও মৎস্য ধরাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা, তথাপি রাত্রিতে যে ইহারা 'কাতলা মারা' অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি করে না, এ-কথা রাঢ়ের লোকে বলিতে চাহিতেন না। বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসীরাই ইহাদের বিশেষ পরিচয় জানেন। কুশদ্বীপে ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে। তবে সাধারণত তাহারা মৎস্যজীবী। পূর্ব্বকালে কুশদ্বীপে অনেক নদী, খাল ও বিল ছিল। সুতরাং মৎস্যজীবীগণের বাসের বিশেষ সুবিধা ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত, 'বঙ্গ' জাতি বোধ হয় সাঁওতাল। কেন না সাঁওতালী ভাষায় বঙ্গ শব্দ যুক্ত অনেক পদ আছে। সে গুলি দৈত্যবাচক। সম্ভবত আর্য্যগণ ঘৃণাচ্ছলে তাহাদিগকে বঙ্গ বা দৈত্যপূজক বলিতেন। 'চের' হইতে সম্ভবত চোয়াড় শব্দের উৎপত্তি। চের জাতি মধ্যভারতে আছে। আমাদের দেশের চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি স্থান তাহাদের পূর্ব্বনিবাসের পরিচয় দেয়।

কুশদ্বীপে প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে কিন্নর জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্নরদিগকে চলিত ভাষায় কান্ বলে। কিন্নরদিগের মধ্যে মধুকানের নাম প্রসিদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচনা করিয়া ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এখনও কৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তন করিয়া কানেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখন তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

কুশদ্বীপে প্রাচীনকালে সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। দ্রাবিড়দিগকে চলিত ভাষায় দামিল বলিত। ডুমা, দামহাটী, দাঁইহাট দামুন্না প্রভৃতি জনপদের নামে এখনও দামিলগণের পূর্ব্বনিবাস স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ হইতে যে দামিল জাতির অস্তিত্বের লোপ হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস এই যে, আধুনিক ডোমজাতি ডামিল বা দামিলগণের বংশধর। ডোমেরা রণকুশল জাতি। পূর্ব্বকালের হিন্দুরাজগণের পাইক সৈন্যদল ডোম লইয়া গঠিত হইত। ধর্ম্মমঙ্গল ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। পাঠান রাজত্বকালে পাইক সৈন্য হীনবল ছিল না। ইংরাজ

রাজত্বের প্রারম্ভে ডোমেরা দস্যুবৃত্তি করিত। জমিদারেরা তাহাদের সহায়তা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের যে জনসংখ্যা ছিল, এখন তাহার শতাংশও নাই। ইহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন হিন্দু।

প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে কুশদহের বাজীকরগণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন দু'একজন মাত্র দেখা যায়। ইঁহাদের পরে মাল বা সাপুড়িয়াদিগের নাম করিতে হয়। ইহাদের ব্যবসা সাপধরা ও সাপের বিষের চিকিৎসা করা। কেহ কেহ চক্ষু রোগের চিকিৎসাও করে।

কুশদহের মধ্যে অনেক বেদিয়া আছে। তাহারা আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পরশুরামের সময়ে তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছিল। প্রথমে গুজরাটে, পরে মধ্যদেশে তথা হইতে কুশদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বেদিয়ারা প্রসিদ্ধ চোর ছিল। সিঁধ চুরিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত ছিল। এক্ষণে কৃষিকার্য্য করিতেছে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। হিন্দু মুসলমান রাজগণের সময়ে ইহারা ঘৃণিত ছিল, কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সদয় ব্যবহারে ইহারা পূর্ব্ব-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া লোক-সমাজে আদৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। অন্য একটি প্রবন্ধে ইহাদের বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কুশদহের প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কাওরা, হাড়ি ও মুচি উল্লেখ যোগ্য। কেবল যে বাগ্দী জাতি এতদঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াছিল, তাহা নহে। হাড়ি কাওরাও সেই সঙ্গে বা তৎপূর্ব্বে আসিয়াছিল। কুশদহের জলাভূমিতে তাহাদের শূকর চরাইবার বিশেষ সুবিধা থাকায় তাহারা দলে দলে এখানে বাস করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যাও অল্প ছিল না। এখন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

মুচীরা কাওরা হইতে কিছু উন্নত ছিল। তাহারা বৌদ্ধ হইয়াছিল। এখনও তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের পূজা প্রচলিত আছে। কার্ত্তিক মাসের রাস পুর্ণিমার দিন তাহারা ধর্ম্ম-পূজা করিয়া থাকে। ঠাকুরকে ছাতা দেওয়া এই পূজার অঙ্গ। সেই জন্য সকল শ্রেণীর লোক ঠাকুরকে সোনার ছাতা কিনিয়া

দিয়া থাকে। বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে ধর্ম্মঠাকুরের গাজন হইত। এখন চড়কের সময় যেমন শিবের গাজন হয়, পূর্ব্বে ধর্ম্মঠাকুরের সেইরূপ গাজন হইত। ধর্ম্ম-সংন্যাস উপলক্ষে গোবরডাঙ্গা ও ইছাপুরে এখনও মেলা হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(বি-এ)

শান্তি পথে

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঝড় উঠিল

অল্পক্ষণ এইভাবে কথা হইবার পর জজবাবু বলিলেন, মিত্তির মশাই, আজ আপনার কাছে আমরা একটা বিশেষ দরকারে এসেচি।

এই কথায় মিত্র মহাশয়ের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখ গম্ভীর হইল। আর সুবোধচন্দ্রও ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। নগেন্দ্রনাথও সুবোধের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, দেখচ সুবোধ, আমার ক্ষমতা, যখন সাবধান করলুম, তখন শোনা হ'ল না। এখন দেখো আমি কি করতে পারি।

জজবাবু তখন ধীরে ধীরে আপন বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—সুবোধকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত না করিলে পরদিবস প্রভাতে মিত্রপরিবার সমাজপতিগণ কর্তৃক জাতিচ্যুত হইবেন। তবে যদি সুবোধ সমাজের কাছে দোষ স্বীকার করে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকার করে,তবে আর কোনও গোলযোগ থাকিবে না। তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া জজবাবু বলিলেন, মিত্তির মশাই, এখন বলুন আপনি কি করবেন, সমাজ রাখবেন না ছেলে রাখবেন ?

এই কথা শুনিয়া মিত্র মহাশয় কাতর নয়নে একবার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, একবার নিকটে শায়িতা ললিতার মুখ-চন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিলেন, একবার শাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে চাহিলেন, পরে আগন্তুক ভদ্রলোক দিগের মুখের দিকেও চাহিলেন এবং সর্ব্বশেষে সম্মুখের দেয়ালে স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর তৈল-চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে তাহাই দেখিতে

লাগিলেন। যেন এই কার্য্যে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর মতামত জানিবার জন্যই তাঁহার চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। আজ তিনি হঠাৎ মনে করিলেন যে তাঁহার চিরজীবনের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী যেন বহু বৎসর পরে তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাইবার জন্য, পরলোক হইতে নামিয়া, তাঁহারই মত বেদনা-পূর্ণ বক্ষ ও কাতরতা-পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া, এই কলহ-কোলাহলের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ যেন পরলোক তাঁহার নিকট ইহলোক হইতেও নিকটতর হইয়া উঠিল। এই ইহ-পরলোকের সন্ধিস্থলে বসিয়া, তিনি মুগ্ধ-নয়নে পত্নীর আলেখ্যের স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন নূতন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

মিত্র মহাশয় কতকক্ষণ এইভাবে নীরবে বসিয়া থাকিলে কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "দাদা, চট্‌পট্‌ একটা জবাব দিন, সমস্ত সুরপুর সমাজ, আজ আপনাকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তাই জানতে চাইচেন।

অনন্ত বাবু বলিলেন, হাঁ। ঠিকই তো, দেরি করার দরকার কি? সামান্য একটা কথা বই তো নয়?

তুলসী বাবু বলিলেন, আর কথাটা নিতান্ত নতুন তো নয়; অনেকদিন থেকেই এই বিষয়ের আলোচনা চলচে।

এত কথার পরেও মিত্র মহাশয় তাঁহার নীরবতা ভঙ্গ করিলেন না দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, দেখুন জজবাবু, আমি একটা কথা বলি, আপনারা দয়া ক'রে মিত্র মশাইকে কয়েক দিনের সময় দিন। এত বড় একটা কথার উত্তর, আজই দেওয়া সম্ভব নয়। আনন্দময়ীর পূজা হ'য়ে যাক্, তারপর একদিন এই বিষয়ের মীমাংসা করা যাবে।

এই উত্তর শুনিয়া জজবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, আপনি তো বড় মজার কথা বলচেন। এমন একটা সামাজিক সম্মিলনের দিনে আমরা সুবোধকে বাদ দিয়া পূজা করতে চাই না। সুবোধ প্রায়শ্চিত্ত করুক, আমরা সবাই আনন্দ মনে মিত্র বাড়ির পূজায় যোগ দিই। আগন্তুক ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে এই কথায় সায় দিলেন।

তখন জজবাবু গম্ভীরভাবে মস্তক নাড়িয়া একবার নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না, সময় টময় হবে না। কাল পূজো, আজই এর মীমাংসা করা দরকার। আমরা মীমাংসা করলে, কাল বাড়ীতে পুরোহিত, তন্ত্রধারক ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসবে কি না ঠিক হবে। এখন আর দেরি করা হবে না, আজই উত্তর চাই। মিত্তির মশাই, বলুন, আপনি কি করবেন,

আপনার একদিকে সুবোধ আর অপরদিকে, সমস্ত গ্রাম, সকল আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আপনি কোন্‌টা চান ?

এতক্ষণ পরে মিত্র মহাশয়ের বাক্যস্ফুরণ হইল। তিনি বলিলেন, শাস্ত্রী মশাই যা বলেচেন, আমিও তাই বলি ; আমি দিন কয়েক সময় চাই।

তুলসীবাবু বলিলেন, কেন অনর্থক সময় চাচ্ছেন, দাদা ? সুবোধ তো আপনার বোকা ছেলে নয়, সে কি আর আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে, স্ত্রী কন্যা ছেড়ে এবং আপনাকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে সুখে থাকতে পারবে ?

অনন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু একটা কথা—সকলেই তো সুবোধকে বর্জ্জন করবেন, কিন্তু সুবোধের স্ত্রী ও কন্যাও কি তাকে বর্জ্জন করতে প্রস্তুত আছেন ?

জজবাবু বলিলেন, কি বলো নগেনবাবু, সুবোধ প্রায়শ্চিত্ত না করলে তার স্ত্রী ও কন্যাও তো তাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন ?

সকলের দৃষ্টি তখন নগেন্দ্রনাথের উপর পতিত হইল। মিত্র মহাশয়ের মুখের উপর আশা ও নিরাশার দ্বন্দ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

জজবাবুর প্রশ্নে নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে সুবোধের মুখের দিকে চাহিলেন। এই দর্শনের দ্বারা যেন তিনি বলিতে চাহিলেন, দেখ সুবোধ, এখন আমার ক্ষমতা দেখ। আমি ইচ্ছা করলে তোমায় আজ রাখতেও পারি, মারতেও পারি। নীরব ভাষায় সুবোধকে এই কথা জানাইয়া তিনি বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই, আমার ভগ্নী আর আমার ভাগ্নী নিশ্চয়ই সুবোধকে ছাড়বে। জ্যাঠামশাই সুবোধকে না ত্যাগ করলেও আমি আমার বোন ও ললিকে নিয়ে আলাদা হ'ব। আমি সমাজ ছাড়ব না, আমার বোনও ছাড়বে না।

নগেন্দ্রনাথ নীরব হইলে, মিত্র মহাশয় অনুভব করিলেন যেন হঠাৎ ঘরের সব কয়টা আলোকই নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মস্তক যেন শূন্যে ভ্রমণ করিতেছে। সুবোধচন্দ্রও এই সময়ে তীব্র কটাক্ষে নগেন্দ্রনাথকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রনাথের উত্তর শুনিয়া জজবাবু বলিলেন, বেশ, নগেনবাবু, বেশ। এমনি স্বাভাবিক, সরল এবং সহজ উত্তর যদি মানুষ সব সময় দিত, তা হ'লে আমাদের জীবনটা কত সুখের হ'ত ?

এই সময় মিত্র মহাশয়ের মুখ দিয়া পুনরায় বাক্যস্ফুরণ হইল। তিনি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ নগেন, এতটাই কি সম্ভব? বউমাও কি সুবোধকে ত্যাগ করবেন?

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, জ্যাঠামশাই, বীণা এতটা করতে প্রস্তুত না হ'লে কি আজ ক'মাসের মধ্যে সে সুবোধের সঙ্গে একবার দেখা করতেও চাইলে না? আজকের এই সভায় সুবোধ সম্বন্ধে যেরূপ স্থির হবে, সে তাই মান্য করবে।

মিত্র মহাশয় তাকিয়ায় হেলান দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সুবোধ এতক্ষণ নীরব ছিলেন। কিন্তু আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, নগেনদা, আপনি আর যাই করুন, আমার স্ত্রীর হ'য়ে কথা বলার আপনার কোনও অধিকার নেই।

নগেন্দ্রনাথ এই কথায় হাসিয়া বলিলেন, সুবোধ তুমি ছেলেমানুষ, তার উপর দু'বছর বীণাকে দেখ-নি, তাই এই রকম কথা বলচ। তার হ'য়ে কথা বলার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে আমায় এইসব কথা বলতে বলেচে। যদি দরকার হয়, বীণা নিজে এসে এই সভায় দাঁড়িয়ে সমবেত সমাজপতিগণের কাছে আপন মুখে এই কথাই ব'লে যাবে।

এই কথার উত্তরে সুবোধ কি বলিতে যাইতেছিলেন, সকলে বাধা দিয়া মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, আপনাদের ঘরোয়া ঝগড়ায় আমাদের কিছু দরকার নেই, এখন আপনি আমাদের কথাটার সোজা উত্তর দিন।

মিত্র মহাশয় এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলার পূর্ব্বেই সুবোধচন্দ্র ক্রোধোদীপ্তস্বরে বলিলেন, আপনারা কেন বাবার প্রাণে ক্লেশ দিচ্চেন? আমিই বাবার হয়ে উত্তর দিচ্চি। কোনও ব্যক্তিকে শাসন করার অধিকার তাঁরই আছে, যিনি নিজে চরিত্রবান, ন্যায়-নিষ্ঠ ও সহৃদয়। আপনাদের আজকের কাযে, শাসনের দণ্ড থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমের সহৃদয়তা নেই। অতএব আপনাদের সমাজ-সংস্কার করবার অধিকার আমি স্বীকার করি না। আর আপনাদের কোনও আদেশ পালন করবার ইচ্ছাও আমার নেই। তবে বাবার তৃপ্তির জন্যে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। কিন্তু আপনাদের এই-সব কথার ভয়ে আমি কিছুই করব না।

এই কথায় সমাজপতিগণ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, যত বড় মুখ তত বড় কথা; আমরা কেউ নই। আচ্ছা মিত্তির মশাই, এই আমাদের শেষ কথা জানিয়ে গেলুম্। কাল সুয্যি উঠবার আগেই সুবোধ যদি এ বাড়ী থেকে না বেরিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে আপনি যদি সব সম্পর্ক তুলে না দেন, তবে মিত্র পরিবারকে সুরপুর সমাজ কাল থেকে এক ঘরে করবেন। এই আমাদের আদেশ; দেখি কে আমাদের এই আদেশ অগ্রাহ্য করে?

সুবোধ বলিলেন, তথাস্তু। মিত্র পরিবার কেন একঘরে হবেন, আমিই একঘরে হলুম।

সকলে বিদায় হইলে পিতা, পুত্র নীরবে গৃহে স্থির হইয়া বসিলেন।

সমাজপতিগণ সহাস্যমুখে কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। পথে তুলসী বাবু নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, ভায়া এইবার তো তোমার সব কাজ হাঁসিল হ'ল, এখন আমাদের বিষয় কি হবে? হরি হে মধুসূদন!

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, কাজ শেষ হ'বার এখনো ঢের বাকি দাদা। এখন বারবাড়ির কায তো যা হোক্ হ'ল; এখন ভিতর বাড়ির আসল কাযটাই বাকী, এক্ষুণি গিয়ে বৌণীকে সামলাতে হবে।

কিছুদূর পর্য্যন্ত সমাজপতিগণের অনুসরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ বিদায় লইতে যাইতেছেন, এমন সময় জজবাবু নগেন্দ্রনাথকে অন্যের অজ্ঞাতসারে বলিলেন, আমি তোমার এত বড় কাযটা ক'রে দিলুম্, তুমি আমার একটা উপকার করবে? কালই আমার ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার বিশেষ দরকার, যোগাড় ক'রে দিতে হবে। কিছু বন্ধকও দেবো না, হ্যাণ্ডনোটও কাটব না, আর সুদ্‌টুদ্‌ও কিছু দিতে পারব না। অমনি ক'রে দিতে হ'বে।

উভয়ে গোপনে আর কি কথা বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, তা হবে। দেড় হাজার বই ত নয়, তা দেওয়া যাবে।

এইভাবেই আবার কামাখ্যা বাবু সুন্দরবনে কিছু জমি নাখরাজ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, এবং তুলসী বাবুও কলিকাতায় একখানা বাড়ী ক্রয় করিবার মত অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

সকলে বিদায় হইলে অনন্ত বাবু বলিলেন, ভায়া, এখন আমার দক্ষিণেটার কি হবে?

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, তোমার তো একটা খাসি, আর একটা বোতলেশ্বরী, তাও হবে হে, হবে।

অনন্তবাবুও হাস্যমুখে বিদায় হইলেন। নগেন্দ্রনাথ স্ব-গৃহে অর্থাৎ মিত্র-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ও সমাজপতিগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সুবোধ পিতাকে বলিলেন, বাবা যদিও সমাজ এসে আজ আমাকে আপনার সেবা থেকে বঞ্চিত করলে,তবুও আমি জানাচ্ছি যে, আপনি যদি আদেশ করেন, তো আমি এই নিষ্ঠুর শাসনকে অগ্রাহ্য ক'রে চিরদিনই আপনার চরণ-সেবা করতে প্রস্তুত থাকব। কিছুক্ষণ পরে সুবোধ পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। মিত্র মহাশয় কোনও কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল নীরবে পুত্রের মস্তকে হস্তামর্ষণ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সুবোধকে বিদায়কালে আশীর্ব্বাদ করিয়া কেবল অস্ফুটস্বরে বলিলেন, দুর্গে, দুর্গতিহারিণী দুর্গতি সব দূর করো মা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী

পিতা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সুবোধচন্দ্র অন্দর-বাটীতে একেবারে পত্নীর কক্ষ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিগত ছয় বৎসর তিনি অনেক আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া স্বামী স্ত্রীতে আঁখি-জলে বুক ভাসাইয়া কত কথায়, কত ব্যথায়, গোপনে বিদায় লইয়াছিলেন; তারপর তিনি বিদেশে প্রবাসে থাকিয়াও প্রেমের সংসার পাতিবার কথা কত প্রকারে মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। সংসার-সুখের-কল্পনা তিনি আপন কল্পনায় কতবার গড়িয়াছেন, কতবার ভাঙিয়াছেন, আবার কতবার নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, এই ভাবেই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সুবোধ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহা শূন্য; তাঁহার হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি যেন কক্ষ প্রাচীর প্রান্তে যাইয়া লুণ্ঠিত মস্তকে বীণার সন্দর্শন প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত, প্রেম-স্মৃতি জড়িত বহুতর দ্রব্য তাঁহার বীণা-সন্দর্শন-লোলুপী হৃদয়কে বিরহ ব্যথায় শতগুণ আকুলিত করিয়া তুলিল। বীণার অপেক্ষায় তিনি কতকক্ষণ গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিয়া দরদালানে বাহির হইলেন। একজন পরিচারিকা সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে নিকটে আসিয়া বলিল, দাদা বাবু, আমায় চিনতে পার-না? তুমি দেশে

এসে অবধি তোমায় ভাল ক'রে দেখিনি—কখন আস, কখন যাও টেরও পাই না। আজ শুনলুম, তুমি বাড়ির ভেতরে এসেচ. তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

পরিচারিকার সহিত সুবোধের আরও দু একটি কথা হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিলেন. তাহার নাম—"হরির মা", সুবোধের বাল্যকালের ধাত্রী। সুবোধ তাহার পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, দেশে ফিরে অবধি, বাড়ি থাকতে পাই নি, হরির মা দিদি। একেবারে চাকরী নিয়ে দেশে এসেচি, যে দিন ফিরিচি, সেই দিনই চাকরিতে ঢুকিচি, আর সেই অবধি ছুটি পাই নি। মনে করেছিলুম, পুজোর ছুটিতে বাড়িতে থাকব, আর তখন তোমাদের সকলের সঙ্গে আবার ভাল করে মিশব, কিন্তু সে আশা মিটল না দিদি।

হরির মাতা চক্ষুপ্রান্তে অঞ্চল ঘর্ষণ করিয়া বলিল, শুনিচি, দাদা সব শুনিচি। তুমি যা জান তার চেয়েও বেশি শুনিচি। এ সব এই তোমার— পর্য্যন্ত বলিয়া সে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপেক্ষাকৃত অস্ফুট স্বরে বলিল, এই সবই তোমার গুণধর শালা বাবুর কাজ। রাক্ষস ঘরে বাইরে জ্বালাচ্চে। তোমাকে তো জ্বালাচ্চেই, বৌ দিদিমণিকে নিয়েই কি কম করচে? সীতা ছিলেন রাবণের অশোকবনে চেড়ীদের পাহারার ভেতর. আর আমাদের বৌ দিদিমণি আছেন দত্ত মশায়ের জেলে চাঁপারাণীর কড়া পাহারায়। চেড়িদের পাহারা সওয়া যায় কিন্তু চাঁপার পাহারায় বড় কড়াকড়ি।

সুবোধচন্দ্র হরির মাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বৌদিদি এখন কোথায় আছেন?

হরির মা বলিল, কোথায় আর থাকবেন, চাঁপী রাক্ষুসীর জেলে। পাছে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়, এই জন্যে দত্ত গিন্নি তাকে নিয়ে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখেচেন। বাইরে দত্ত মশাই যে খেলা খেলচেন, ভেতরে দত্ত-গিন্নিও তার দোয়ার দিচ্চেন। যেমন আবা তেমনি দেবী. জোড়টি মিলেচে ভাল।

হরির মাতা তাহার সুদীর্ঘ মন্তব্যকে দীর্ঘতর করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুবোধ আর সে সকল কথা শুনিতে চাহিলেন না। তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুবোধ বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্, আর কায নেই; এ রকম ক'রে তাঁরা আর কতক্ষণ বীণাকে জেলে পরে রাখতে পারবেন? কি অন্যায়. কি অত্যাচার!

এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধভরে সুবোধচন্দ্র দ্রুত পাদবিক্ষেপে একেবারে শ্রীমতী চম্পকবরণীর কক্ষ মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার শরীর তখনও কাঁপিতেছিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন, সালঙ্কারা, সুবেশ শ্রীমতী চম্পকবরণী কন্যা সুধাময়ীকে ক্ষীর পরিবেশন করিতেছেন।

সুবোধচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বৌদি, বীণা কোথায়?

সুবোধের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চম্পকবরণী ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে সুবোধের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমি বীণাকে খুঁজচ? সে কোথায় গেছে তাতো আমি জানি না। তোমার স্ত্রী কোথায় যায়, না যায়, তার খবরদারি কি আমায় করতে হবে?

সুবোধ বিরক্তির স্বরে বলিলেন, বীণা তার ঘরে নেই, তুমি ছাড়া তার খবর আর কে জানবে? বলো না সে কোথায় আছে, তাকে আমার বিশেষ দরকার!

চম্পকবরণী সুবোধের এই কথায় কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া হাস্য মুখে বলিলেন, কেন গো, সাহেব, অত তাড়াতাড়ি কিসের? মেম সাহেবের জন্যে ঘোড়া তৈরি নাকি? আমরা হিঁন্দুর ঘরের মেয়ে, ভাই, তোমাদের সাহেবীয়ানা এখনও শিখি নি। জিজ্ঞেস করি, বীণাকে কি আজ থেকেই ঘোঁড়ায় চড়াতে শেখাবে?

সুবোধ পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরেই বলিলেন, আজ আর ঠাট্টা ভাল লাগচে না; বার-বাড়ির কাযটা বেশ সেরে নিয়েচ, এখন ভেতর বাড়ির কাজটা আমায় তাড়াতাড়ি সারতে দেও। বীণার মনের ভাবটা আমায় একবার বুঝতে দাও।

চম্পকবরণী। বুঝতে কি এখনও বাকি আছে, ঠাকুর পো? এই ছয় বছর তার একখানাও চিঠি না পেয়েও সে-কথা কি বোঝ নি। এই ক' মাস দেশে এসেও তার দেখা না পেয়েও তা বোঝ নি। এই সহজ কথাটা বুঝতে যার এত দেরী হয়, তার বিলেতে গিয়ে একজামিন পাশ ক'রে লাভ কি?

সুবোধ। তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনও লাভ নেই, তর্ক করার প্রবৃত্তিও আমার নেই। এখন একবার বীণার সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বুঝতে চাই।

কিছুক্ষণ উভয়ে এইভাবে কথাবার্ত্তা হইবার পর চম্পবরণী একটা আপোশ করিয়া বলিলেন, আচ্ছা বীণা এখনি তার ঘরে যাবে এখন,

তুমি আগে দুটি খেয়ে নেও। পেটটা ঠাণ্ডা থাকলে দুজনের কথাবার্ত্তা জমবে ভাল। সুবোধচন্দ্র নিরুপায় বুঝিয়া চম্পকবরণীর কথায় আহারে বসিতে সম্মত হইলেন। আহারের স্থানে গিয়া, কিন্তু তাঁহারা ভোজনের প্রবৃত্তি লোপ হইল। রন্ধনশালার অলিন্দোপরি বাটীর নিম্ন শ্রেণীর পরিচারিকা দিগের আহার করিবার স্থানে একখানি ভগ্ন কাষ্ঠাসনের সম্মুখে একখানা ভগ্ন প্রস্তরের থালায় সুবোধের অন্ন রাখা হইয়াছিল, সুবোধ তাহার জীবনে কোনও দিন এরূপ স্থানে এইভাবে বসিয়া আহার করে নাই। আহারের স্থানাদির বন্দোবস্ত দেখিয়া সুবোধ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, বৌদি, এমন করে' ডেকে অপমান করার দরকার কি ছিল? এই জায়গায় বসে' আমি কি কোনও দিন খেয়েচি যে, আজ তুমি এই বাঁদীদের জায়গায় আমার খেতে দিচ্চ।

চম্পকবরণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, কি করব? যেমন হুকুম! আমায় কোনও দোষ দিও না।

সু। হুকুম? কার হুকুম? নগেন দার? নগেন দাই কি এ বাড়ীর কর্ত্তা। আমার বাবার বাড়ীতে আমি কেউ নই, আর নগেন দাদাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

সম্মুখের রন্ধনকক্ষে বসিয়া একজন পরিচারিকা, একজন পাচক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ভঙ্গী করিয়া বলিল, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

চম্পকবরণী সুবোধের কথায় কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া মনে মনে বলিলেন, আমরা তো এ বাড়ী তোমার পক্ষে অসহ্যই করতে চাই। যে কেবল জীবন ভরে বইয়ের পোকা হ'তে শিখচে, সে জমিদারীর কাযে হাত দিতে আসবে কেন? যে বই পড়ে সে বই পড়ুক্, যে জমিদারী চালায় সে জমিদারী নিক্। এই ন্যায্য কথায় যদি আপত্তি কর তো তোমার কষ্ট ঘোচায় কে? আর এই সামান্য কাযটা যদি সহ্য কর, তো আমরাও তোমায় কোনও কষ্ট দেবো না। পথের কাঁটা খোঁচাই মানুষে সরিয়ে ফেলে, দুর্ব্বো ঘাস কি কেউ সরায়?

চম্পকবরণী নীরবঃ রহিলেন দেখিয়া সুবোধচন্দ্র ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে সেই স্থান ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু চম্পকবরণীর মনস্কামনা তখনও সিদ্ধ হয় নাই। তিনি তাঁহার গমনে বাধা দিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, সুবোধ যাও কেন? খেয়ে যাও। আজকার দিনে কি রাগ করতে আছে, এস, বসো।

সুবোধ ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরেই বলিলেন, আর তোমার মায়া দেখাতে হবে

না। নগেন দাদাকে বোলো যে, এই সব অপমান আর নির্য্যাতনের ফল একদিন না একদিন তাঁকে ভুগতেই হ'বে।

এই কথা বলিয়া সুবোধ বীণার কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যে আপন পত্নীর কৃতিত্ব দেখিয়া মনে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। সুবোধের শেষোক্ত কথায় তিনি নীরবে হাস্য করিয়া মনে মনে বলিলেন, তোমার মতো একশ'টা সুবোধের অভিসম্পাৎ নগেন্দ্রনাথ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারে।

সুবোধ গমন করিলে তিনি পত্নীর সম্মুখীন্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বীণির খবর কি? সে ঠিক আছে তো?

পত্নী হাসিয়া বলিলেন, কোন ভয় নেই, সব ঠিক্

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, সাধে কি তোমায় এত ভালবাসি। এই কাযটা হাঁসিল হ'লে তোমার গলায় হীরের হার।

চম্পকবরণী তাঁহার চম্পক অঙ্গ দুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর সুধার?

ন। সুধার গলায় হরকান্ত মিত্রের জমিদারীর হার।

উভয়ে হাস্যমুখে উপরে উঠিলেন।　　　(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(বি-এ)

বাদল-দিনে

—০—

তুমি, রূপটি নিয়ে মিশে আছ
　　আকাশ ছাওয়া কালো মেঘে।
আমি, নয়ন ভরে' দেখ্‌চি তোমায়
　　সারা দিবানিশি জেগে।
পথ হারিয়ে মরুর বুকে,
চেয়েছিলাম উর্দ্ধমুখে,
নয়ন মন সব স্নিগ্ধ করা,
　　শান্ত মধুর দরশ মেগে;
নিদাঘ তাপে সারা জীবন,
দয়েছি যে দুঃখ-দহন,
আজকে জ্বালা জুড়িয়ে গেল,
　　তোমার শীতল পরশ লেগে।

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

মনোরমা

—০—

২৩

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যে সূর্য্য-কিরণ কয়দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অসহ্য পীড়াদায়ক মনে হইতেছিল, আজ তাহার তরুণচ্ছটা কি সুন্দর, কি উজ্জল! সোণালী কিরণমালা বর্ষাস্নাত শ্যামল তরু-পল্লবগুলিতে হীরার ঝিলিক হানিতেছে।

অন্নপূর্ণা বধূকে লইয়া প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বাংলার বাগানের মধ্যেই গঙ্গার বাঁধা ঘাট, সে ঘাটে অপর কেহ স্নান করিতে পাইত না। সদ্যস্নাতা মনোরমাকে নীলবসনে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল, সিক্ত বস্ত্রের মধ্য দিয়া কনক-ময়ূর-কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, দুই পাশের গাছের মধ্যকার ছায়ান্বিত পথ দিয়া আসিতে আসিতে যখন মুক্তস্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্য তাহার সমস্ত রক্ত-কিরণটুকু যেন পাত্র নিঃশেষ করিয়া সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিল, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী রূপিনী মনোরমাকে সে সময়ে যেমন সুন্দর দেখাইল, তাহা চিত্রকরের ধ্যানেরও অগোচর।

দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া শৈল মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, মনোরমা বিরক্ত হইয়া কহিল, "হাসিস্ কেন?"

শৈল অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদ্যানের বাহিরের দিকে নির্দ্দেশ করিল, মনোরমা দেখিল, সন্তোষ, হীরালাল ও মাষ্টার।

সম্ভ্রম-সঙ্কুচিতা মনোরমা আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরেই শুনিতে পাইল, অন্নপূর্ণা রাগত হইয়া কহিতেছেন, "তোর কি আক্কেল সন্তোষ? বৌমা স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে আসচে, আর তুই সেই সময়ে ওদের নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি? তোর কি কিছু আক্কেল নেই? ছিঃ ছিঃ। সন্তোষ কোনও উত্তর না দিয়া গৃহে আসিল।

সন্তোষ মনোরমাকে কহিল, "তুমিও রাগ করেছ নাকি? আজ মস্ত একটা বাজী জিতেচি, নগদ দুশো, মুখ ফিরুচ্চো কেন? আগে সবটা শোনোই? হীরালালের সঙ্গে বাজী ছিল, কার স্ত্রী বেশি সুন্দরী, যে হারবে সে দুশো টাকা দেবে, মাষ্টার মধ্যস্থ হন, হীরালাল তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠায়, আমি সে ঘরে ছিলাম, তা সে জানতো না, এসে পড়লো, আমায় দেখে পালিয়ে গেল।

এইবার আমার পালা, আমি শৈলকে বল্‌লুম, ওরা যখন স্নান করতে যাবে আমায় খবর দিস্। সে আমাদের খবর দিতেই আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলুম, তা আমিই জিতেছি, হীরালাল তোমায় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছে, বলে মুখের গঠন এমন নিখুঁত সুন্দর তাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

মনোরমা কহিল, তা বেশ করেচ, তোমার যোগ্য কাযই তুমি করেচ, শৈলকে আজ এখুনি বিদেয় করচি।

মনোরমা বাহির হইয়া যায়, দেখিয়া সন্তোষ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, ছাঁখো ওকে কিছু বোলো না, ওর দোষ নেই, আমার হুকুম পালন করেচে। আমি মনিব, যা বোলবো, তাই তো করবে?

মনোরমা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, আর আমিও কি মনিব নই? আমার অপমান স্বচ্ছন্দে ও কোরবে? এত বড় আস্পর্দ্ধা?

সন্তোষ হাসিয়া কহিল, তুমি মনিব কার সম্পর্কে? আমারই সম্পর্কে তো? আচ্ছা শৈলকে তাড়াতে চাও তাড়িয়ো। এখন তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে, হীরালালের স্ত্রীর শরীর খারাপ, সে আজ আস্‌তে পারবে না, আর একদিন আস্‌বে, তুমি আর মা আজ তাদের বাড়ী যাবে, প্রস্তুত থেকো, পাল্কী পাঠাবো।

সিংহিনীর স্থায় গ্রীবা তুলিয়া মনোরমা কহিল, কখনো না, আমি কারো বাড়ী যেতে চাই না। আমি আজ কলকাতায় যাবো। আমাকে হয় নিয়ে চলো, নয় পাঠিয়ে দাও।

সন্তোষ হাত চাপড়াইয়া, শিস্ দিয়া কহিল, বাঃ বেশ দেখাচ্চে, ফণা ধরতে শিখ্‌চ দেখ্‌ছি, কলকাতায় যাবে কি? তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌বো কি ক'রে?

"ঠাট্টা রাখো, আমি আজ যেতে চাই-ই।"

"যেতে পাবে না, পাবে না, দিব্বি ক'রে বল্লুম। মাকে পাঠিয়ে দিতে বলো, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্চি। ভাল চাও তো চুপ চাপ ক'রে থাকো। মেয়েমানুষের এত একগুঁয়েমি ভাল নয়, মেরে হাড় ভাঙবো।"

সন্তোষ বাহির হইয়া গেল। মনোরমা গিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, মা শৈলকে আজি বিদেয় করুন, আর কালিসিংকে দিয়ে বাবাকে তার করুন, তিনি তার পেয়েই চ'লে আসুন, আমি আজি কলকাতা যাবো।

অন্নপূর্ণা কখনো বধুকে উদ্ধত হইতে দেখেন নাই, তিনি ভীত হইলেন, শৈলকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি বাছা বাড়ী যাও, এখানে তোমার পোষাবে

না, গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির মান রাখ্‌তে জান না, নিজেদের মতন সবাইকে মনে করো।

শৈল চটিয়া লাল হইল, উচ্চরবে কহিল, "গতরে খেটে খাবো, কাযের ভাবনা আমরা করি না, এক দুয়োর বন্ধ হ'লে শতেক দুয়োর খোলা। আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করি। যাদের বাড়ীর মেয়ে বৌ, তাঁরা যদি ইজ্জত না রাখ্‌তে চান তো আমাদের কি দোষ? আমি এই চল্‌লুম।

রাগে গর গর করিতে করিতে শৈল চলিয়া গেল, মনে মনে ইচ্ছা, গৃহিণী আবার ফিরিয়া ডাকিবেন, এমন চাকুরী খোয়াইতে তাহার ইচ্ছা নাই, পাওনা খুব বেশি। কায খুব কম, কিন্তু কেহই ডাকিল না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিনয়কুমার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, ছুটি ফুরাইয়াছে, দু-এক দিনে জব্বলপুরে ফিরিতে হইবে।

ক্ষীরোদার ইচ্ছা ছিল, এই ছুটিতে পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূ লইয়া যান, কিন্তু বিনয় সম্প্রতি বিবাহে নারাজ। রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে তাঁহারা অতিথি হইয়াছেন।

মনোরমার মাতা বিনয়কে ছোট্টটি দেখিয়াছিলেন, এখন সে বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘকায়, সুন্দর যুবক হইয়াছে, কথাগুলি সুমিষ্ট ও নম্রতা পূর্ণ, ব্যবহার অতি ভদ্র। বিনয়কে যদিও তিনি যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু বহুদিন কাছ ছাড়া হওয়ায় সে স্নেহের আর বড় বেশি সাড়া শব্দ ছিল না, আজ কিন্তু হঠাৎ এই বারো দিনের ঘনিষ্ঠতায় বিনয় তাঁহার পুত্রের স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বিনয়ের মতো যদি তাঁহার একটি পুত্র থাকিত!

মনোরমার দুই একদিনেই আসিবার কথা আছে, ক্ষীরোদার ইচ্ছা, যাইবার পূর্ব্বে মনোরমাকে দেখিয়া যান। ক্ষীরোদা সুখময়ীর নিকটে সন্তোষের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় সকলি বলিলেন। হতভাগিনী জননী, কপালে করাঘাত করিতে করিতে প্রাণাধিক কন্যার নির্য্যাতন-কাহিনী সমস্তই শুনিলেন। ইষ্ট-দেবতার চরণে অনেক মাথা খুঁড়িয়া জামাতার মন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কুল-পুরোহিত, যিনি মনোরমার বিবাহের সময় গরদের জোড় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "বৌ-মা আমার কথা মিথ্যে হবে না,

তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে" তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি আসিলে, প্রণামান্তে তাঁহাকে সকলি জানাইয়া কহিলেন, "এখন কি উপায় করি বাবা? আমাদের ক্ষমতায় কিছু নেই, দেবতার কৃপা ভরসা মাত্র। আমার মনুর কপালে কি এই ছিল?"

"কেঁদো না মা" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া পুরোহিত কহিলেন, "গ্রহ দেবতার কোপে বোধ হয় এরূপ হয়েছে, আমি স্বস্ত্যয়ন কোরবো, তুমি আয়োজন করো, দেবতাকে প্রসন্ন করতেই হবে, মনুর মতো সুলক্ষণা মেয়ে কখনই কষ্ট পাবেনা, জামাই বাবাজীর মন ফিরাতে হবে।"

সুখময়ী সাহসে বুক বাঁধিয়া আয়োজন করিলেন. সকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সমারোহে স্বস্ত্যয়ন চলিতে লাগিল। পূজান্তে দুইজন নারী ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে দেবতার চরণে প্রণত হইয়া কন্যার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। বিনয় একদিন হাসিয়া কহিল, "মামীমা, আপনার দেবতার পূজার চাইতে বরং প্রত্যক্ষ শরীরী জামাই দেবতাটিকে দিন কতক নিয়ে এসে চা'ল কলার নৈবিদ্য খাইয়ে দেখুন.যদি লোভে প'ড়ে অন্য জিনিষের স্বাদ ভুলতে পারেন। সত্যি বলছি মামীমা, তাকে যদি দিন কতক এনে এখানে রাখতে পারেন, একেবারে কারো সঙ্গে না মিশতে পায়, মামাকে বলেছিলুম, তিনি তো রাজী নন্। সন্তোষের স্বভাবটা আমি বেশ জেনেছি, বড় দুর্ব্বল, আর বড় খামখেয়ালী।

সুখময়ী কহিলেন, আমাদের হাতে বাবা কোনো উপায় নেই, ভগবানের খেলার পুতুল আমরা, তিনি মুখ তুলে চান তো ভালই হবে, নইলে আর কি কোরবো? উনি তো বলুচেন মেয়ে একবার পেলে আর পাঠাবেন না, কিন্তু শুধু মেয়ে নিয়ে কি কোরবো, তার আখেরটাও তো দেখতে হবে? স্বামী যদি ফিরে চেয়ে না দেখলেন তবে আর জীবনটায় কি ফল?

বিনয় কিছু বলিল না, মনে মনে ভাবিল, এই যে অপূর্ব্ব বিধান, অবশ্য এ বিধান ভগবানের গড়া নয়, মানুষেরই তৈরি। স্বামীর ভালবাসাই যদি নারী জীবনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র অবলম্বন, তবে সেই সতী রমণীর প্রণয় কেন পুরুষও তেমনি বাঞ্ছনীয় মনে করে না? অথবা পুরুষ জানে, সে-টা তার নিতান্তই নিজস্ব পাওনা, তাই সে দিকটায় নিশ্চিন্ত থেকে উপরি পাওনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হায় রে উপরি পাওনা!

পুরাতন বৃদ্ধা দাসী দয়া, মনোরমা তার বড় আদরের সে মূর্খ স্ত্রীলোক,

সে বলিয়া বসিল, "আর অমন জামাইয়ে কাজ নেই মা, কোন্ দিন মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে হয় তো। মেয়েকে আগু নিয়ে এসো। আমাদের গাঁয় চাটুয্যেদের বাড়ী, মুখুয্যেদের বাড়ী গণ্ডা গণ্ডা ঝিউড়ী মেয়ে ছিল, তারা শ্বশুরবাড়ী তো কোনো কালে চোখেও দেখে নি, মাঝে মাঝে কচিৎ জামাই যদি আস্‌তো তো, তবেই সোয়ামীর সাক্ষাৎ পেতো।"

দয়ার কথায় সুখময়ী উত্তর দিলেন না। তাঁহার মাতৃস্নেহ বুঝিও এই কথাই বলিতেছে! কিন্তু কর্ত্তব্য? নারী হইয়া তিনি কেমন করিয়া নারীকে তাহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে সরাইবেন? ভগবান তাহার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন কেন? রমাকান্ত বাবু যখন কন্যাকে আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন কিন্তু সুখময়ীর প্রাণে বড় বাজিল। শ্বাশুড়ীর জন্য কন্যা আসে নাই, দু'একদিনে আসিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে। এইবার মাতৃ স্নেহের অভিমান হইল। স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তিকে কর্ত্তব্য যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে, কন্যার এ কর্ত্তব্যে জননী যতটুকু সুখী হইলেন কিন্তু ব্যথা যা পাইলেন, তুলনায় তাহাই বেশি হইল।

কন্যাকে তিনি সেই জন্যই অভিমান ভরে চিঠি লিখিলেন। মনু তার উত্তরে যা লিখিল, তাহাতে জননীর অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। মনোরমা লিখিয়াছে, "মা, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি, তোমরা একটুও ভেবো না। তোমরা মা হ'য়ে যে, এতদিন ধ'রে মানুষ ক'রে কেমন ক'রে একেবারে পর ক'রে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, তা তো আমি বুঝ তে পারি না, আমার সেই ময়ুরটা ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো তার পালকগুলা আমি আমার মুখে গায়ে বুলিয়ে আরাম পাই, তাকে আমি কত ভালবাসতুম, তা তো তুমি জানো মা, ছেলে-মেয়ে কে লোকে তার চাইতে ভালবাসে, আমি কিন্তু প্রাণ থাক্‌তে তাকে কাউকেও দিতে পারতুম না, মরে গেছে তাই হাত নেই। বাবাকে বোলো মা, তোমাদের পাগলী মেয়ে আবার শীগ্‌গীর তোমাদের কোলে ফিরে যাচ্ছে, তোমাদের কোল ছাড়া জগতে আর তার কোথাও ঠাঁই নেই, সেই কোলই তার স্বর্গের চাইতে বড়।" সুখময়ীর চোখের উপরে মনোরমার শৈশব-জীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি খেলাগুলি ভাসিয়া উঠিল, আদরিণী কন্যার অভিমান জননীর স্নেহধারাকে শতমুখে উৎসারিত করিয়া তুলিল, সাগ্রহে তিনি কন্যার আশা পথ চাহিয়া রহিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীসরসীবালা বসু।

ভক্তের তিরোধানে *

—o—

প্রথমাবস্থায় মানব-মনে ধর্ম্মভাব চিন্তার বিষয় হইয়া আসিয়াছিল। এই অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। বহুকাল এই অবস্থায় ধর্ম্মের সাধনা চলিয়া, মানব যখন বুঝিতে পারিল, ধর্ম্ম কেবল চিন্তার বিষয় নহে এবং তাহা বাহিরের বস্তুও নহে, তাহা তাহার নিজের ভিতরের—যাহা হইতে নিজে অভিন্ন, তখন সাধক সকল বিষয়ে, সকল অবস্থায় ধর্ম্মকে পাইবার কামনা করিল। এইখানে ভগবত-লীলার অনুভূতি—ভক্তির প্রকাশ। এই সূত্রটি ব্যক্তিগত জীবনেও প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

ভক্তিরস অত্যন্ত মধুর; মানব-চিত্ত তাহা পানাস্বাদে এতদূর মুগ্ধ হইয়া যায় যে, মানব যখন ভক্তি ধারণ করিয়া ভক্ত হন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ বলেন, "এই তো ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ভ্রান্তি মানব-চিত্তে যখনই যেখানে স্থান পায় তখনই সেখানে ইষ্ট-পথ সংকীর্ণ করে। জ্ঞানীগণ অন্ধভক্তির ভয়ে, ও-পথেই চলিতে নারাজ। অন্যথা ভক্তি-পথ প্রশস্ত পরিস্কৃত না থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাত্রিদলের সঙ্গে চলা-ফেরার সুবিধা হয় না।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিশ্বরাজ এবং তাঁহার শক্তি. এই দুয়ের স্বরূপ নির্দ্ধারণে অনেকে অনেক গোলযোগ ঘটাইয়াছেন, ঘটিবারই কথা, বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে? কিন্তু বিজ্ঞান-দর্পণে তাহা ধরা পড়িয়াছে। কর্ত্তা এবং ক্রিয়ায় ভেদও বটে, অভেদও বটে, কিন্তু ক্রিয়া হইতে কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ ইহাই সার সত্য।

মধুর ভক্তিরস পান করিয়া মানব ধন্য হন; ভক্ত-সম্মিলনে সেই ভক্তি আরো গভীর, মধুরতর হয়। ভক্ত-সম্মিলন ভগবানের ক্রিয়া, ইহার

---

* ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে লেখকের মনে যে ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহার রসাস্বাদনে "কুশদহর পাঠকপাঠিকাগণের যদি কাহারো কিঞ্চিৎমাত্রও চিত্ত-প্রসাদ বা আত্মার কল্যাণ হয়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। কয়েক মিনিট ধৈর্য্যধারণ করিয়া সকলে প্রবন্ধটি একবার পাঠ করেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ। প্রেরিত অভিভাবক ভক্তিভাজন, কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জীবনী কুশদহে দেওয়া হইল না এইজন্য যে, ইহার পাঠকপাঠিকাগণের অধিকাংশই তাঁহার সহিত পরিচিত নহেন; আর যাঁহারা পরিচিত এবং সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাঁহাদের জন্য "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকাদি আছে। দাস—

বিধান-ব্যবস্থা তিনিই করেন। তাঁহার কোনও রচনা সাতদিনে হয় না; তাঁহার রচনা অখণ্ড, প্রয়োজন মতে দেশে এবং কালে তাহার প্রকাশ। ধর্ম্ম-বিধান রচনা তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে-তত্ত্ব সুগভীর এবং মহত্তর; ভক্ত ভিন্ন কেহ তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে।

ধর্ম্ম-বিধান, দেশ-কাল ভেদে তাহার বাহ্যরূপে বৈচিত্র্য ঘটে; কিন্তু ভিতরের ভাবে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের সহিত ভক্তির মিলন আমাদের দেশে হইয়াছে। তাহার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য লীলাবিধানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাইতেছে, "যাহার চক্ষু আছে সেই দর্শন করিবে, যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করিবে।"

এখানে প্রথমে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিল, সাধনের জ্যোতিঃতে নবীন সাধক বংশ আকৃষ্ট হইলেন, দলবদ্ধ হইলেন, মধুচক্র রচিত হইল; ভক্তগণ ভক্তিরস সুধা পানে মত্ত হইলেন। পৃথিবীতে বিধান-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। তারপর মহাপ্রস্থানের ঘণ্টা বাজিল, প্রেরিতগণ একে একে কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন—ব্রহ্মানন্দের দল অন্তর্হিত হইলেন। ধরাধামে স্বর্গের ছবি লুকাইল। আজ প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির আসন শূন্য—ছিলেন কান্তচন্দ্র, তিনিও চলিয়া গেলেন।

ধর্ম্মবিধানের মধ্যে একের সহিত অন্যের সাদৃশ্য আছে; চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আর এক দিন এই বঙ্গে যে দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার সহিত ইহার একটি সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, সেই গৌরলীলাবসানে ভক্ত মণ্ডলীর কিদৃশ অবস্থা হইয়াছিল, তাহার আভাস প্রদান জন্য, ভক্তিভাজন চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত "ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

গৌর-লীলা সমাপ্তির পরবর্ত্তী অবস্থা

"চৈতন্য গোসাঞী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাজের কিদৃশ অবস্থা হয়, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি পুরী গৌড়দেশ বৃন্দাবন পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন। * * * * তখন গৌড়দেশ এবং পুরীর পথে চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রায় বারোমাসই গমনাগমন করিতেন; উৎকলবাসীরা ইহাঁদের দেখিলেই চিনিতে পারিত। শ্রীনিবাসের অপরূপ লাবণ্য, মনোহর ভক্তিভাব পথিকদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। পথি মধ্যে

যাহাকে দেখেন. তাঁহার নিকট তিনি পুরীর সমাচার জিজ্ঞাসা করেন; এইরূপে চলিতে লাগিলেন। কতক দূরে আসিয়া একদিন শুনিলেন, প্রভু লীলা সম্বরণ করিয়াছেন! এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে শ্রীনিবাস একবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃখেতে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন, কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এমন সময় স্বপ্নাদেশ হইল; "প্রত্যাগমন করিও না, নীলাচলে যাও, তথায় গদাধরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রীনিবাস তদনুসারে পুরীতে উপস্থিত হন, এবং স্থানে স্থানে ভক্তবৃন্দের শোকক্লিষ্ট মলিন মুখ দর্শন করেন। পণ্ডিত গদাধরের বাসায় গিয়া দেখিলেন, তিনি প্রভুশোকে নিরন্তর হা-হাকার করিতেছেন. বর্ণ মলিন, দুই চক্ষে অজস্র বারিধারা বহিতেছে, তথাপি শ্রীনিবাসকে পাইয়া পণ্ডিতের চিত্ত কিয়ৎপরিমাণ শান্তি অনুভব করিল। তারপর শ্রীনিবাস বসুদেব সার্বভৌমের বাসায় গিয়া দেখেন যে, তিনি রামানন্দের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর বিরহ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাইতি, মাধবী মাইতি, কানাই খুঁটিয়া স্বরূপ, পরমানন্দ সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসায় বসিয়া কাঁদিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গৌর শোকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, রঘুনাথ দাসও শোকে মুহ্যমান হইয়া বৃন্দাবন প্রস্থান করিয়াছেন, সকলেই যেন একবারে আচ্ছন্ন। সেই দুঃখের সময় ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন।

তদনন্তর আচার্য্য নিবাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নবদ্বীপ দর্শনে যাত্রা করেন। পথে আসিতে আসিতে শুনিলেন. নিতাই অদ্বৈত প্রভুও অদর্শন হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার শোকানল, আবার প্রদীপ্ত হইল। আচার্য্য নবদ্বীপ পৌঁছিয়া দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষীণ মলিন দেহে দিন রাত্রি যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। চক্ষে নিদ্রা নাই. অহর্নিশি পতিশোকে আকুল, ভূমিশয্যায় শয়ন, সোণার অঙ্গ ধূলায় মলিন হইয়া গিয়াছে।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিবাসের নয়নানন্দকর রূপ এবং অপূর্ব্ব ভক্তি প্রেম সন্দর্শনে অতিশয় পরিতৃপ্ত হন। তৎকালে মুরারী গুপ্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, গদাধর দাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয় প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। শচীমাতা ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগত হন। নবদ্বীপের তাৎকালিক শোভা সৌন্দর্য্য লোকসমারোহ, ধর্ম্মভাব, কীর্ত্তনোৎসাহ দেখিয়া আচার্য্যের মন মুগ্ধ হইয়াছিল।

নবদ্বীপ হইতে আচার্য্য শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর পত্নী

স্ত্রী ও সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সেখানেও দেখিলেন অদ্বৈতের অদর্শন শোকে পারিষদবর্গ রোদন করিতেছেন।

অনন্তর তিনি খড়দহে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় নিত্যানন্দর বিধবা পত্নীদ্বয় এবং বীরভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় জাজিগ্রামে চলিলেন। তৎপর নানা স্থানের ভক্তগণের অনুমতিক্রমে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রূপসনাতনের পরলোক গমন বার্ত্তা শুনিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, ভুগর্ভ আচার্য্য, হরিদাস আচার্য্য, রাঘব, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান ভক্ত জীবিত ছিলেন। ইহাঁদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাসের চিত্ত কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করে। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি গোপালভট্টের নিকট দীক্ষিত হন, এবং শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এখানেও দেখিলেন গৌর নিতাই, অদ্বৈত এবং রূপ সনাতনের শোকে সকলে অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন, কেহ বা পাগলের ন্যায় পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ভক্তি শাস্ত্র প্রচারের ভার শ্রীনিবাসের উপর অর্পিত হয়, তাই তিনি বিশেষ যত্নের সহিত গোস্বামীগণের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

দাসের আত্ম-কথা

—o—

পরীক্ষা ও অশান্তি,—পশ্চিম অঞ্চলে গমনের কথা গতবারে বলিয়াছি; কিন্তু কি রকম মনের অবস্থা লইয়া গেলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে।

যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় নন্দরাম সেনের গলিতে বাসা করিয়া সংসার পাতা হইল, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মুদীখানা দোকান করা হইল, ঠিক সে স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মভাব রক্ষা হইল না, সত্য-নিষ্ঠাও বহু পরিমাণে ভাঙিয়া গেল। অবশ্য ইহা অবস্থা-চক্রে পড়িয়াই হইল। তজ্জন্য অন্তঃকরণে আঘাৎ লাগিয়া চিত্তের প্রসন্নতা চলিয়া গেল।

দোকান পত্তনের অব্যবহিত পরেই এই মনভঙ্গের সূচনা, তাহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। দোকান বন্ধের পরেও এই অশান্তি ঘনিভূত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের হৃদয় নিজের কাছেই বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুদ্র সংসারটির মধ্যেও শান্তি ছিল না। যে আদর্শে সংসার করা উচিত ছিল -ইচ্ছাও ছিল, সংসারের সহায়কারিণী ভগিনিটি তাহা বুঝে নাই—সে ভাবে গড়েও নাই, এখন ইচ্ছা করিলেই সে আদর্শের সংসার পাইব কেন? তার উপর এই নূতন পরীক্ষা সুতরাং প্রাণে যে টুকু ভাব-ভক্তি জমিয়াছিল, তাহা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। তাই অন্তরে বাহিরে অশান্তির আগুণ জ্বলিতেছিল। কিন্তু ছিল কেবল ভগবানের করুণা; তাঁহার কৃপাতেই সে-কথা ভুলিতে পারি নাই। এইখানে একটি ঘটনার কথা বলিয়া তাঁহার করুণা এবং বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাই।

এই সময় আমাদের বাসার নিকটেই পূর্ব্ববঙ্গের একটি কবিরাজ ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন; বয়ক্রম তখন তাঁহার অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। তিনি আমাদের দোকানের সাইনবোর্ডখানি খরিদ করিতে আসেন, এই সূত্রে, আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, বিধাতার সৃষ্টির কি এক নৈসর্গিক নিয়মে অনেক সময় সহজেই একে অন্যের সহিত পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া পড়েন, অবশ্য এই মিলনের মধ্যে পার্থিব এবং অপার্থিব দুইটি ভাবই থাকে। যেখানে কিছু অপার্থিব ভাবের সমাবেশ ঘটে, সেখানে ফল মধুর হয়। এই অপার্থিব বা পবিত্রভাবের সমাবেশ মানব মন-বুদ্ধির অতীত। যাহা হউক নন্দরাম সেনের গলিতে কবিরাজ মহাশয়ের বাসা তখন আমার পক্ষে একটি শান্তির স্থান হইয়াছিল। এখানে যে কয়েকটি ভদ্রলোক সর্ব্বদা আসিতেন, বসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে এবং প্রধানতঃ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কেবল সৎপ্রসঙ্গই হইত। কেন জানি না, সকলেই যেন আমার কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। তাহাতে অনেক সময় আমার মনের চেতনা-বোধ জাগ্রত হইত। অশান্তি অনেক দুরীভূত হইত। ঈশ্বর-কৃপায় কবিরাজ মহাশয়ের সহিত আজো প্রাণের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি আমার জীবনের অনেক সুখ দুঃখ এবং উত্থান পতনের সাক্ষী।

ও-দিকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব বিশেষতঃ পরম হিতৈষী বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়, ভক্তিভাজন অবিভাবক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রভৃতি আমার

সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা এখন অনেকটা সত্য হইল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের কথা লইয়া পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের সহিত আমার আলোচনা হয়, তাহাতে বিনয় বলে, "নন্দরাম সেনের গলিতে বাসা ও দোকান না করিয়া ভক্তিভাজন কান্তিবাবুর পরামর্শ মতো তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া পটলডাঙ্গা অঞ্চলে বাসা ও দোকান করিলে ঘটনা এ রূপ হইত না।" কিন্তু যখন দেখি, মানবজীবনের গূঢ়রহস্যে একটির সঙ্গে অন্য ঘটনাটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন অবাক হইতে হয়; যখন দেখি এই গুরুতর পরীক্ষায় না পড়িলে আমার পরবর্ত্তী জীবনের বিষয়গুলি তেমন পরিস্ফুট হইতে পারিত না, তখন সকল মিমাংসা সহজেই হইয়া যায়। জীবন জীবনদাতা বিধাতার সঙ্গে সংযুক্তভাবে দর্শন করিতে পারিলে সকল ক্ষতিপুরণ হইয়া যায়। কোন অভিযোগ অবিশ্বাসও থাকে না। মঙ্গলময়ের কৃপা-হস্ত সকল অবস্থায় দেখিয়া জীবন ধন্য হয়, নতুবা জীবন, জগত, সংসার সকলই অন্ধকারময়।

বিনয়ের উপরোক্ত কথায়, কিন্তু আমার মনে হইয়াছে যে, এই ঘটনায় তাহার আভ্যন্তরিক জীবনের ক্ষতি হইয়াছে। সরল শান্ত বালক-জীবন, সাধু ভক্তের সৎ সংসর্গে যে গঠন হইতেছিল, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মের গূঢ় ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না। পারিলে সুখীই হইত। ইহাতে আমার যে ত্রুটি ছিল, তাহারও কি ফল ভোগ করিতে হইল না? তবে আমার ক্ষতিপুরণের দিক ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইলাম। তাহার জীবন যে টুকু সুগঠিত হইয়াছে তাহা সেই অল্পকালেরও সাধু সঙ্গেরই ফল মনে করিয়া আপাতত আশস্ত হইয়াছি, আর তাহার সমস্ত ভবিষ্যত বিধাতার হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

পশ্চিম মোকামে যাইতে বঙ্কুবাবুর সঙ্গে যখন কথা স্থির হইয়া গেল, তখন মনে হইতে পারে আপাতত এখানকার অশান্তি হইতে তফাৎ হইতে পারিলাম, কিন্তু আমার সে রূপ মনে হয় নাই, বরং এই অসহায়, বিশৃঙ্খল, অশান্তির অবস্থায় অশান্তমনা ভগিনি, বিকলাঙ্গিনী পত্নী, পাঠ্যবস্থ বালক পুত্র, আর একটি একেবারেই শিশু, ইহাদের রাখিয়া সুদুর দেশে অন্ততঃ একবৎসরের জন্যও যাইতে চিত্ত আরো খিন্ন হইয়া উঠিল। যতদুর স্মরণ আছে তাহাতে মনে হয় তখনও মন হইতে নির্ভরের ভাব চলিয়া যায় নাই, তাই এ অবস্থাতেও মন প্রস্তুত হইয়া গেল, নিশ্চিন্ত ভাবেই গমনে উদ্যত হইলাম।

এখানে আর একটি উপকারী (তিনি এখন পরলোকে) বন্ধুর উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য মনে করি।

সরল কুমার যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অনেক কষ্টে স্বষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তাহার মাতৃস্তন্য যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অশক্তাবস্থা বশত নিয়মিত স্তন্য দানে অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। এ অবস্থায় গো-দুগ্ধই পান করাইতে হইত। কিন্তু সেই সময় তত্রস্থ সুবিজ্ঞ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, বাবু শ্যামলাল বসু মহাশয় শিশুকে কলিকাতার গো-দুগ্ধ পান করাইতে একেবারেই নিশেধ করেন; তৎপরিবর্ত্তে পর্য্যাপ্তরূপে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উত্তম বার্লি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে আদেশ করেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের মন প্রস্তুত করিতে অনেক উপদেশ দেন; ইহাতে শিশুরস্বাস্থ্য রক্ষার সুফলই হইয়াছিল। এবং অবিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যয় ভার হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া আজকার মত বক্তব্য শেষ করিব। বিদায়কালে আমার স্ত্রী তাঁহার সাহায্য এবং শিশুর পালন কার্য্য ছাড়িয়া দীর্ঘদিনের জন্য আমি দূরদেশে যাইতেছি বলিয়া তেমন কোন আপত্তি করেন নাই। বরং অনেকটা প্রসন্ন মনেই বিদায় দিয়াছিলেন বলিয়াই স্মরণ হয়। কিন্তু গমনের ২৷৩ দিন পূর্ব্ব হইতে বার বার আহ্বান করিয়া এক একটি সামান্য এ-কথা সে-কথা বলা আর প্রয়োজনীয়, সামান্য সামান্য জিনিষগুলি কিনিয়া দিতে বার বার সে-কথা বলা দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরে বুঝিয়াছিলাম এ-গুলি তাঁহার ইহলোকের চিরবিদায়ের ভাবাত্মক। অবশ্য তাহা আমিও যেমন তখন বুঝি নাই, তিনিও তাহা বুঝেন নাই যে, এই আমাদের ইহলোকের শেষ দেখা শুনা।

বিবিধ

—০—

উপবাসের উপকারিতা—উপবাসের কথা শুনিলে অনেকেই মুখ বিকৃত করেন, অনেকে প্রকাশ্যে না হউক মনে মনে চমকাইয়া উঠেন। এবং উপবাসের কথা উঠিলেই প্রায় সকলেই বলিয়া উঠেন "উপবাসের কথা আর হিন্দু মুসলমানকে শিখাইতে হইবে না, যে সমাজে বারমাসে তের

পার্ব্বণ, যেখানে বার-ব্রতানুষ্ঠান নিত্যকর্ম্ম —যে মুসলমান সমাজে রোজা পালন অবশ্যকর্ত্তব্য সেখানে আর ও-কথা কেন? কিন্তু কাযে কি দেখা যাইতেছে? অনিয়মিত ভোজন অতিভোজনের ফলে যে কত রোগ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কে পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত? মিতাচারী ভিন্ন মিতাচারের সমাদর কে করে?

সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের "খাদ্য" পুস্তকের নব সংস্করণ হইতে "উপবাসের উপকারিতা" সম্বন্ধে একটি সারবান্ প্রবন্ধ শ্রাবণের "স্বাস্থ্যসমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে; আরো অন্যান্য পত্র পত্রিকায় আজকাল বিশেষভাবে এই সকল বিষয় আলোচিত হইতে দেখা যাইতেছে, ফলতঃ এই আলোচনা যত হয় ততই ভাল। আমরা স্বাস্থ্যসমাচারের উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু সার কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, "উপবাস ধর্ম্মসাধনের অনুকূল কিনা তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপবাসের উপযোগীতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।"

আমরা বলি সাধক ভিন্ন উপবাস এবং মিতাচারের মহৎ উপকারিতা সাধারণে কখনই বুঝিবেন না। আত্মার সাধনাই যাঁহার লক্ষ্য তিনিও শরীর ও মনকে উপেক্ষা করিতে পারেন না আত্মা, মন, শরীর,একযোগে এ তিনের সাধন ব্যতীত একের অভাবে অন্যের সাধনে বিঘ্ন হয়। স্বাস্থ্য সুখ-সম্ভোগ করাও ধর্ম্মেরই অঙ্গ।

"প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহ-পুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (Toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, পেট-বেদনা, বমন, উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি নানা রোগের একটি কারণ—অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের বিকার। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অম্লশূল,

মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায়—উপবাস। আমরা আহার বিষয়ে যত সাবধানই হই না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় যত অল্পপরিমাণ আহার গ্রহণ করি না কেন, আমরা অধিকাংশ সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। অনেক স্থলে মোটের উপর খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত না হইলেও বিভিন্নজাতীয় খাদ্যের মাত্রা আমরা ঠিক রাখিতে পারি না। হয় ত ভাত মিষ্টান্ন (শর্করাজাতীয় খাদ্য) অল্প খাইয়া ঘি মাখন (মাখনজাতীয় খাদ্য) অধিক গ্রহণ করি, অথবা মাছ মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অনিয়মের বশবর্ত্তী হই। কোনও এক জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে তাহা পরিপাক না হওয়ায় উহা হইতে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং বাত রোগ (Rheumatism, gout), পাথরী রোগ (Gravel), বহুমূত্র রোগ (Diabetes) প্রভৃতি নানাবিধ অজীর্ণঘটিত রোগ জন্মিয়া থাকে।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

---০---

গতবারে পুরাতন বাগান সংস্কার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহাতে আমরা কাহার কাহার সায় পাইয়াছি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "পুরাতন গাছ কাটিয়া জমিতে কিছুদিন বাতাস রৌদ্র খাওয়াইয়া, সার দিয়া তারপর নূতন ফলের গাছ সকল বসানো উচিত।" ফলতঃ যদি এই প্রণালীতে গ্রামগুলি ফাঁকা করা যায়, তবে স্বাস্থ্যের পক্ষে যে একটা বিশেষ উপকার হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেশ হইতে সর্ব্বনাশী ম্যালেরিয়া দূরের জন্য পুরাতন বাগানের স্বত্বাধিকারী ২।৫ জনও কি এই সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন পথে অগ্রসর হইতে পারেন না ?

গত ২২শে শ্রাবণের "বাঙ্গালী"তে 'গোবরডাঙ্গার বাজার'সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে পত্র প্রেরক দেখাইতেছেন, গোবরডাঙ্গার বাজারে চাঁদনী না থাকায় রৌদ্র বৃষ্টিতে ক্রেতা বিক্রেতাদিগের

বিশেষ অসুবিধা হয়। এখানে প্রতি বৎসর বারোয়ারির জন্য অনেক ব্যয়হয়, একবৎসর এই ব্যয় বন্ধ করিয়া চাঁদনী প্রস্তুত করিলে,তাহাতে একদিকে যেমন সাধারণের কষ্ট দূর এবং বাজারের উন্নতি হইবে,তেমন বাজারের অনেক আয় বৃদ্ধিও হইবে। ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমরাও বলি, গোবর-ডাঙ্গা একটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত, এবং সুবিখ্যাত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমীদার এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের বাসস্থান। যদিও ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তথাপি এখনো কুশদহের মধ্যে গোবরডাঙ্গা ভদ্রমণ্ডলী বসতিপূর্ণ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে চাঁদনী শূন্য বাজার থাকা উচিত নহে। ইতিপূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বারোয়ারির ব্যয় সঙ্কোচ (একেবারে বন্ধ না করিয়া সঞ্চিত অর্থে দেশের অনেক অভাব পূরণের প্রস্তাব "কুশদহ"তে করিয়াছিলেন. কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাতও করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস গোবরডাঙ্গার-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এবং জমিদার ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ একই ব্যক্তি রায় বাহাদুর মহোদয়; তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন নহে।

গোবরডাঙ্গাগ্রাম মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডুর বাটীতে একটি বালক-বালিকা পাঠশালা আছে। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার তাহার শিক্ষক। পাঁচ বৎসরাধিককাল এই পাঠশালা চলিতেছে। বালক-পাঠশালার জন্য গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটী মাসিক সাহায্য করেন। বালিকাদিগের স্বতন্ত্র ঘরে শ্রেণী (ক্ল্যাস) আছে। অনূ্যন ২০টি বালিকা উপস্থিত হয়, নিম্নশিক্ষাও সন্তোষজনক বলা যায়, ও বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা অসচ্ছল নহে, তথাপি ইহাতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কিছু নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা এ-বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মাটীকোমরা নিবাসী স্কুল সাবইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুষ্টিয়া হইতে লিখিয়াছেন,—"মাটীকোমরা নিবাসী পরলোকগত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান বর্ষে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।



প্রেরিত অভিভাবক

স্বর্গগত কান্তিচন্দ্র মিত্র।

জন্ম—ভাদ্র, ১২৪৪ সাল। স্বর্গারোহণ—৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

কুশদহ

. "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২৪ { ষষ্ঠ সংখ্যা।

দাসের প্রার্থনা

—o—

মা, তোমার যখন কোন নাম নেই, অথবা অসংখ্য তোমার নাম, তখন তোমাকে মা বলে ডাকাই তো ভাল! মা নামই তো চুড়ান্ত নাম।

মা, তুমি তো জগতের মা, তবে জগতের কেন এমন দুর্দ্দশা হ'লো? ইহার একটি সহজ সরল উত্তর তোমার কাছে চাইছিলাম। মা, তুমি কৃপা কোরে ভক্ত কান্তিচন্দ্রের জীবনের ভিতর দিয়ে সেই উত্তর দিলে। তুমি দেখালে তোমার বিধি জীবনে স্বীকার না ক'রলে কেহ তোমাকে পায় না। যা তুমি কেড়ে নিয়েছ—যা তুমি দাও নাই, তাহা আর চাইব না, আমাকে যা দিয়েছ, আমার জন্য যে ব্যবস্থা করেছ, তার তাৎপর্য্য বুঝে, তাতেই খুব আনন্দিত হবো। এইখানেই তোমার সঙ্গে, জীবের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে বিরোধ মোচন। মা তুমি সর্ব্বজ্ঞে, তুমিই জান আমার কিসে মঙ্গল, কিসে কল্যাণ। কিন্তু তাহা আর কেহ জানে না, তুমি যা করো তাহা স্বীকার না কোরে কেবল তোমার সঙ্গে জীবের সঙ্গে ও নিজের সঙ্গে বিরোধ ঘটে, তাতেই যত দুর্দ্দশা। মা তুমি জগতের দুর্দ্দশা অবসানের দিন পৃথিবীতে আনয়ন করো। মা আমাকে শুভমতি দাও। তোমার বিধান এই মলিন অধম জীবনে দেখে খুব সুখী হই, আর ঐ কথাই যেন আমার দেশবাসীকে বলতে বলতে ইহ জীবন শেষ করতে পারি। মা তুমি আমার দেশবাসীকে শুভমতি দাও।

———

প্রেরিত আত্মভাবক
ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র

ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে গতবারে লিখিত "ভক্তের তিরোধানে" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ সন্তোষ প্রকাশ করায় এবং মিত্র মহাশয়ের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সুগম্ভীর ব্রহ্মোপাসনাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে লেখকের মনে যে সদ্ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার আভাষ "কুশদহে" প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য বোধে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। কান্তিচন্দ্র সাধারণ মানবের ন্যায় পাপ-তাপ মলিনতার মধ্য দিয়া জীবন-পথে কিরূপে, কোন্ সূত্রে এত উচ্চাবস্থা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের একটি অত্যাশ্চর্য্য সঙ্কেত—অথবা বিধাতার অদ্ভুত লীলা-বিধান! মনে হয়, তদ্বিবরণ পাঠে অনেকেই উপকৃত হইবেন; বিশেষতঃ বিধাতা তাঁহার ভক্ত-বিশ্বাসী সন্তানগণের মধ্যে কাহার সঙ্গে কি ভাবে লীলা করেন—কি সূত্রে, কোন্ পথে কাহাকে, তাঁহার করুণা আসিয়া তাঁহার দিকে লইয়া যায়, সাধকমাত্রেই তাহা জানিতে অভিলাষ করেন। সকলেই অনুগ্রহ করিয়া একবার ধীরভাবে প্রবন্ধটি পাঠ করেন ইহাই দাস লেখকের বিনীত অনুরোধ।

কান্তিচন্দ্রের নিজ মুখের কথিত "ভৃত্যের আত্মপরিচয়" প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন;—

"আমি কে তা আপনারা সকলে জানেন না। এখন আমি আপনাদের কাছে যে ভাবে পরিচিত, যে ভাবে সম্মানিত ও স্নেহের পাত্র হইয়াছি, এ সব দেখে বা শুনে আমার যথার্থ পরিচয় পাইবেন না; এখনকার আমি পরিবর্ত্তিত আমি, আসল আমি একজন অজ পাড়াগাঁয়ের অসভ্য জঙ্গুলে লোক। পল্লীগ্রামের যত সব দোষ দুর্ব্বলতা কদর্য্যভাব হইতেই আমার আগমন। মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশে আমার জন্ম হইলেও সঙ্গদোষে সে বয়সে যতদূর পতন হইবার সম্ভাবনা, প্রায় সেই সকল দোষ সমূহ আমাকে মলিন ও কলুষিত করিয়াছিল।"

বর্ত্তমান সময়ের ৮০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৪৪ সালের ভাদ্রমাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ উলাগ্রামে কান্তিচন্দ্রের জন্ম, স্বর্গারোহণ ১৩২৪ সালের ৪ঠা ভাদ্র। পিতার নাম স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। ইঁহারা চারি সহোদর, তন্মধ্যে ইনি

তৃতীয় ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্ব কনিষ্ঠের একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। কান্তিচন্দ্রেরও বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। সেকথা ক্রমে প্রকাশ পাইবে, তিনি যে বার সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় আসেন,তখনকার কথা বলিতেছেন ;—

"দশ বৎসর বয়সে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্তৃক কলিকাতায় আনিত হই। এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যোপার্জ্জন স্পৃহা বলবতী হয়। বিধাতার অনুগ্রহে স্কুলের ছাত্রদের সহিত বিশেষ বন্ধুতা জন্মে। তাঁহাদের সঙ্গে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের উৎসাহে তখনকার ভবানীপুর "সত্য জ্ঞান সঞ্চারিণী সভায়" যাতায়াত আরম্ভ করি। সেইখানেই মহর্ষিদেবের প্রথম দর্শন পাই। তিনি প্রতি সপ্তাহে আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতে আসিতেন, আমরা এক একটি রচনা লিখিয়া সেখানে পাঠ করিতাম, জীবনের সে সময়টি বড়ই সুখের ছিল।"

তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"যে বার দেশে ভয়ানক মহামারী ম্যালেরিয়া হয়,সেইবার দাদার সঙ্গে পূজার ছুটীতে বাড়ী গিয়া কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখিলাম। চারিদিকে মহামারীতে গ্রামের অধিকাংশ লোক মরিয়া গিয়াছে। সকল ঘরেই অত্যন্ত জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব, এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীতে শোকের কান্না উঠিতেছে না। * * * পূজার কয়েকদিন দেশে থাকিয়া দাদা পিতাঠাকুর প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।"

ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া কলিকাতায় আসিয়াও তাঁহারা নিস্তার পাইলেন না, জ্বর ভোগ করিয়া ক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও পিতাঠাকুর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, নিজেও পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, দুর্ব্বল শরীর ও মনের উপর প্রবৃত্তির অধিকার কিরূপে হইল, তখনকার কথা তিনি বলিতেছেন ;—

"রোগে ভগ্ন শরীর, শোকে ভগ্ন হৃদয়, পড়া শুনা ভাল হইল না ; প্রায় দুই বৎসর এইভাবে কাটার পর স্কুল ছাড়িয়া একটি জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের বাসায় আসিলাম। সেখানে তাঁহার বাসায় রন্ধন করি, আর ঘরে বসে কিছু কিছু পড়ি ও কর্ম্ম কার্য্যের চেষ্টা দেখি। অবশেষে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের আফিসেই ১৫৲ টাকা বেতনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হই। জীবনের এই সময়ে একটি ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তখন আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর, পিতামাতা শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, বিধবা ভ্রাতৃবধূ অনাথিনী, অবগণ্ড অষ্টম বর্ষীয়া ভ্রাতৃকন্যা পিতৃহীনা, রোগে শরীর ক্ষীণ, অর্থের অত্যন্ত অভাব, অন্যের বাটীতে দুবেলা

করিয়া যাইতেছি, এমন দেশুক দুঃখের সময়েও আমি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া বিপথগামী হইলাম। কিরূপে যে বিপথগামী হইলাম তাহা ভাবিয়া পাই না। যাঁহার সঙ্গে ছিলাম, তিনি সাধুচরিত্র, কিন্তু পল্লীটা ভাল ছিল না। ভদ্রলোকের বসতি খুবই অল্প, যাঁহারা ভদ্রলোক তাঁহাদেরও চরিত্র ভাল নয়, কতকগুলি কুসঙ্গী আসিয়া আমার দুর্ব্বলতার সহায় হইল, কি যে হইয়া গেলাম এখন স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়।"

তারপর তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"একদিন আমাকে ডাকিয়া আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র অতি শান্তভাবে আমার পতনের কথা বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন. তাঁহার বাক্যে আমার হৃদয় শেল বিদ্ধ হইয়া গেল, আমি তাঁহার সাক্ষাতে খুব খানিক চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলাম, আমাকে আর বোলো না, আমার ভ্রম, আমার পতন আমি বুঝিয়াছি।"

যাঁহারা পাপ দুর্ব্বলতার কথা সহজেই বুঝিয়া অনুতপ্ত হন এবং চিরদিনের জন্য পাপ পথ পরিত্যাগ করেন. তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্. কিন্তু হায়, সহস্র সহস্র মানুষ একবার পাপে জড়িত হইয়া সারা জীবন তাহাতেই অবসান করে. তাহাদের বিবেক এরূপ মলিন হইয়া যায় যে, আর যেন পাপ-বোধ পর্য্যন্ত থাকে না। অনুতাপী কান্তিচন্দ্র কি বলিতেছেন শুনুন ;—

"কি শুভক্ষণে আমার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য আমার হিতকারী আত্মীয় আমাকে ভৎর্সনা করিলেন বলিতে পারি না। এ সব ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই একজনের হাত ছিল, আমি এখন তাহা অনুভব করিতেছি। এই আফিসে অল্প বেতনে কার্য্য আরম্ভ করি, ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ৪৫৲ টাকা হইয়াছিল। আফিসের কার্য্যে যোগ দিবার কিছুদিন পরেই আমি ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত ক্রমেই পরিচিত হই। তাঁহাদের সঙ্গে আমি আচার্য্য (কেশবচন্দ্রকে) দর্শন করিতে যাই, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গতে ও সমাজে যাইতে আরম্ভ করি। ক্রমে আমার পাপ প্রবৃত্তি আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এই সময় মধ্যম দাদা এবং আমি বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি।"

ইহার পরবর্ত্তী অবস্থার কথা তিনি বলিতেছেন ;—

"ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিয়া উপাসনায় রুচি জন্মিল। ক্রমে নানা স্থানে উপাসনালয় স্থাপিত হইল, আমিও সেই সকল সমাজে যোগ দিতে লাগিলাম, পরিশেষে এক একটি সমাজের কার্য্যভারও আমার মস্তকে পড়িল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! ক্রমে ব্রাহ্মবন্ধুরাই আমার আত্মীয় হইলেন, আমি সপরিবারে কোন বন্ধুর (ঘোড়পুকুর নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ) বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠতা

জন্মিল যে শুধু বাহিরের কেন, ঘরের লোকও আমাকে অবিশ্বাসীর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মের পরিবার কি সুখের পরিবার, এখানেই সত্য সত্য পর আপনার হইয়া যায়। বন্ধুর মা, ভাই, পুত্র, কন্যা সকলেই আমার আপনার। বন্ধুর টাকা আমার টাকা, আমার টাকা বন্ধুর টাকা, আমার যা, তা বন্ধুর, বন্ধুর যা তাহা আমার। কি মিষ্ট সম্বন্ধ। রক্তের কোন প্রকার সংস্রব না থাকিলেও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সত্যই পর আপনার হইয়া যায়, জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিলাম। সুখে দুঃখে সকল সময়েই আমরা এক হইয়াছিলাম। একদিন দুদিনের জন্য নয়, কয়েক বৎসর ধরিয়াই আমরা এইভাবে পারিবারিক আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম।"

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রচারে যাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের সংসারভার গ্রহণ করিয়া যিনি দীন-সেবকের ব্রতগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে কি বিধাতা ক্ষুদ্র সংসারে আবদ্ধ রাখিতে পারেন? সংসারী জীব যে ঘটনাকে শোক বলে, সেবকের পক্ষে তাহা বন্ধন-মুক্তির কারণ হইল। সে ঘটনার কথা শুনুন,—

"বৌবাজারের মলঙ্গা নামক পল্লীতে একটি বাটী ভাড়া করিয়া আমি ও আমার আরো দুইটি ব্রাহ্ম ভ্রাতা সপরিবারে সেই বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যাওয়ার ২।৩ দিন পর আমার মধ্যম ভ্রাতৃবধূ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই পল্লীতে তখন ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছিল, এ সংবাদ আমরা কেহই জানিতাম না। বন্ধুরা পরিবারদের অন্য স্থানে রাখিলেন, এবং আমার স্ত্রীকেও অন্য স্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই দিদিকে ছাড়িয়া যাইবেন না বলায়, নিরুপায় হইয়া তিনি এবং আমার সব বন্ধুবর্গ সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করিতে লাগিলেন। ৪।৫ দিন পরেই আমার স্ত্রীও ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন আর তাঁহার দিদির সেবা করা হইল না, তাঁহাকে অন্য এক ঘরে রাখিয়া বন্ধুরা তাঁহারও সেবা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সাত দিন সাত রাত্রি রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মধ্যম ভ্রাতৃবধূ বৈধব্য ও অন্যান্য সমুদায় কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। আমার স্ত্রীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ, জ্ঞানশূন্য, সুতরাং এ ঘটনার বিষয় তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। আমাকে রাত্রিতে রোগীর নিকট রাখিয়া বন্ধুরাই মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া আসিলেন। তাঁহারা যে সে সময় আমার কি উপকার করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিলে প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। মধ্যম ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর ৩।৪ দিন পরেই আমার স্ত্রীও দেহ ত্যাগ করিলেন। আচার্য্য (কেশবচন্দ্র) এই সংবাদ পাইয়াই আমাদের (বাসায়) সদলে আসিয়াছিলেন এবং উপাসনা আর্দ্ধনা করিয়া আমার তাপিত প্রাণে শান্তি দিয়াছিলেন। এই আমার সংসারের শেষ কার্য্য।"

তারপর আর একস্থানে বলিতেছেন ;—

"যাঁহাদের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হইত তাঁহারা মৃত্যু কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, তখন আর কার জন্য পরাধীন ভাবে চাকরী করিব, এই চিন্তা আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের দিকে টানিয়া আনিল। ঘর নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, আহা করিবার—চক্ষের জলের সঙ্গে জল মিশাইবার লোক যখন আর কাহাকেও পাইলাম না, তখন ঘুরিতে ঘুরিতে কলুটোলার সেন মহাশয়দের প্রকাণ্ড বাড়ীর ভূতল গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট লোক মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাস করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই দয়া পরবশ হইলেন, আমার দুঃখের কথা শুনিয়াই বলিলেন ভাবনা কি, একটি আফিস আছে, সেখানে কয়েকটি যুবক বাস করেন, তুমি যাইয়া সেখানে কাজ কর ; আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহার পানে খানিকক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহার দয়াতে মোহিত হইয়া গেলাম। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আমি যে নিজে কিছুই জানি না, সে আফিসে আমার মত লোকের কি কাজ আছে? সে কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমিতো যাও, যাহা করিতে হইবে পরে জানিতে পারিবে। তাঁহার ভাবে কথায় তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইল। তাঁহার আজ্ঞা মত আমি আফিসে যাইয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, মহেন্দ্রনাথ, গৌরগোবিন্দ ও (উমানাথ) প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।"

"বিধাতার ইঙ্গিতে বিধানের দল তৎপূর্ব্ব হইতেই গঠিত হইতেছিল। ইঁহারা সকলেই আমাকে চিনিতেন, আমার স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে ইঁহারা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা সকলেই দুঃখিত। কিন্তু তাঁহাদের তখনকার অবস্থা দর্শন করিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল। দেখিলাম তাঁহাদের অন্যকার খাইবার কিছু সংস্থান নাই, মলিন বেশ, থাকিবার স্থানেরও খুবই কষ্ট ; কিন্তু দুঃখের ভিতরে সকলেই কেমন সদানন্দ। কোন প্রকার ভাবনার চিহ্ন তাঁহাদের মুখে দৃষ্ট হয় না। কাল কি খাইবেন সে চিন্তা তাঁহাদের আসে না। কোথায় কি জুটিবে কিছুরই স্থিরতা নাই। দেখিলাম, প্রাতে উঠিয়া সকলেই স্নান করিলেন, আমাকেও স্নান করিতে বলিলেন ; স্নানান্তে সকলেই মিলিত হইয়া কলুটোলায় আচার্য্যদেবের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পরই উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা, প্রার্থনা, গান প্রভৃতি চলিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল, উপাসনা শেষ হইল ; আচার্য্যদেব আহার করিতে বাটীর ভিতর গেলেন। বৈরাগীর দল একটা খোলা কাঠের বাক্স হইতে কয়েকটি পয়সা লইয়া নিকটস্থ মাধববাবুর বাজার হইতে চাউল, কাঠ, সামান্য কিছু তরকারী এবং সামান্য কিছু লবণ তৈল খরিদ করিয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। বাড়ী এসেই নিজেরাই উনান ধরাইয়া একটি হাঁড়ি চড়াইয়া দিলেন, জল গরম হইলে বাজার হইতে যে চাউল তরকারী এনেছিলেন, তাহা সবই হাঁড়িতে দিলেন, খানিকক্ষণ পরেই এক হাঁড়ি ভাত রান্না হইল। প্রায় ৭৮ জন ইহা খুব আহ্লাদের সহিত আহার করিলেন, আমিও তাঁহাদের অন্নের ভাগ

লইলাম। এই তো সে বেলার ব্যবস্থা। আহারান্তে সকলেই আবার সেই কলুটোলার বাড়ীতে গেলাম, আচার্য্যদেব কার্য্য করিতেছিলেন, ইঁহারা সকলেই সেখানে যাইয়া, কেহ লিখিতে, কেহ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে খানিকক্ষণ ছাদের উপর যাইয়া ধ্যানে বসিলেন, ৭টা ৭॥টা পর্য্যন্ত ছাদে থাকিয়া ঘরে আসিয়া গল্প আরম্ভ হইল। কত হাসি, কত তামাসা, কত গভীর তত্ত্ব কথা। বাহিরের দুই চারি জন উহাতে যোগ দিলেন। ক্রমে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেলে সকলে সেখান হইতে উঠিয়া আবার সেই পূর্ব্ব স্থানে আসিলেন। রাত্রিতে আর অন্নের ব্যবস্থা নাই, কয়েক পয়সার মুড়ি আনিয়া তাই অল্প অল্প খাইয়া এক এক ঘটী জল খাইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন। সে শোবার আয়োজনই বা কি! কেহ একটি মাদুর, কেহ পরিধেয় বস্ত্রের কতকটা অংশ পাতিয়া, কেহ পুস্তক, কেহ বা একখণ্ড ইট মাথায় দিয়া অগাধ নিদ্রা গেলেন। আমি এসব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, যিনি ইঁহাদের কাছে কার্য্য করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি এই বৈরাগীদের বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈরাগীদিগের কথা আর কি বলিব, সকলেই ভক্ত ও ফকির! একদিন তরকারী জুটিল না, কোথায় হইতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী খানিকটা বাটা হলুদ আনিয়া ভাতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, আজ খিচুড়ি হইল। একদিন একজন কয়েকটি দোপাটী ফুল আনিয়া বলিলেন, আজ ইহাই সিদ্ধ হউক। সেদিন তরকারীর স্থান উহাই পূর্ণ করিল। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। এদিকে আহারের ও থাকার তো এই ব্যবস্থা। কিন্তু উপাসনা দিন দিন খুব জমাট প্রার্থনায় কান্নার রোল, সঙ্গীতের মত্ততা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মহা বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া অনুতাপ, প্রার্থনা, ব্যাকুলতা এসে সকলকে ভগবানের শ্রীমুখ দেখিবার জন্য পাগল করিয়া তুলিল। "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে, কোথায় তাঁরে পাই" "পাপের যাতনা আর সহিতে পারি না নাথ, হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে" এই সমস্ত নূতন নূতন গান হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।"

* * * *

ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা তাঁহার নিজ মুখের কথায় জানিতে পারি, নবযুগের বৈরাগীদল কি কঠোর সাধনে কি স্বাভাবিক প্রাণের টানে মিলিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের এবং তাঁহার এই দলের সঙ্গে যে জীবন আরম্ভ করিলেন, তাহাতেই তিনি এই বৈরাগীদলের সেবক হইয়া, আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-জীবন নিষ্ঠা-ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করিলেন। অতঃপর আমরা তাঁহার নিজের বর্ণিত কথা আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিব না—পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতাম, কেননা প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। তিনি ভক্ত পরিবারে কি সূত্রে স্থান লাভ করিলেন, এইবার তৎসম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চেষ্টা করিব;

"কিছুদিন পরে আচার্য্যদেব সকলকে লইয়া সিমলা পাহাড়ে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইলেন। পরিবার, ছেলে মেয়ে ও ৪।৫টি বন্ধু তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আমিও সেবার সেই স্থানে গিয়া আচার্য্যদেবের পরিবারে আশ্রয় পাইলাম। তাঁহার গৃহে আরও অনেকেই ছিলেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তখন আচার্য্যদেবের ছয় বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র এবং চারি বৎসর ও দুই বৎসর বয়স্কা দুই কন্যা হইয়াছিল। ছোট কন্যাটি তত হাটিতে ও কথা বলিতে পারিত না। বড় ছেলে ও মেয়েটি আমাকে একটু ভালবাসার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়েরা সরল স্বভাব সুলভ গুণেই তাঁহাদের জননীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইনি আমাদের কে হন? উচ্চ হৃদয় মহিলা সরলভাবে বলিয়া দিলেন. উনি তোমাদের কাকাবাবু, তোমরা উঁহাকে কাকাবাবু বলিয়াই ডেক। সেই দিন হইতে আমি কাকাবাবু নামে আখ্যাত হই।"

কান্তিচন্দ্র যে কেবল আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পরিবারে স্থান পাইয়া 'কাকাবাবু' হইলেন তাহা নহে, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সকল পরিবারের কাকাবাবু —বিশেষভাবে 'নববিধান' মণ্ডলীর অভিভাবক—প্রচারক পরিবারের প্রতিপালক—সেবক হইলেন। প্রথম দর্শনেই কেশবচন্দ্রও কান্তিচন্দ্রকে জানিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাবনা কি, একটি আফিস আছে, সেখানে কয়েকটি যুবক বাস করেন, তুমি যাইয়া সেখানে কাজ কর।" কান্তিচন্দ্র যখন বলিলেন, "আমি যে নিজে কিছুই জানি না, সে আফিসে আমার মত লোকের কি কাজ আছে?" সে কথার উত্তরে তিনি বলেন, "তুমিতো যাও, যাহা করিতে হইবে পরে জানিতে পারিবে।" পরে তাহাই হইল, কান্তিচন্দ্র নিজেই বুঝিলেন, তাঁহার কি কাজ। তাই তিনি বিধাতার আলোকে আপন জীবনের কাজ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্ম-রাজ্য বিস্তারের জন্য সংসারের কাজ—উদরান্নের সংস্থান-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আগে হইতেই নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মসাধন ও প্রচারে মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবারের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন, ভগবান্ বলেন, "এস, নর নারী আমার কাজে আত্ম-সমর্পন কর, আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করিব।" এ কথার সার্থকতা দেখান চাই তো? তাই সেই ভার গ্রহণকারী কান্তিচন্দ্র-মূর্ত্তিতে আসিলেন! এ রহস্য আমরা কিঞ্চিৎ পরিমানে বুঝিলেই কৃতার্থ হইতে পারি। কান্তিচন্দ্র এই মহৎ সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াই এত উচ্চ জীবন লাভ করিলেন, কিন্তু কতদূর বিনীতভাবে এই পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার

কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা তাঁহার কথাতেই দিব। মূলে বিনয় না থাকিলে কি এমন গভীর ভক্তি হয়? তিনি একস্থানে বলিতেছেন,—

"যিনি বর্ত্তমান যুগে বিধান প্রবর্ত্তক হইয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া আমি যে কত অমূল্যধন, কত সম্পদ, কতরত্ন, কত আত্মীয়-স্বজন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। * * * এখনকার সভ্যতার সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দাস বলিতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্য প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, আমি নববিধানের কোন কর্ম্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, কেবল দাসত্ব ব্রত দিয়াছেন বলিয়াই আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়া আছি। অতএব আমাকে যে যাই মনে করুন, আমি কিন্তু জন্মদাস এ যেন তাঁহারা মনে করেন।"

"আমার জাতির আর একটি বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই, সে কার্য্যটি খাতা লেখা। প্রায়ই দেখিতে পাই, দোকানী, ব্যবসায়ী, জমিদার, সকল লোকের ঘরেই কায়েস্থ খাতা লেখক আছে। নববিধান দেখিলেন, খাতা লেখা যখন কায়স্থের কার্য্য, তখন নববিধানের এই খাতা লেখা কার্য্যটি একজন ঐ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন, খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই! গোটা কতক কসি ও গোটা কতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার খাতা দেখিলেই খাতা লেখক মুহুরীদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, আমার জাতীয় খাতা লেখকের কার্য্যভার পাইয়া আমি বড় কম সুখী হই নাই। আমার যে ইহা বড় ভাল লাগে। উপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ লেখাতে যে সুখ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্ষা বড় কম সুখ হয় না। আমি এই দাসত্ব কর্ম্ম লাভ করিয়া খাতা লিখিয়া আসিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই এই কার্য্যে দেখিলাম; কত মুক্তিপ্রদ অমূল্য আশ্চর্য্য সত্য সকল এই কার্য্যে পাইলাম, কত তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তই দেখিলাম, তাহা বন্ধুদিগকে প্রতি নিয়তই যথাসাধ্য বলিয়া আসিতেছি।"

ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় জটাবল্কলধারী কিম্বা কৌপীনধারী বৈরাগী ছিলেন না, কিন্তু প্রাণটা তাঁর অনাসক্ত নির্লিপ্ত বৈরাগী ছিল। তিনি আত্মত্যাগী পুরুষ ছিলেন, আপনার সুখ-স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রচারাশ্রমের জন্য যে বাড়ী ভাড়া লইতেন, তাহার উৎকৃষ্ট ঘরগুলি বন্ধুদিগকে দিতেন, অন্ধকার, বায়ু চলাচল-রহিত ঘর নিজের জন্য মনোনীত করিতেন। নিজের জন্য পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা

বিছানা কিনিতে দেখা যায় নাই, অন্যে কিনিয়া দিলে গ্রহণ করিতে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন। শীত নিবারণের জন্য তুলাভরা জামা এবং স্থুল পশমী চাদর অন্যে দিলে ব্যবহার করিতেন। ইদানীং বন্ধুরা আলোয়ান কিম্বা পশমী কোট দিলে পরিধান করিতেন। প্রচারে প্রথম যোগ দিয়া আহারে, শয়নে ও পরিধানে বহু ক্লেশ বহন করিয়াছেন। নিজের ভাবনা তো ভাবিতেনই না, বৃহৎ প্রচারক-পরিবারের প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল. বিধাতার উপর সম্যক্‌ভার রাখিয়া তাঁহার অনুগত ভৃত্যরূপে কার্য্য করিতেন। ভগবানে তাঁহার অলৌকিক নির্ভর ছিল।

এই প্রবন্ধ লেখকের মনে কিছুদিন হইতে এইরূপ একটি প্রশ্নের সহজ সরল উত্তরের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, 'কেন মানব ভগবানের পথ গ্রহণ করিতে পারে না! প্রেমময় ভগবান্, সকলেরই ভগবান্. তাঁহার পথে কত সুখ কত শান্তি, কত আনন্দ! অন্যথা মানব তাঁহার পথ ছাড়িয়া সংসারে কি যাতনা দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছে, তবু মানবের চিত্ত কেন তাঁহার দিকে যায় না?' কান্তিচন্দ্রের জীবনে—বিশেষতঃ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে এই প্রশ্নের একটি সহজ সরল উত্তর পাইয়া লেখকের চিত্ত অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এবং তাহাই কুশদহের পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা লইয়া, ভক্তি-ভাজন কান্তিচন্দ্রের জীবনের স্থুল স্থুল বিষয়বর্ণনে প্রবৃত্ত, কিন্তু হায়, বর্ণনা করিতে পারিলাম কি? তবু এই শুভ ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য যদি একটি আত্মার পক্ষেও কল্যাণকর হয়, তাহাতে লেখক কৃতার্থ বোধ করিবে।

কান্তিচন্দ্রের জীবনের মূল তত্ত্বটি অতি সহজ সরল। বিধাতা তাঁহার যাহা কাড়িয়া লইলেন, সে বস্তুতে তিনি আর অভিলাষ করিলেন না, কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে তাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন, যখন তিনি সেই অবস্থার সম্মুখীন হইলেন, তখন তাহাই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কেবল তাহাই নহে, তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বাস্তবিক প্রত্যেক মানবের জীবনে ইহাই দেখা যায় যে, মানুষ যাহা পাইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু যাহা পায় নাই—যাহা তাহার পাইবার নয়, ক্রমাগত সে তাহারই আকাঙ্ক্ষায় জীবনে অসুখী হইতেছে। এইখানেই সকল অধর্ম্ম অজ্ঞানতার মূল। ইহারই নাম ঈশ্বর-বিরোধীভাব। এই বিরোধভাব নিজের, জনসমাজের, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত নিজ জীবনে ভগবানের বিধি-ব্যবস্থা অভিপ্রায়, সজ্ঞানে

সচৈতন্যে গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন সে অন্ধকারে কামনার জালে ঘুরিতে থাকে। দ্বিতীয় সমস্যা মানুষ মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস-গরল পান করিয়া এই সহজ সরল পথকে অতি কঠিন দুষ্প্রাপ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, তাই নিকটের বস্তুকে সারাজীবন ঘুরিয়া খুঁজিয়া পায় না! হায়, হায় হায়!

ভক্তি ভাজন কান্তিচন্দ্রের স্বাস্থ্য বরাবর ভালই ছিল, যেবার কলিকাতায় বেরি বেরি রোগ সংক্রামক ভাবে প্রবল হয়, তাঁহারও ঐ রোগ হয়, তাহার পর হইতে তাঁহার হৃদ্‌রোগের সূচনা হয়। বৎসর দুই পূর্ব্বে প্রবল হয়, তখন হইতে তাঁহার কার্য্যভার অন্যে গ্রহণ করেন। বলিতে গেলে তিনি ভিতরে ভিতরে তখন হইতে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। শেষ চারিমাস শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া চিকিৎসা ও সেবা করিয়াছিলেন। মণ্ডলীর দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা তিনি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। যিনি সেবায় জীবন দিলেন, শত সহস্র নরনারীকে প্রেমে আপনার করিলেন, শেষ যখন তাঁহার সমস্ত বাহিরের শক্তি চলিয়া গেল, তখন কেবল অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মা আর কেন, এখন আমায় লও।" এমন জীবন লাভে কার না লোভ হয়?

শোকাশ্রু

ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে

—o—

আজীবন অর্থাদির অনাটন মাঝে,
এতটুকু বিশৃঙ্খল নেই কোন কাযে।
রাখিতে মোদের কত যতন করিয়া,
পক্ষিশাবকের ন্যায় ডানা আচ্ছাদিয়া।
বৃষ্টিতে ভিজিয়া কেহ আসিলে কাজেতে,
নিজ পরিধেয় তারে দিতে যে পরিতে।
ফিরে দিতে গেলে বস্ত্র শুষ্ক হ'লে পরে,
দেয়া বস্ত্র ল'তে নাই বলিতে তাহারে।
কেহ কোন দিন ঘরে না খাইয়া এলে,
হিন্দু ব'লে তাহাদের বসায়ে বিরলে।

কতই যতনে যে গো ভোজন করাতে,
বিদরে হৃদয় আজ সে সব স্মরিতে।
* * * *
সেই বাড়ী সেই ঘর সেইতো দুয়ার,
একের বিহনে আজ সব অন্ধকার!
বুদ্ধি দোষে রোষ ভাষ কহিয়াছি কত,
সেবায় হয়েছে ক্রটী জানি বিধি মত।
ক্ষম দেব সব দোষ নিজ ক্ষমা গুণে,
নমে শ্রীচরণে ভৃত্য ভক্তি যুক্ত মনে।
* * * *

(ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) শোকাহত-ভৃত্য
শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শান্তি পথে

—o—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"আমি শক্ত হব"

সুবোধচন্দ্র বীণার শূন্য কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিয়া রোষভরে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। আজ তিনি বীণার সহিত দেখা না করিয়া তাহার মনের ভাব না বুঝিয়া যাইবেন না। বীণা চম্পকবরণীর সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র গৃহে এক মলিন শয্যায় অর্দ্ধ-শায়িতা অবস্থায় অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছিল। কখনো শয্যার উপর বসিয়া কাঁদিতেছে, কখনো বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেঘ-শূন্য আকাশের মাধুরী লীলার সহিত তাহার জীবনের কোন্ এক অতীত মধুর স্মৃতির তুলনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কখনো বা ভূমিতলে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

বিগত ছয় বৎসর ধরিয়া সে ক্রমাগত এই কথাই শুনিয়া আসিতেছে যে, তাহার স্বামী চরিত্রহীন, অখাদ্য-ভোজী, অপেয়-পায়ী, অনাচারী ও ফিরিঙ্গি

ভাবাপন্ন। সুতরাং এ-রূপ স্বামীকে ত্যাগ করাই শাস্ত্রের আদেশ। এ-রূপ স্বামীর সহিত পত্র ব্যবহার করিলেও বীণা ধর্ম্মে পতিত হইবে।

অনাচারী স্বামী বিদেশে ছিলেন, সেইখানে থাকিলেই পারিতেন, তাহা হইলে যে ভাবে ছয় বৎসর সে তাহার বিরহ-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, না হয় সারা জীবনটা সেই ভাবেই কাটাইত। সে-জ্বালাও তাহার সহ্য হইত; কিন্তু ছয় বৎসর পরে হঠাৎ তাহার স্বামী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বীণার মনের এই দ্বন্দ-কোলাহলের মধ্যে সুবোধের সুরপুরে আসিবার সংবাদ পাওয়া গেল। সকলেই বলিল সুবোধ বোধ হয় বীণাকে লইয়া যাইবে; বীণা ও ললিতাকে লইয়া সে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এই সর্ব্বজন বর্ণিত কথায় যেন আতঙ্কিত হইয়াই নগেন্দ্রনাথ একদিন বীণাকে বলিলেন, দেখিস্ বীণা, ঠিক থাকিস্, যত সব বোকা মেড়াদের কথায় ভুলে যেন জাত খোয়াতে যাস্ নি। মিত্তিরগুষ্টি ও দত্তগুষ্টির মুখে যেন চুণ কালি দিস্‌নি।

বীণার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোনো কথা বলিতে পারিল না। নগেন্দ্রনাথ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী চম্পক-বরণী তাহা সম্পন্ন করিলেন। তিনি একদিন স্বামীর সমক্ষেই বীণাকে বলিলেন, বৌ আমাদের তেমন মেয়ে নয়। আমার শ্বশুরগুষ্টিতে কেউ বোকা নেই। ও কি আর বোঝে না যে, যে এতকাল বিলেতে বাস কোরে, মেমদের সঙ্গে অবাধ মেশামিশি কোরে, কেউ কি খাঁটী থাকতে পারে? নেকা বোকা মেয়ে হোলে ভাবনার কথা ছিল, কিন্তু বৌ আমাদের বোকা নয় গো।

বীণা কোন উত্তর না দিয়া সে দিন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

আর একদিন চম্পকবরণী বীণাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল্ত বৌ তুই কি কোরবি?

বীণা বলিল,—তোমরা কি বলো?

চম্পক। আমরা কি বোলব? আমরা কেউ কি আর জাত খোয়াতে পারবো? কর্ত্তাও পারবেন না, আর ললিকেও যেতে দেবেন না।

এই কথায় বীণার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিল, লোকে যে বলেন, তিনি বড় সদাচারী?

চম্পক। হোলেই তো ভাল। কিন্তু সদাচারী কি কদাচারী দু'দিন পরেই প্রমাণ হবে।

বীণা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কোরে ?

চম্পক। শীগ্‌গীরই সমাজে এর বিচার হবে। ঠাকুরপো যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হন তা হোলেই বোঝা যাবে, তিনি সদাচারী, আর তা না হোলেই বিপদ।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল,—কি বিপদ হবে ?

চম্পক। সমাজ তাঁকে ত্যাগ কোরবে; ধোপা, নাপিত, বামন, পুরুত, আত্মীয়স্বজন, সবাই তাঁকে ছাড়বে।

বীণা। আর প্রায়শ্চিত্ত কোরলে ?

চম্পক। সব গোল চুকে যাবে। সব বজায় থাকবে। কিন্তু তা কি তোর বরাতে হবে বিণী ?

বীণা কোনো কথা বলিল না। কেবল মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল, হে ঠাকুর! তাই যেন হয়। উনি যেন প্রায়শ্চিত্ত করেন। মা সঙ্কটা, তুমি এই ঘোর সঙ্কট থেকে আমায় উদ্ধার করো মা, আমি তোমায় ষোড়শোপচারে পূজো দেবো। মা কালী, আমি তোমায় জোড়া যোষ দেবো, হীরের চোখ দেবো. তুমি আমার দিকে মুখ তুলে চেও মা।

ষষ্ঠীর দিন সুবোধ গৃহে আসিলে পরিজনবর্গের মধ্যে একটা ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইল। পুর-মহিলারা বীণাকে দেখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, তার বরাতে আজ কি আছে, কে জানে ?

বীণা পূজার দালানের দুর্গামূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, মা দুর্গা, আমায় আর দুঃখ দিয়ো না, মা। ওঁর যেন শুভমতি হয়।

বহুক্ষণ এই প্রকার নীরব প্রার্থনায় অতিবাহিত হইবার পর বীণা জানিল, তাহার কপাল পুড়িয়াছে,—সুবোধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সমাজও তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছে।

চম্পকবরণী আসিয়া বলিয়া গেলেন, সাবধান, বৌ, এখন কিন্তু তোর কান্নাকাটির সময় নয়, এখন শক্ত হবার সময়। দু'দিন শক্ত হোলে, তোর সব বজায় থাকবে—ঘর, বর দু-ইই পাবি। এ অবস্থায় ওঁর সঙ্গে

গেলেই সমাজ তোকেও ছাড়বে। এখন একটু আলুগা দিলেই সকলের সব চেষ্টাই ভেসে যাবে। তাঁকে আর সৎ-পথে আনা যাবে না।

বীণা তাই ভ্রাতৃজায়াকে আশ্বাস দিয়া এই নির্জ্জন ও ক্ষুদ্র কক্ষে শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হৃদয়ের গুরুতর বেদনা লইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

কত নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বামী এতদিন পরে দেশে আসিলেন, কিন্তু তাহার বিরহ ঘুচিল না। স্বামীর বিদেশ-বাসের ছয় বৎসর বীণা কোনো প্রকারে কাটাইয়াছে। কিন্তু স্বামীকে এত নিকটে পাইয়াও যে সে তাঁহাকে পাইল না, ইহা কি অল্প দুঃখের কথা! নদীতীরে বসিয়া তৃষ্ণায় কাতরতা ভোগ করার মতো ক্লেশ, মরুভূমির অধিবাসীর হয় না।

সুবোধ যখন ক্রোধভরে রন্ধনশালা হইতে ফিরিয়া শয়নকক্ষে আসিলেন তখনও বীণা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে চম্পকবরণী তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, বৌ, লক্ষীটি, আর কেঁদে কি হবে বোন? তোর বরাতে যা ছিল তা হোয়েচে; এখন অত কাঁদলে কি তোর চলে? তুই হোলি সংসারের গিন্নি, বুড়ো কর্ত্তা, তোকে নিয়েই বুক বেঁধে থাকবেন। তারপর ললি আছে, তার বে থা দিতে হবে; মেয়ে, জামাই আর তাদের ছেলে পুলে নিয়েই তোর সংসার আরম্ভ কোরতে হবে। ছ'টা বছর যে ভাবে গেছে, আর কিছুদিন সেই ভাবেই যাক্। তুই এখন ঠিক থাকলে সংসারটা বজায় থাকে।

ননদিনীর কথায় বীণা চক্ষু মুছিয়া সেই মলিন শয্যাতেই বসিয়া বলিল, না দিদি, আর কাঁদবো না। এইবার প্রাণটাকে শক্ত কোরব—খুব শক্ত কোরব; একেবারে পাথর কোরব। দেখি বিধাতা কত দুঃখ দিতে পারেন।

ভ্রাতৃজায়া তখন কনিষ্ঠা ননদিনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোর কোনো ভয় নেই, বোন্, ধর্ম্ম তোর দিকে। যে ধর্ম্মের জন্য তুই এত কোরচিস্, সেই ধর্ম্মই তোকে স্বামী এনে দেবেন। সে-কালে সাবিত্রী মরা স্বামীকে ফিরিয়ে পেয়েছিলেন, কেন না তিনি ধর্ম্ম রক্ষা কোরেছিলেন, ধর্ম্ম রক্ষা কোরলে তুইও তোর স্বামীকে ফিরিয়ে পাবি।

বীণা সঙ্কুচিতভাবে ব্যাকুলদৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্যি বোলচ দিদি? আমি শক্ত থাকলে সত্যিই কি তাঁকে পাবো?

চম্পকবরণী বলিলেন, পাবি দিদি, পাবি। আজ না হয় কাল,

দিন পরে বই তো নয়! তা এতদিন সইলি আর দিন কতক সইতে পারবি না। একবার শক্ত হোয়ে দেখ্ ধর্ম্ম কি করেন।

বীণা বলিল, তাই হবে দিদি, তাই হবে। আমি খুব শক্ত হবো, তিনি ডাকলেও আমি তাঁর সঙ্গে যাবো না, তাঁরই ভালর জন্যে, তাঁকে সৎ-পথে আনার জন্যে, আমি আরও কিছুদিন বুকে পাথর বেঁধে থাকবো। মাগো, আমায় শক্ত কোরে দাও মা! পাথরের চেয়েও শক্ত কোরে দাও মা।

চম্পকবরণী ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া দরদালানে গেলে, তাঁহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি?

চ। খবর ভাল; কোনো ভয় নেই, তুমি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারো।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মুচকিয়া হাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"আমি যাবো না"

চম্পকবরণী ও বীণাবাদিনী যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন অন্যত্র আর এক অভিনয় চলিতেছিল। সুবোধচন্দ্র বন্ধনশালায় অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হরির মাতা সেই সংবাদ তদ্দণ্ডেই শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রদান করে। শাস্ত্রী মহাশয় তখন আহারে বসিতে যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি দ্রুত আসিয়া সুবোধকে আপন কক্ষে লইয়া গিয়া, আপনার আসনের পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। আহারের সময় সুবোধচন্দ্র বলিলেন, কাকাবাবু, আপনি যে আজ অসীম সাহসের কাজ কোরলেন সমাজের কর্ত্তারা যাঁকে আজ বর্জ্জন কোরলেন আপনি তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে খেলেন।

শা। লোকাচারের চেয়ে হৃদয়ের প্রেরণা বড়। কেননা, হৃদয়ের প্রেরণা ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত। আর লোকাচারের প্রতিষ্ঠা লোকের স্বার্থসিদ্ধিতে।

সু। তবে কি লোকাচারের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা নিত্য-বিরোধ সম্বন্ধ আছে?

শা। না, তা নাই, বরং উল্টো, আছে নিত্য-যোগ। কিন্তু এই যোগ দেখে কে, খোঁজেই বা কে বাবা?

সু। এই নিত্য-যোগ কি কোরে বোঝা যায়?

শা। বেদান্তের নানা স্থানে এই যোগের সঙ্কেত দেওয়া হোয়েছে। আজ তোমায় একটা কথাই বলবো। শ্বেতাশ্বেতার উপনিষদ বোলচেন,—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান অসি,
ত্বং কুমার উত বা কুমারী,
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি,
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ।

এক আত্মাই সর্ব্বরূপে আপনাকে প্রকাশ কোরচেন। স্ত্রী, পুরুষ, কুমার কুমারী, দণ্ডধারী বৃদ্ধ আর নবজাত শিশু সবই তিনি। ব্যষ্টি, সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজ সবই তাঁর রূপ। এই রূপ যে ত্যাখে সেই সত্য ব্যক্তি বা সত্য সমাজ ত্যাখে, আর যে না ত্যাখে তার দর্শন দুষ্ট, সে বিরোধেরই সৃজন করে।

সুবোধ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, এ-যে বড় উঁচু কথা, কাকাবাবু? সাধারণ লোকে কি এ সব কথা বুঝতে পারবে?

শা। তা পারবে না বোলেই, সকলে সমাজের নেতা হোতেও পারবে না। সাধারণতঃ বিরোধের সংঘর্ষণ দিয়েই সমাজ চলবে। এই বিরোধও যুদ্ধ লড়াই দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে, শক্তিশালীর জয়ের ভিতর দিয়েই সমাজে আত্মার রূপ একদিন ফুটে উঠবে। অবশ্য সে কতদিনে হবে তা বলা যায় না।

সু। পাশ্চাত্য দার্শনিকের মধ্যে কেউ কেউ আজকাল এই ধরণের কথাই বোলচেন। তাঁরাও বোলচেন, যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন (su vival of the fittest) হয়।

শা। এক হিসাবে এটা যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন বটে, কিন্তু সে যোগ্যতম হোচ্চেন, স্বয়ং পরমাত্মা। পাশ্চাত্যেরা যাকে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন বোলেচেন, আমাদের ঋষিরা তাকেই ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের, বহুর মধ্যে একের, আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আবিষ্কার বোলেচেন। এই হিসাবে কথাটা একই।

এই ভাবের আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে আহার সম্পন্ন করিলেন। সুবোধচন্দ্র আচমনান্তে তখন পুনরায় বীণার কক্ষে যাইয়া তাহা পূর্ব্ববৎ শূন্যই দেখিলেন। হরির মা এই সময় আসিয়া তাঁহাকে বীণার নিকট লইয়া গেল। বীণা তখন অচল-মেরুবৎ দাঁড়াইয়া অর্থশূন্য দৃষ্টিতে আকাশ দেখিতেছিল। স্বামীর আগমন লক্ষ্য করিল না।

পত্নীর অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া সুবোধ আগ্রহভরে তাহার নিকটে গিয়া স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, বীণু, তোমায় আমি আজ বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্চি,

আর তুমি এমন কোরে, লুকিয়ে রোয়েচ। কত দিন পরে আজ এলুম, তোমার কি কথা বোলতে ইচ্ছে কোরচে না, বীণা ?

স্বামীর কোমল হস্তের মধুর স্পর্শে, স্বামীর প্রেমের আবেগপূর্ণ আহ্বানে বীণার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে স্বামীকে দেখিয়া ভাবাবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে অতর্কিতভাবেই স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িলেন। পত্নীর ভাব লক্ষ্য করিয়া সুবোধচন্দ্রও সেইস্থানে, সেই ভূমিতলেই বসিয়া পত্নীকে সোহাগভরে আলিঙ্গন করিলেন।

তিনি তখন আবার বলিলেন, বীণু আজ এ বাড়ীতে চারদিকে কেবলই তিরস্কার, নিন্দা ও গালাগালি শুনচি। এসো তোমার কাছে দু'টো ভাল কথা শুনি।

বীণার হৃদয়োচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে স্বামীর বক্ষে মস্তক লুকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি কেন এমন হোলে ? তুমি কেন বাবার কথা শুনলে না ?

সুবোধ পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, সে সব কথা তোমায় বুঝিয়ে দেবো। ও সব কথা আজ ভুলে যাও! এসো আজ থেকে আমাদের নতুন সংসারের পত্তন হোক্।

বীণার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিয়া স্বামীকে নিজের মনোভাব বুঝাইবে স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে সবাইকে ছাড়লে।

সু। তুমি ভুল শুনেচ, বীণা, আমি কাউকে ছাড়িনি, ছাড়তে চাইওনি, তোমার দাদা চক্রান্ত কোরে আমাকে ছাড়িয়েচেন, কিন্তু তাতে কি আসে যায় বীণা ? তুমি আর আমি যদি ঠিক থাকি, আমাদের সংসার অটুট থাকবে। সবাই আমাদের ছাড়ুক্, তুমি আর আমি যেন পরস্পরকে না ছাড়ি।

বীণা বলিল, কিন্তু বাবা, ললি, দাদা, বৌদি এঁদের ছেড়ে কি কোরে থাক্‌ব ?

সু। কাউকে ছাড়তে হবে না বীণা; সবাই আসবেন। তবে দু'দিন একটু ঠিক থাকতে হবে। আমার জন্যে কি তুমি এইটুকু কোরতে পারবে না বীণা ?

বীণা কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই কোনো একটা দ্রব্য অন্বেষণের ভাণ করিয়া চম্পকবরণী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, বৌ দেখ্ আমার চাবীর থোলোটা কোথায় জানিস্ ? সেটা কোথাও

পাচ্চি না ? তাঁহার আগমনে সুবোধ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বীণা সংযত বেশে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মান হইয়া মুখ নত করিল। তাঁহার শরীরের উচ্ছ্বসিত রক্তপ্রবাহ হঠাৎ যেন ভীষণ বেগে হৃদ্‌পিণ্ডকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। আর সুবোধচন্দ্র ঘৃণায় ও ক্রোধে রক্তোচ্ছ্বসিত মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে চম্পকবরণীকে দেখিতে লাগিলেন।

চম্পকবরণী সুবোধচন্দ্রকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া এইরূপ ভাণ করিলেন যেন এইমাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন দুই পদ নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, কি গো, ঠাকুরপো, তুমি এসেছ, ভালই হোয়েচে। বীণাকে বুঝিয়ে দ্যাখো, যদি সে তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়। এ তো আর আমাদের মুখের কথা নয়। নিজের কাণে ওর মুখের কথা শোনা দরকার।

সুবোধ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া চম্পকবরণী বলিলেন, কি গো বৌ, বলো না, তোমার মনের ভাবটা, খুলে বলো না। তোমার নিজের মুখের কথা না হোলে ঠাকুরপো বিশ্বাস কোরবেন না।

এইবার সুবোধ কথা বলিলেন; কিন্তু সে তো কথা নয়, সে যেন অগ্নি-বর্ষণ।

সুবোধ বলিলেন, এখানেও তুমি এসে হাজির হোলে। ছ' বছর ধোরে বীণাকে শিখিয়েও তোমাদের আশা মিটল না। দু' দণ্ড দু'জনে একটু কথা বোলচি, তাও তোমাদের সহ্য হোল না।

চম্পকবরণী বলিলেন, আমাদের আবার অসহ্য কি ঠাকুরপো? তোমার জিনিষ তুমি বোঝাও না, দু'দণ্ড কেন দু'শো দণ্ড ধোরে বোঝাও। আমাদের আর তাতে ইষ্টানিষ্ট কি? বৌ কি কোরবে তাই কেবল আমি জিগ্‌গেস করছিলুম। ও যদি তোমার সঙ্গে যায়, তা হোলে তো আমাকে সংসারের সব বন্দোবস্ত কোরতে হবে? কর্ত্তা রইলেন, ললি রইল, রাত পোহালেই বাড়ীতে পূজো। কি রকম বন্দোবস্ত সব হবে, আমারও বুঝে নিতে হবে তো?

সুবোধ। যত বোঝবার দরকার কি এই সময়ই হোল?

চ। অত কথার দরকার কি ভাই, আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

এই বলিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া, বীণাবাদিনীর দিকে চোখ তুলিয়া

বলিলেন, কি বৌ, তা হোলে আমার সামনে তো কিছু বোলবে না?

বীণা তখন কাতর দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার প্রতি চাহিল, এই দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া চম্পকবরণী বলিলেন, কি কোরব ভাই? অমন কোরে চাইলে কি হবে? তুমি বোলেই ফেল না কেন। কি কোরবে? একদিকে ঠাকুরপো,আর একদিকে জ্যাঠা মশাই, ললিতা, আমরা সবাই, আত্মীয়-স্বজন. সমাজ সব। এ দুটোর কোন্‌টা তুমি চাও বলোই না কেন?

এই কথায় বীণার সমস্ত কথা মনে পড়িল। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া বিগত কয়েকদিন ধরিয়া যে সকল বিপদের কথা বীণাকে বলিয়াছিলেন, সে সকলই তাহার স্মরণ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সে স্বামীর কথা ভুলিল. স্বামীর ভালবাসা ভুলিল, বীণা চম্পকবরণীর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া প্রায় অস্ফুট স্বরে বলিল—"আমি যাবো না।

সুবোধের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বোল্লে বীণা? তুমিও তোমার দাদার দিকে হোলে। তুমিও আমায় ত্যাগ কোরলে?

বীণার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চম্পকবরণী তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, চলো বৌ, আর এখানে নয়, বিছানায় শোবে চলো।

বীণা চম্পকবরণীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সুবোধ একাকী কিছুক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ মনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সংসার করিবার সকল আশা ফুরাইল। সেই গভীর রাত্রে সেই বান্ধব-বিহীন গৃহ হইতে, তিনি বহির্গত হইলেন। গমনের সময় একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বাবা দুঃখ কোরো না, সংসারটা এই রকমই। এ সব বিপদ নয়, এ সব তাঁর শিক্ষা-প্রণালী। এই শিক্ষায় এবার উত্তীর্ণ হও বাবা।

সুবোধ তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া রাজপথে আসিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোরমা

—৫—

২৫

অফিস গমনোদ্যত স্বামীকে সুখময়ী কহিলেন, আমায় আর গোটাকতক টাকা আজ দিয়ে যাও, পূজোর কয়েকটা জিনিষ আরও কিন্‌তে হবে, রমাকান্ত বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ওবেলা এনে দেবো না হয়, অফিসের বেলা হোয়ে যাচ্ছে, তোমার যত সব পাগলামী!

সুখময়ীর রাগ হইল। তিনি কহিলেন, পাগলামীটা কি হোলো? দেবতার কাছে মানসিকটা কি পাগলামী? আমার অতো জ্ঞান নেই, পাণ্ডিত্য নেই, আমি মুর্খ মেয়েমানুষ, এই শুধু বুঝি, প্রাণে যা দুঃক্ষু কষ্ট পাবো, মায়ের কাছে জানাবো, তিনি অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন।

ঈষৎ হাসিয়া রমাকান্ত বাবু কহিলেন, তা শুধু জানালে তিনি জানছেন কই? তাঁর কাপড় চোপড়, থালাভরা চা'লকলা সন্দেশ না হোলে তো তিনি জানার পরিচয় দিতে চান না?

সুখময়ী রাগভরে কহিলেন, শাস্ত্র যাঁরা গড়েছেন, তারা তো মুর্খ নয়, তাঁরাই তো সোপকরণ পূজার বিধি করেছেন, তোমরা সে বিধি উল্টে দিলে চলবে কেন?

রমাকান্ত বাবু কহিলেন, আমি কি তাঁদের মুর্খ বোলচি? আমার ঐ স্বস্ত্যয়নে বিশ্বাস নেই, হোতে পারে ওতে মনের তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু যে মঙ্গলকামনা কোরে কোরচ তা যে কতদুর ফলবতী হবে তা জানি না, টাকা তুমি বিনয়ের কাছে থেকে নিয়ো, আমি ওবেলা এসে দেবো।

রমাকান্ত বাবু অফিসে চলিয়া গেলেন, সুখময়ী স্বস্ত্যয়নের পর যখন শান্তি জল লইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময় ডাকপিয়োন একখানি টেলিগ্রাম আনিল, বিনয় সহি করিয়া লইবামাত্র পিয়োনটা বক্‌সিস্ চাহিল, সুখময়ী ও ক্ষীরোদা উৎকণ্ঠায় সহিত কহিলেন, কোথা থেকে তার এলো, শীগ্‌গির পড়ো বাবা।

চকিতে বিনয়ের মুখ কাগজের মতো শাদা হইয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, একখানি টুলের উপর বসিয়া পড়িল। ক্ষীরোদা কহিলেন, কি হোয়েছে বিনয়, কি খবর বলো না বাবা?

বিনয় কহিল, বোলবো আর কি মামী মা, সর্ব্বনাশ হোয়েছে, মনোরমা আত্মহত্যা কোরেছে।

পলকে পৃথিবীর জ্যোতিঃ গভীর নীল অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সুখময়ী কঠিন ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িলেন।

ক্ষীরোদা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। দয়া আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল। বিনয় সুখময়ীর চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। ক্ষীরোদা কহিলেন, থাকুক অমনি অচৈতন্য অবস্থায়, জ্ঞান হোলে কেমন কোরে এ যাতনা সহ্য কোরবে? সন্তান শোক যে বড় ভয়ানক রে!

বহরমপুর হইতে কমলার স্বামী খগেন্দ্রনাথ রমাকান্ত বাবুকে টেলিগ্রাম করিতেছেন;—

"On mondy night, Monorama Commited suicide, doubtful.

সন্দেহজনক কথাটিতে বুঝাইতেছে যে আত্মহত্যা কি হত্যা তাহা ঠিক নাই।

অনেকক্ষণ পরে সুখময়ীর জ্ঞান হইল, কিন্তু না হইলেই বুঝি ভালো ছিল। কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে, ক্ষীরোদা কাঁদিতে কাঁদিতে জল পটি বাঁধিতে গেলেন, সুখময়ী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, আমার প্রাণ ফেটে যে রক্ত পড়চে সেই রক্তের ধারা আগে বন্ধ কোরে দাও ঠাকুরঝি! ও বাবা বিনয়, আমার মনুকে ফিরিয়ে এনে দে বাবা, আর আমি মাকে চোখের আড় কোরবো না, আমার অন্ধের যষ্ঠি, আমার চোখের মণি এনে দে তোরা! সে আমার মরবার মেয়ে নয়, মাকে ফেলে সে কোথাও যাবে না, তাকে কেউ লুকিয়ে রেখেছে, বের কোরে এনে দে বাবা।

বিনয়েরও দুই চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল, কাতরকণ্ঠে কহিল, পাগল হোয়ো না মামী মা, এমন চোরে সে জিনিষ চুরি কোরেছে যেখানে কারো দাবী দাওয়া চলে না, ক্ষীরোদা সুখময়ীর ধূলি ধূসরিত দেহ কোলে টানিয়া লইতে গেলেন, উন্মত্তভাবে সবলে সুখময়ী তাঁহাকে আবার ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিলেন, সান্ত্বনার কথা বোলো না ঠাকুরঝি, প্রাণভরে একবার কাঁদতে দাও, ওঁকে ডেকে আনো বিনয়, দুজনে একবার আছড়ে পড়ে কেঁদে দেখি, তাকে

ফিরিয়ে পাই কিনা, আমার মনু পাথরে গড়া নয়, বাপ মায়ের এ কান্না তাঁর কাণে গেলে সে দৌড়ে এসে বুকের উপর পড়বে।

ক্ষীরোদা বুঝিলেন সত্যই এখন সান্ত্বনা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বিনয় উঠিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, এই কি সংসার? ভগবানের রাজ্যে এমন সব বিসদৃশ ঘটনা ঘটে কেন? কেন এ হানাহানি? কেন এ রক্তপাত? কেন এ ঘৃণ্য নৃশংসতা? সে আত্মহত্যা কোরেছে? কেন? কিসের দুঃখে? জগতের এত পথে এত নরনারী যাত্রা কোরে চোলেছে, তার একটা পথ বন্ধ হোয়েছিল, বোলে সেই ক্ষোভে সে এই দুর্লভ মানব জন্ম, ভগবানের এমন সুন্দর দান নষ্ট কোরলে? নষ্ট করবার কি অধিকার ছিল? নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করেনি। সন্তোষই তাকে হত্যা কোরেছে, ঝোকের মাথার এমন কোরে মেরেছে। বিনয়ের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল. হতভাগ্য হত্যাকারীর শাস্তির কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

* * * * *

* * * * *

শোকের প্রথম বেগ বড় জোরে আসিয়া মানুষের বুকে লাগে, তার পর সে প্রচণ্ড আঘাতও সহিয়া যায়, প্রাণাধিকা কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে স্নেহময় পিতামাতার প্রাণে বড় গভীর দাগা দিল, কিন্তু মানুষের হৃদয় সর্ব্বসহ। রমাকান্ত বাবু বড়ই কাতর হইলেন। কন্যার মৃত্যুখবর ভালোরকম জানিবার জন্য তিনি খগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন, উত্তরে তিনি লিখিলেন "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর প্রতিবিধান নাই। বোধহয় সন্তোষই মনোরমাকে নেশার ঝোকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু চক্রান্তে আত্মহত্যা সাব্যস্ত হইয়াছে, আপনার দুরদৃষ্ট। ভগবানের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সকলি সহ্য করিতে হইবে!"

রমাকান্ত বাবু চিঠিখানি বিনয়ের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দুই হাতে কপাল টিপিয়া কহিলেন, উপায় নেই, প্রতিবিধান নেই। তাকে ফাঁসী দিলেও আমার মেয়ে আর ফিরিয়ে পাবো না, সে হত্যা কোরেও স্বচ্ছন্দে মানুষের আদালতে প্রামাণাভাবে খালাস পেলে, কিন্তু ভগবানের আদালতে কি হবে তা জানিনা. শুধু এইটুকু জানছি, আমার মতন আর কোনও কন্যা দায়গ্রস্ত হতভাগা তার মতো সুপুরুষ বিদ্বান ধনবান জামাইকে আদর কোরে মেয়ে দেবে, বিনয়, এই আমাদের দেশের অবস্থা? মেয়ে আমাদের এমনই

খেলার পুতুল? বারো বছরে পা দিলে মেয়ে আমাদের এমনি গলগ্রহ হয় যে তাকে আমরা বাড়ী থেকে বিদেয় না কোরতে পারলে খেয়ে সুখ পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাই না? উঠ্‌তে বসতে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়"!

রমাকান্ত বাবুর দুই চক্ষে অগ্নি কণা জ্বলিতেছিল, বিনয়ের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি কহিলেন, বলো বিনয়, এর কি প্রতীকার নেই?

বিনয় স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "মামাবাবু, মনে কোরেছিলাম,বিয়ে কোরবো না। কিন্তু দেখছি পরকে উপদেশ দিয়ে যে কায না করা যায়, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলে সে কাযের বেশি করা হয়, আমি বিয়ে কোরবো, ভগবান্ যদি আমার পুত্র কন্যা দেন, তবে আমি আমার সাধ্যমত তাদের সামনে এমন আদর্শ ধোরবো যাতে তারা কতকটাও নিজেদের জীবনে ধোরে চলতে পারে. তাতে আমার জীবনের কায হবে।

পাশের ঘরে সুখময়ী তখন করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছিলেন, ওমা মনু অভিমান কোরে কি চোলে গেলি? একবার ফিরে আয় মা? দয়াময়ী দুর্গে, আমার যে বড় বিশ্বাস ছিল, আনার মনু তোমার দয়ায় চিরদিন আমাদের কোল জোড়া কোরে থাকবে, সে বিশ্বাস পাষাণ প্রাণে কেন ভেঙে দিলে মা! আমি তো তোমার পায় কোনও অপরাধ করিনি মা!

রমাকান্ত বাবুর দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, মাতার এ হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, পিতার এ মর্ম্মস্পর্শী করুণ ক্রন্দন বিশ্ববিধাতার সিংহাসন তলে পৌঁছিল কি?

সমাপ্ত।

শ্রীসরসীবালা বসু।

কুশদহের ইতিহাস

অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল অনার্য্য জাতি বাংলাদেশে বাস করিতে-ছিল, পুরাতত্ত্ববিদেরা তাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিকে কোলেরীয় আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

আর্য্যগণের পৌরাণিক গ্রন্থে তাহাদিগকে "কোলাবিধ্বংসী" শূকরমাংসভোজী বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমি এখানে বাউরীদিগের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ইহাঁরা দ্রাবিড় বা কোলেরীয় জাতীয় তাহা নিশ্চয় বলা অসম্ভব। যখন জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, তখন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া আমি উপহাসাস্পদ হইব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বাউরীগণ এক সময়ে সৈনিকের কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। জমিদার ও নীলকুঠীর সাহেবেরা অনেক বাউরী লাঠিয়াল রাখিতেন। তাহারা যেরূপ বলিষ্ঠ ও কার্য্যদক্ষ হইত, কুঠীর সাহেবেরা অন্য লাঠিয়াল হইতে সেরূপ কাজ পাইতেন না। কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে যত যোয়ান দেখা যাইত, এখন তাহার সিকিও নাই। এই বীর জাতীর সংখ্যা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে বা রাঢ়ে এখন ইহাঁরা চাষ কাজ করিতেছে। কেহ কেহ মাটীর কাজ করে কেহবা পাল্কী বহন করে।

তাহাদের মধ্যে (১) মগ্নভূমিয়া (২) শেখরীয় বা গোবরা (৩) পঞ্চকোটীয়া (৪) মোগা (৫) ধোলা (৬) ঝাটীয়া (৭) কাঠুরিয়া (৮) পাথুরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে বক ও কুকুরের আদর অত্যন্ত অধিক। ঐ দুটি জীব তাহারা কখনও হত্যা করে না। এমন কি কোন পুষ্করিণীতে কুকুর ডুবিয়া মরিলে বা কোন কারণে কুকুরের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার জল পান করে না।

বাউরীরা শাক্ত। তবে মনসা দেবীও তাহাদের উপাস্য দেবতা। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্মরাজ, ভাদু, মানসিংহ, বড়পাহাড়ী প্রভৃতিকে তাহারা পূজা করে। ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, তবে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের ক্রিয়াকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, ইহারা ঋকমুনির সন্তান। কোনও মতে বাহুক ঋষি হইতে ইহারা উৎপন্ন। কথিত আছে কোনও বিবাহ উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহারা পাল্কী পর্য্যন্ত বেচিয়া সুরাপান করিয়াছিল। এবং সুরাপানজনিত উন্মত্তাবস্থায় গুরুদেবকে ধরিয়া প্রহার করে। গুরু তাহাদিগকে নিম্নতম স্তরে অধিক্ষিপ্ত করেন। তদবধি তাহারা পাল্কীবহনাদি কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। অপর একটি প্রবাদ এই যে, দেবসভা হইতে ভোজ্যবস্তু চুরী করার অপরাধে তাহারা নিম্ন শ্রেণীতে অবনমিত হইয়াছে।

ইহা হইতে আমারা বুঝিতে পারি যে, আর্য্যগণের প্রথম বসতিস্থাপন কালে এই জাতি তাঁহাদের যজ্ঞকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইত। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। কাজেই আর্য্যগণ যখন ইহাদিগকে শাসনাধীন করিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে সমাজের নিম্নস্তরেই সন্নিবেশিত করেন। ইহারা কুকুর ভিন্ন প্রায় সকল জন্তুর মাংস খায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা দিঘড়িয়া নামে পরিচিত, তাহারা মানসিং ক্ষুদ্র শিনি ও বড়পাহাড়ীর পূজা করিয়া থাকে। বড় পাহাড়ের পূজা সাঁওতালী মারাংবুরুর পূজার নামান্তর।

বাউরী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর লোক ইচ্ছা করিলে বাউরী সমাজভুক্ত হইতে পারে। প্রবেশ করিতে হইলে দশ হইতে পনর টাকা পঞ্চায়েতের নিকট জরিমানা দিতে হয় মাত্র। অন্য কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ঐ টাকা সমাজস্থ লোকদিগকে ভোজ দেওয়া হয় এবং প্রবেশেচ্ছু সাধারণের সহিত বসিয়া আহার করিলে তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যায়। বাউরীদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ প্রচলিত আছে। কিন্তু রাঢ়ের অপেক্ষা এতদঞ্চলের বাউরীরা খাঁটী হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের শ্রাদ্ধকার্য্য একাদশ দিবসে হইয়া থাকে। দশম দিবসে ক্ষৌর কার্য্যের পর অশৌচান্ত হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের হাড়ীদেরও এই রীতি।

কুশদহে এক সময়ে এই জাতীয় অনেক লোক ছিল। অনুমান হয় তাহাদের গোবরা সম্প্রদায় হইতে গোবরডাঙ্গা, গোবরাপুর ও গোবরার নামকরণ হইয়াছে।

যদিও নিম্নবঙ্গে চেরজাতীয় লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তথাপি মান ভূম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমুহে এবং বেহারে চেরজাতীয় লোক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই চেরগণ এক্ষণে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাংলার সীমান্তে পালামৌ নামক স্থানে চেরগণ চোহান বংশীয় রাজপুত মধ্যে গণ্য। তাহাদের সামাজিক অবস্থাও উন্নত। এই স্থানের চেরগণ রাজপুতের ন্যায় উপবীত ধারণ করে ও ব্রাহ্মণাদির গোত্র নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ছোট নাগপুরের চেরগণের সামাজিক অবস্থা ভাল নহে। তাহারা তসরের সুতা ও গালা তৈরী করিয়া থাকে। এজন্য তেজপুরের চেরগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

প্রাচীনকালে চেরগণ আপনাদিগকে মহানাগের সন্তান অর্থাৎ নাগবংশীয়

বলিত। একসময়ে তাহারা অযোধ্যা হইতে নিম্নবঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের আক্রমণে অযোধ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের পুত্রগণ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বসতি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে নাগকন্যা বিবাহ করিয়া কুশের অযোধ্যা পুনরুদ্ধার করার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই চেরগণ সেই নাগজাতী। কুশের সময় হইতে ইহারা রাজপুত ক্ষত্রিয়মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

চেরগণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ এই যে তাহারা চৈনমুনীর বংশধর। উক্ত ঋষি কোন সময়ে এক চেরজাতীয় রাজকন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। গয়ায় এক শিলালিপিতে কুড়ীচন্দ্র নামক জনৈক চেররাজের উল্লেখ আছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা শবর জাতী কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। এক্ষণে কনোজীয় ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা চেরগণের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। সমাজে তাহাতে তাঁহাদিগকে অপদস্থ হইতে হয় না।

বৈদিককালে যে চেরজাতী হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিল, আর্য্য সভ্যতার সংশ্রবে তাহারা এক্ষণে রাজপুত পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও হলকর্ষণ করে, শকট চালায়, কয়লার খনিতে মজুরী করে, তথাপি তাহারা যে এক সময়ে প্রবল জাতী ছিল তাহা এখনও ভুলে নাই। তাহাদের আভিজাত্য বিলক্ষণ আছে এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা বিষয়ে তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা শীল।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বগধ জাতী আধুনিক বাগ্দী। কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদে বগধ স্থলে ব্যাধ হইয়াছে। কাজেই সে ভ্রম এবারে সংশোধন করিতে হইল। যদিও এ পর্য্যন্ত বগধকে কেহ বাগ্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বগধই বাগ্দীরূপে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাগ্দীকে সকলেই দ্রাবিড়জাতীয় মনে করেন। এবং সকল পুরাতত্ত্বজ্ঞই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালে দ্রাবিড়জাতী বাংলায় অধিবাসী ছিল। সুতরাং একমাত্র নাম সাদৃশ্য ধরিয়াই যে আমি বগধদিগকে বাগ্দী বলিয়াছি তাহা নহে। যদিও নাম সাদৃশ্য ধরা যায়, তাহা হইলে বগধ শব্দের সহিত বাগ্দীর সাদৃশ্য অধিক, অথবা—বকদ্বীপীর

সহিত সাদৃশ্য অধিক, সকলে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিবেন, আমার অনুমান ঠিক কিনা। বিশেষতঃ যে চেরজাতীর সহিত বগধ জাতীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহাদিগকে একবাক্যে সকল পুরাতত্ত্ববিৎ দ্রাবিড়জাতীয় স্থির করিয়াছেন। গ্রাম্য বাগ্দীর আকার প্রকার রীতিনীতি দেখিলে সহজেই তাহাদিগকে অন্যান্য জাতী হইতে পৃথকরূপে ধরিতে পারা যায়। সুতরাং বাগ্দী যে বগধের বংশধর তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

আর্য্য সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়া বাগ্দীরা কিরূপ উন্নত হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে। তাহারা আপনাদিগকে এক্ষণে হরপার্ব্বতীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আমাদের দেশে শিবের গীত যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে কামভষ্মকারী স্থানুপুরুষের নামে অনেক চরিত্র স্খলনের কথা আছে। তাহার একটি প্রবাদ এই যে, কোন সময়ে মহামায়া দেবাদিদেবের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার জন্য অথবা তাঁহার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য ধীবর স্ত্রীবেশে মহাদেবের নিকট নিজ কামনা প্রকাশ করেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আশুতোষ কাহারও কামনা অসিদ্ধ রাখেন না। তিনি মহাদেবীর কামনা পূর্ণ করিলে দেবী নিজরূপ ধারণ করিলেন। ইহাতে দেবাদিদেব রুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তাঁহার যে সন্তান হইবে লোকে তাহাকে বাগ্দী বলিবে। এবং দেবী যেমন ধীবর রমণী রূপধারণ করিয়া ছিলেন তাঁহার সন্তানেরাও সেইরূপ মৎস্যজীবী হইবে।

আরও কয়েকটি প্রবাদ আছে, তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রবাদ বাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়, আর্য্যসংশ্রবে আসিয়া বাগ্দীরা আপনাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদায় কতদূর উন্নত করিয়াছে। এবং আপনাদিগকে হিন্দু দেবদেবীর বংশধর মনে করিতেছে। তাহাদের উপাস্য দেবতা শিব ও দুর্গা। তবে কেহ কেহ বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের পূজাও প্রচলিত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনসাদেবীকে তাহারা সমধিক মানিয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অর্থাৎ দশহরার পর হইতে প্রতি পঞ্চমীতে বিশেষতঃ নাগপঞ্চমী দিনে সমারোহের সহিত মনসাপূজা হইয়া থাকে। বাগ্দীগণের মধ্যে তেঁতুলিয়া বাগ্দী সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তাহাদের আচার ব্যবহারও জলাচরনীয় হিন্দুর ন্যায় হইতেছে। তাহাদের আনীত গঙ্গাজলও চলিত হইতেছে। অপরাপর হিন্দুগণের ন্যায় তাহাদের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। এমনও শুনা গিয়াছে

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বনগাঁর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একটি বাগ্দী রমণী বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সামাজিক আদর্শ যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় হইতেছে তাহাতে সন্দেহ কি ?* বর্ণশ্রেণীর ব্রাহ্মণদ্বারা বাগ্দীরা পূজাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অন্যান্য শ্রেণী তাদৃশ উন্নত হইতে পারে নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (বি-এ)

বিবিধ

—o—

বাঙ্গালী পল্টন ;—বিন্দু বিন্দু বারি সমুদ্রের আকার ধারণ করে, যে দিন বাঙ্গালী সৈন্য সংখ্যা দুই শতের সংবাদ আমরা শুনি, সে দিন মনে হইয়াছিল, কবে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য সংখ্যা দেখিব। আজ সে দিন আসিয়াছে। এখন মনে হইতেছে প্রয়োজন হইলে শীঘ্রই একলক্ষ বাঙ্গালী ভারতরক্ষী সৈন্য শ্রেণীতে নিযুক্ত হইবে। সম্প্রতি ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী লিখিতেছেন, "সুপ্রীম কাউন্সীলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতরক্ষী সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে ৭৪০খানি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় তৃতীয় স্থান পাইয়াছে। এই হিসাব ঠিক নহে, কলিকাতা ইউনিভারসিটি কোরের পক্ষ হইতে উপাধিধারী ও অন্যান্য ছাত্রের ১,০১৩ খানি দরখাস্ত আমি স্বয়ং মিঃ ক্লার্কের কাছে পাঠাইয়াছিলাম। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের কলেজ সমূহ হইতে ৩১৯খানি এবং ইউনিভারসিটি কোরের আফিস হইতে বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ৩৭খানি দরখাস্ত পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশ সর্ব্ব প্রথম কিম্বা ব্রহ্মের কাছাকাছি গিয়াছে।" (সঞ্জীবনী)

কংগ্রেসে মতভেদ;—আবার কংগ্রেসে মতভেদ উপস্থিত হইল। মতভেদ অবশ্য সজীবতার লক্ষণ, ইহাতে ভয় পাইবার কথা নাই ; তবে সত্যের সঙ্গে মানবীয় আমিত্ব অভিমানও কিছু কিছু থাকে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

* সর্ব্বত্র কেবল কঠোর বিধি পালনেই ধর্ম্ম হয় না, অথবা যখন প্রকৃত ধর্ম্মভাব মানুষ ভুলিয়া যায়, তখন বিধি নিষেধের বন্ধনই অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং স্থল বিশেষে তাহার ফল মৃত্যু পর্য্যন্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? (সম্পাদক)

সে আমিত্ব দূরের একমাত্র উপায় প্রবল প্রেম। ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যেও মতভেদ সর্ব্বদা ঘটে, পরমপিতার প্রেমে তাঁহার সন্তানগণ এক হন। স্বদেশের সেবায় মতভেদ হইলে, সেখানেও ঐ পথ, জননী-জন্মভূমির প্রতি প্রবল প্রেমে, আমিত্ব অভিমান দূর হইয়া যায়, তখন সেবকদল এক হইয়া দেশের সেবা করিতে পারেন। বর্ত্তমান কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়াই মতভেদের প্রধান কারণ, কিন্তু প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী চাহিতেছেন কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার যেন অন্যথা না হয়; এই মহা অভিপ্রায়ে সকল মত কি এক হইবে না? নতুবা দারুণ লজ্জা, সকলে কেমন করিয়া মস্তক পাতিয়া সহ্য করিবেন?

সাদার উপর কালি দেওয়া ;—নূতন সংস্কারে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা নূতন গঠনে সকল বিষয়েই যে সিদ্ধহস্ত তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ আদর্শও উচ্চ। পুরাতনের প্রতি অনুরাগী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের প্রাণে পুরাতনের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলির প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। নূতন সংস্কার পন্থী সে গুলিকে বিনাশ করিতে পারিবেন না; যাঁহারা জ্ঞানী ধার্ম্মিক ধীরমতি তাঁহারা তাহার প্রয়াসীও নহেন। তাঁহারা পুরাতনের মৃতশরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে প্রয়াসী। ইহার মাঝামাঝি উভয় দলেই আত্মপ্রতারিত স্বার্থপর মানুষের স্থান আছে, সুতরাং কাযও আছে, সে কায সাদার উপর কালি দেওয়া—উচ্চ আদর্শগুলির উপর বিকৃত ভাব আরোপ করিয়া জনসাধারণের চক্ষের সম্মুখে ধরা। ইহাতে সাধারণ মানুষেরই চিত্ত-বিভ্রম ঘটিতেছে, জ্ঞানীর পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না। এক একটি করিয়া দেখানো যায় যেমন (১) বাল্যবিবাহ রহিত, (২) জাতিভেদ রহিত, (৩) অবস্থা বিশেষে বিধবা বিবাহ বিধি, (৪) স্ত্রীশিক্ষা (৫) প্রেম-ভক্তিযোগে উচ্চ আদর্শের ব্রহ্মোপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চভাবের পরিবর্ত্তে বিকৃতভাবের বিকৃতব্যাখ্যা জনসাধারণের মনে অঙ্কিত করা হইতেছে! এ ছাড়া দেশের মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রাণের উচ্চ ভাব সম্বন্ধে হীনভাব আরোপ করিয়া নানা কারণে নানা সুযোগে জনসাধারণের প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা জিনিষটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া, বিদ্রুপ উপহাসের সৃষ্টি করা হইতেছে। এ কাযে সংবাদপত্রই প্রধান। "এডুকেশন গেজেট" একখানি

শিক্ষা সংক্রান্ত শিষ্টাচার বিশিষ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরাতন সাপ্তাহিক পত্র সকলেই তাহা জানেন। সম্প্রতি তাঁহাকেও এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া স্বভাবতঃ দুঃখ হয়,—কেন না এত আর "নায়ক" নয়? ২২শে ভাদ্র, ৪২৬ পৃ: বিবিধ কলমে ৺ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর উক্তি শ্রাবণের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন, "রবিবাবুর একটি গান আছে অয়ি ভুবনমোহিনী মা, মাকে সন্তানে সকলের মোহিনী বলিতে পারে?" কিন্তু ঐ গান রবিবাবুর নয়, চিরঞ্জীব শর্ম্মার একটি গান আছে, "মা ভুবনমোহিনী * * * ভক্তহৃদি বিলাসিনী, তারিণী, বহুরূপিণী।" এ কি নীচভাবে ভুবনমোহিনী? আবার বলিতেছেন, "রবিবাবুর আর একটি গান মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রোজ কেন পাই না, এটী আজ কাল ধর্ম্মসঙ্গীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাইনা এই ব্রহ্মসঙ্গীত সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ, কিন্তু চিরদিন কেন পাইনা স্থলে রোজ কেন পাইনা, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহা কোন ব্রহ্মসঙ্গীতে নাই। উহা লেখকের নিজের বিকৃত ভাব। এইরূপ সাদার উপর কালি দেওয়া ক্রমাগত চলিয়াছে। ভরসা এই যে সত্যেরই জয় হইবে। মিথ্যা অসার যাহা তাহা চলিয়া যাইবে।

স্বদেশ-ভক্ত সারদাচরণ;—সর্ব্বজন বিদিত বাঙ্গালী নামের গৌরব বাবু সারদাচরণ মিত্রের পরলোক গমনে সমস্ত সংবাদপত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বহুমুখীন সাধু সচেষ্ট গুণ ও শক্তির কথা আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার বহুবিধ সদ্ভাবের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম; তাঁহার জন্মভূমি "হুগলী জেলার পানি সেহালা গ্রামকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই তাঁহার তেমন আরামদায়ক ছিল না। জরাজীর্ণ গ্রামটী স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। রাস্তাঘাট পুষ্করিণী করিয়াছেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুল করিয়াছেন। প্রাণটি তাঁহার পানি সেহালাতেই থাকিত।"

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—o—

গোবরডাঙ্গা—মিউনিসিপালিটী।

(প্রাপ্ত)

এই পুরাতন মিউনিসিপালিটীর বড় রাস্তা ও গলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। রেকর্ডে প্রত্যেকের নাম ও দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ অবশ্য নির্দ্দিষ্টই আছে, অথচ দেখা যাইতেছে, কি বড় রাস্তা, কি গলি পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। লোকেরা রাস্তার দুই পার্শ্বের জমী অল্পে অল্পে ঘিরিয়া

লইতেছে। সকলেই জানে এদেশে 'সাজার মা গঙ্গা পায় না'। সুতরাং বিবাদের ভয়ে কেহ কিছু বলে না—বলিলেও তাহার রক্ষা নাই। মিউনিসিপালিটীও চক্ষুকর্ণ রহিতের ন্যায় ব্যবহার করেন। রাস্তা মেরামতের সময় যদি প্রশস্ততা সর্ব্বত্র ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লওয়া হয়, তবে এরূপ ঘটিতেই পারে না।

এখানে অনেকেরই বাড়ীতে পাইখানা নাই, সুতরাং অনেকেই ঘাটে মাঠে পথে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, একে তো ম্যালেরিয়া বিষে দেশ জর্জরিত; তাহার উপর এই কাণ্ড। আর যাহাদের পাইখানা আছে, তাহাদের আরও বিপৎ। মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ময়লা ফেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, সুতরাং স্থানাভাবে পাইখানা পরিষ্কার করার সুবিধা হয় না। ইহাও একটা অল্প কষ্টের কথা নহে। আমরা বলি ল্যাট্রিন্ ট্যাক্স বরং বসুক লোকের এ যন্ত্রণা ঘুচুক, গ্রাম পরিষ্কৃত থাকিলে ততটা পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। যে টাকা ডাক্তার এবং ঔষধে যায়, ও শয্যায় পড়িয়া থাকাতে শারীরিক ও বৈষয়িক যে ক্ষতি হয়, তাহার তুলনায় এই ট্যাক্সের ক্ষতি কিছুই নহে। কর্ত্তৃপক্ষ বিচার করিয়া দেখুন কি করিলে দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। আমরা বলিয়া খালাস, কার্য্যের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত।

আর একটি কথা,—পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গার দক্ষিণ দিক বরাবর খোলা ছিল, ঐ খোলা মাঠে গোরু বাছুর চরিত। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যে গো জাতির বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, আর ঐ খোলা পথ দিয়া ওপারের উন্মুক্ত বায়ু গোবরডাঙ্গার মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, মানুষের সে বুদ্ধি বিবেচনাও ঘুচিয়া গিয়াছে, লোকে আপাততঃ লাভে, জ্ঞান হারাইয়া যমুনার আবরায় পুকুর করিয়া আর ঐ পুকুরের পাড়ে নানাবিধ গাছ পুতিয়া গ্রামের সর্ব্বনাশ সাধনের মূল পত্তন করিতেছে। দক্ষিণে যমুনার ধারে বাগান করাতেই ইছাপুর উৎপন্ন হইয়াছে, দিন কতক পরে গোবরডাঙ্গারও ইছাপুরের দশা হইবে। স্বীকার করি ঐ সমস্ত পতিত জমী উঠিৎ হইলে ভূস্বামীগণের কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু অতটুকু ক্ষতি স্বীকার না করিলে গ্রামের সৌন্দর্য্য থাকে না। আসন্নকালও ঘনাইয়া আসে। জমিদার বাটীর দক্ষিণদিকে যেরূপ খোলা ময়দানে গোরু বাছুর চরে, আমরা গোবরডাঙ্গার সমস্ত দক্ষিণদিকটা সেইরূপ দেখিবার আশা করি, তবে এ আশার সফলতা জমীদার মহাশয় দিগের হাত। গরীব পরমুখাপেক্ষী আমরা এক আবেদন ছাড়া আর কি করিতে পারি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩২৪ { সপ্তম সংখ্যা

নূতন সঙ্গীত

—o—

কানেড়া—কাওয়ালী।

যদি দেখা দিলে।
মাতৃরূপে—জননী রূপে,
তবে কর মা কোলে।
অধম সন্তানে,
করুণা নয়নে,
যদি মা চাহিলে;
পাপী ব'লে,
যদি না ত্যজিলে,
তবে ধৌত কোরে,
পূণ্য জলে,
কর মা কোলে।

ভক্ত কোলে ভগবতী,
দেখাও মা ও মূরতী,
ভক্তি ভরে লুটাইব—
তব পদ তলে।

হয়ে শুদ্ধ শান্ত,
চির মোহ অন্ত;
দাস হ'য়ে সেবি তব—
চরণ কমলে।

দাস—

পূজার অবকাশে

—:০:—

(পূর্ব্ববাংলা ভ্রমণ)

প্রতিবৎসর পূজার বন্ধে যেখানে যাই, এবং তাহাতে যে আনন্দ লাভ করি, প্রবন্ধ আকারে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণকে তাহার অংশভাগী করিতে চেষ্টা করি। বিগত কয়েক বর্ষে "পূজার উপহার" "পূজার অবকাশে", "কুশদহ ভ্রমণ" প্রভৃতি প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ আছে। বর্ত্তমান বর্ষের ভ্রমণ কিছু দীর্ঘ এবং বিধাতার প্রচুর আশীর্ব্বাদে পূর্ণ। গতবর্ষে গিরিডিতে ব্রাহ্মসমাজের নববিধান মণ্ডলীর অধিবেশন বা শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ভ্রমণের কথা বোধহয় আজো সকলে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন নাই। এবারে নোয়াখালীতে সেই "নববিধান বিশ্বাসী সমিতির" অধিবেশন ছিল। প্রথমত যখন নোয়াখালী উৎসবে যাইবার আহ্বান আসিল, তাহার পর ঘটনায় যখন দেখা গেল যে, এবার উৎসবে আমার সপরিবারে যাওয়া ঘটিবে না, তখন মনের সেই পুরাতন বাসনা (পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণেচ্ছা) প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সুতরাং তদুপযোগী ভাবেই একটু প্রস্তুত হইলাম। আবার সেই দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের পশ্চিমপ্রদেশ ভ্রমণের স্মৃতিও জাগ্রত হইয়া মনকে সাহস, বল ভরসায় বিশেষ রূপেই প্রস্তুত করিল।

উৎসবের আহ্বান ধ্বনি ;—যথা সময়ে উৎসবের আহ্বান ধ্বনি বিশ্বাসী সমিতির কার্য্য প্রণালীসহ প্রাপ্ত হইলাম ; সমিতির আহ্বান, মায়ের ডাকরূপে আসিয়া এই দীন-দাসের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিল।

আহ্বান

"বিশ্বাসী ভাই, বিশ্বাসী ভগিনী,

নববিধান-বিশ্বাসী-সমিতি মায়ের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমাগত। একযুগ—দ্বাদশ বৎসর মায়ের অযাচিত করুণায় সেই গুরুতর কার্য্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়া সমিতি আজ ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিতেছে। আজ "মায়ের সহাস্য মুক্তি, প্রফুল্ল বদন।" "মার কোটি রূপের সার রূপ এই হাস্যমূর্ত্তি।" "সেই হাস্য অমৃত-সরোবর।" "সেই হাস্যে যে মুগ্ধ হইল তাহার আর মৃত্যু নাই।" "মার মধুর হাস্যে সমস্ত নাস্তিকতা চূর্ণ হইল।" "মার মুখের সুন্দর হাস্য একটি সোণার শৃঙ্খল ;" সে শৃঙ্খলে সকলকে বাঁধিবেন। সমিতির মা উৎসবের দ্বার খুলিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। শুভদিনে শুভ মিলনে তিনি নূতন আশা বিশ্বাস সঞ্চার করিবেন, নব উদ্যম উৎসাহে প্রাণমনকে পুলকিত করিবেন ;

নব আদর্শ, নব ধর্ম্ম, নব কর্ম্ম, নব সেবা, নব প্রেম পুণ্য দান করিয়া নব স্বর্গের অমৃত-ধারায় নবজীবন বিধান করিবেন। তবে আসুন, সকলে সপরিবারে সবান্ধবে মার পূজা, মণ্ডলীর সেবা, বিধানের জয় ঘোষণা করিয়া ধন্য হই। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।"

নোয়াখালী ;—৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে ৭টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে চট্টগ্রাম মেলট্রেণে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ও সাধকগণ এবং ৬।৭টি মহিলা মিলিত হইয়া আমরা ১৮।১৯জন একত্রে নোয়াখালী যাত্রা করি। প্রচারাশ্রমের যাত্রীদল প্রত্যূষেই সংক্ষেপে কিছু স্নানাহার সারিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। যাহা হোউক ১২টার পর গোয়ালনন্দ হইতে ষ্টীমারে উঠিয়া আমরা স্থান গ্রহণ করিলাম। প্রচারাশ্রমের সেবক—যিনি সমিতিরও সহকারী সম্পাদক, তিনি ষ্টীমার হইতে কিছু খাদ্য সকলের জন্য প্রদান করিলেন। ষ্টীমার চলিতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আশুতোষ রায় সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ষ্টীমার যাত্রী কয়েকটি স্ত্রীলোক কয়েকটি পয়সা দিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন। পয়সা কয়েকটি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া সেবক মহাশয়ের ঝুলিতে দেওয়া হইল। তারপর অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে আনিত চাউল, দাউল, আলু ঘৃত যোগে ষ্টীমারেই পরম সুস্বাদু খেচরান্ন প্রস্তুত হইল। যাত্রীদল অন্নদায়িনী জননীর হস্ত অন্নজলে অনুভব করিয়া সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। রাত্রে চাঁদপুর ষ্টেশন হইতে লাকশাম জংশনে ট্রেণ বদল করিতে হয় কিন্তু আমাদের একখানি সতন্ত্র ক্যারেজ পাইবার ব্যবস্থা থাকায় লাকশামে আর নামা উঠা করিতে হইল না, গাড়ীখানি চট্টগ্রাম মেল ট্রেণ হইতে কাটিয়া নোয়াখালীর ট্রেণে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তখন সময় খুব গরম ছিল, সমস্তরাত্রি পথে কোন কষ্ট হয় নাই। ৭ই প্রত্যূষেই আমরা নোয়াখালী পৌঁছিলাম।

নোয়াখালী জেলাস্কুল-বোর্ডিং বাড়ীতে যাত্রীদলের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। স্কুল বাড়ীর ভিতরদিকে মেয়েদের জন্য এবং হলঘরে সমিতির কার্য্য—অধিবেশন এবং উপাসনাদির জন্য সজ্জিত করা হইয়াছিল।

উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মৃদঙ্গের রবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীদলের কণ্ঠে মাতৃনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। ৮ই হইতে ১১ই রবিবার পর্য্যন্ত ৪দিন উৎসবের কার্য্য হইল। উপাসনা, কীর্ত্তন, আলোচনা এবং সমিতির অধিবেশনাদির মধ্যদিয়া জননীর প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া ভক্ত বিশ্বাসীদলের প্রাণকে শুদ্ধ ও সুখী করিল। এই হীনমতি দাসের প্রাণও উৎসবের স্রোতে

ভাসিতে ভাসিতে জননীর পদতলে গিয়া তাঁহার সুমধুর বাণী শ্রবণ করিল। জননী বলিতেছেন, "আমি কেবল প্রাণের প্রাণ রূপে নয়—কেবল আত্মার পরমাত্মারূপে নয়, অথবা অচিন্তনীয়-বাক্য মনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম রূপেও নয় কিন্তু আমি সম্বন্ধ রূপে—রাজা, প্রভু গুরু সখা বন্ধু সহায় সম্বল আশ্রয়দাতা পিতারূপে নিয়ত তোমার হইয়া আছি ; আর সকল সম্বন্ধের সার 'মা' হয়েও আছি। জীব মাত্রেই আমাকে মা বলিবার অধিকারী হইলেও শিশু-কণ্ঠের মাতৃনাম সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয়। সাধক ভক্ত যখন শিশু হইয়া—নিষ্পাপ হইয়া মা বলে তখনই আমার সাড়া পায়।"

জননীর বাণী শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিগলিত হইল। ভক্তিতে লুটাইয়া বলিলাম, "জননী, তোমার করুণা ভিন্ন কেমন করিয়া নিষ্পাপ শিশুত্ব প্রাপ্ত হইব ?"

জননী বলিলেন, "আমার কৃপাতেই নিষ্পাপ হইবে সত্য, আমার কৃপা অহেতুকী তাহাও সত্য, কিন্তু বিনা মূল্যে কৃপা পাবে না, তোমাকেও কিছু দিতে হবে।"

তখন কম্পিত কলেবরে, করযোড়ে বলিলাম ; মা, আমার কি আছে যে আমি তোমাকে তাই দিব।

জননী বলিলেন, "তোমার দিবার অনেক আছে। কেবল নিজ দেহ মন প্রাণ নহে, তোমার বলিয়া যাহা কিছু জ্ঞান তোমার হইতেছে তাহা সকলই আমার, সে সমস্তই আমাকে দিতে হইবে। তুমি তোমার নিজের বলিয়া তৃণটি পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবে না। কিন্তু দিলে আমি লইব না, শুদ্ধ করে আবার ফিরাইয়া দিব। তুমি আমারই প্রদত্ত সমস্তকে নিজের করে নিয়ে যে আমিত্বের ঘোরে পড়েছ, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে। আমিত্ব বিহীন ভক্তিই তোকে শিশুত্বে পরিণত করিবে।"

১২ই সোমবারেও সমিতির শেষ কায কিছু এবং মধুর উপাসনা হইল। তারপর আমি আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম , আমার উদ্দেশ্য স্থানীয় ভদ্র শিক্ষিত সজ্জন মণ্ডলীর যাঁহাদিগকে বিধাতার কৃপা পরিচালিত রূপে পাইব, তাঁহাদের সঙ্গে একটু সদালাপ করিয়া যদি কিছু প্রেমের আদান প্রদান করিয়া আমার পুঁজী বাড়াইয়া লইতে পারি এবং একটা মধুর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আবার বিধি-নিয়োজিত আপনার কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিতে পারি, আর কখন কখন যেমন ঔষধ ও পথ্যের

কায করে, তদ্রূপ "কুশদহ"র কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া যাহাতে বিনিময় সূত্রে নিজের কিঞ্চিৎ পাথেয় প্রাপ্ত হইতে পারি তাহারও চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করি।

নোয়াখালীর মুন্সেফ, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি নাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন গুপ্ত উকীল মহাশয়কে প্রাপ্ত হইলাম, ইনি একজন সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি। ইহাঁর সঙ্গে প্রসঙ্গ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। ইনি "কুশদহর" একটি গ্রাহক হইলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জয়দাপ্রসন্ন দত্ত উকীলের সহিত সহসা পথে আলাপ হয়। তাহাতে অল্প ক্ষণের মধ্যে তাঁহার সহিত কি এক রকম ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল. শেষ তাঁহারই গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলাম, এবং দুইদিনে আমি যেন এই পরিবারেরই একজন হইয়া গেলাম।

কিন্তু এদিকে এক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল,—বোধহয় অনেকেই জানেন, নোয়াখালী জেলার দক্ষিণে টাউনখানি—সমুদ্রবৎ মেঘনা নদীর এক উত্তরকূলে গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রতি নিয়ত এই স্থান নদীগর্ভসাৎ হইতেছে। নোয়াখালী জেলাস্কুল বাড়ী একেবারে নদী কূলে। ১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পূর্ণিমার দিন নদীতে বাণ ডাকিল, সেই সঙ্গে রাত্রে আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা নামিয়া বুধবার দিন নোয়াখালীর প্রকৃতি প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তী ধারণ করিল। কূলে কূলে জল ছাপাইয়া কিনারার পথশ্রেণী জলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে জলস্রোত প্রবেশ করিয়া সকলের প্রাণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সুতরাং নোয়াখালী থাকা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল, দুঃখের সহিত প্রিয়বন্ধু জয়দা বাবুর গৃহ হইতে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বৃষ্টিও বন্ধ হইল।

আমার মতো অনভিজ্ঞ লেখকের লেখনিমুখে নোয়াখালী জেলার প্রণালী পূর্ব্বক পরিচয়, প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নয়; তবে যে টুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

নোয়াখালী মুসলমান প্রধান স্থান। জনসংখ্যার শতকরা ৭০রের বেশী মুসলমান। অধিকন্তু অনেক হিন্দুকেও আকৃতিতে মুসলমানের ন্যায় দেখা যায়। সমস্ত নোয়াখালীর লোকসংখ্যা কমবেশ ১৩ লক্ষ; তন্মধ্যে টাউনে ৭ হাজার আন্দাজ। টাউনে ৪টি হাইস্কুল, তাহার মধ্যে একটি কলিকাতার

পাইকপাড়ার রাজা বাহাদুর অরুণচন্দ্র সিংহের স্থাপিত "অরুণচন্দ্র হাইস্কুল", রাজা বাহাদুরদিগের বিস্তৃত জমিদারীর কাছারীবাড়ী এখানে।

এখানকার অধিকাংশ মুসলমান তালুকদার। বৎসরে যাঁহার ৫৬০৲ টাকা জমির উপসত্ব, তিনিও তালুককার। কিন্তু এখন বহুলোকের জমি নদীগর্ভে যাওয়ায় তাঁহারা একেবারে নিস্ব হইয়া সামান্যভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ৫০ বৎসরে দশ মাইলের অধিকস্থান এখন নদীগর্ভে গিয়াছে। এখানকার অধিবাসী সকল শ্রেণীর লোকই স্বভাবত অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবাপন্ন। খাদ্যের মধ্যে চাউল, দুগ্ধ, ঘৃত অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুলভ ও অমিশ্র। টাউনটি বৃহৎও নহে নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে। স্কুল, পাঠশালা, বালিকাস্কুল,হাঁসপাতাল, টাউন হল, ডাকঘর এবং পথঘাটের অবস্থা মন্দ নয়। এখানে খৃষ্টীয় মিসনের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে এবং একটি ব্রহ্মমন্দির আছে। টাউনহলে একটি ক্লাব আছে,তাহাতে লাইব্রেরী এবং খেলার ব্যবস্থা আছে। বারাঙ্গনা বর্জ্জিত একটি থিয়েটার পার্টিও আছে,মধ্যে মধ্যে অভিনয় হয়।

এবার এখানে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উদ্‌যোগে কলিকাতা সুরাপান নিবারিণী সভার একটি শাখাসভা স্থাপিত হইল।

এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল না হইলেও এ সময় মন্দ নয়। অনেক পুষ্করিণী এখানে আছে। অধিকাংশের জল ভাল। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের জল আসিয়া কোন কোন পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত হয়।

শুনা গেল বেঙ্গল পার্টিশন হইবার পর অল্প সময়ের মধ্যে এখানে খরস্রোতে শিক্ষার উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু এখন পার্টিশন রহিতের পর হইতে আবার তাহা কিছু মন্দীভূত হইয়াছে।

এখানে বারুজীবি শ্রেণী অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই শ্রেণী প্রধানতঃ পান (তাম্বুল) ব্যবসায়ী। তাম্বুলী শ্রেণীর সহিত ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের যোগ থাকা খুব সম্ভব। পানের বরজ হইতে বারুজী বা বারুই--শেষ আরো একটু পরিবর্ত্তীত হইয়া বারুজীবি হইয়াছে কি না জাতি-তত্ত্বজ্ঞগণ তাহা নিরূপণ করুন। তাম্বুলীশ্রেণী গুড় চিনি ঘৃত ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভূত উন্নতি লাভ করায় সম্পূর্ণরূপে তাম্বুলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

কুমিল্লা ;—নোয়াখালী হইতে প্রথমত আগরতলা যাইবার জন্য বন্ধুবর ডাক্তার কাজী সাহেবকে পত্র লিখি। কিন্তু এসময় তথায় মহারাজা এবং

তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণ অনুপস্থিত থাকায়, তথায় গেলে আমায় তেমন কোন সুবিধা হইবেনা বলিয়া তিনি নিরুৎসাহ জনক পত্র লেখেন, সুতরাং প্রতিকূলতার মধ্যে গিয়া প্রথম উদ্যম নষ্ট করা অনুচিত বোধে প্রথমে কুমিল্লায় যাওয়াই স্থির করিলাম।

বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১৷৷০ টার সময় কুমিল্লা ষ্টেশনে পৌছিয়া তথায় এক হোটেলে রাত্রি যাপন করিলাম। বৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গেলেও অল্প অল্প শীত বোধ হইতেছিল, যাহা হউক তেমন অবস্থার মধ্যেও রাত্রে নিদ্রাদির বিশেষ কোন কষ্ট হইলনা, বুঝিলাম জননীর হস্ত বুকে থাকিলে কোন কষ্টই বোধ হয় না।

কুমিল্লায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত কোন ব্রাহ্ম বন্ধু বা আত্মীয় ছিলেন না, এ অঞ্চলে—পূর্ব্ববঙ্গে আর কখন আমি আসি নাই। তবে কয়েকটি ব্রাহ্মের নাম লিখিয়া আনিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ স্বর্গীয় গুরুদয়াল সিংহের পুত্র, কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক এবং "ত্রিপুরা হিতৈষী" সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সিংহপ্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কমনীয় কুমার সিংহের বাটীতেই আশ্রয় লইব ইচ্ছা করিয়া তথায় আসিয়া শুক্রবার প্রাতে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূর্ব্বের একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি · নোয়াখালী সমিতির কায শেষ হইলে কলিকাতার যাত্রীদলের কয়েকজন কলিকাতায় আর একদল কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার দিকে প্রচারার্থে, এবং মেয়েদের কয়েকটি ও ২৷৩টি আত্মীয় সহ চট্টগ্রাম ও চন্দ্রনাথের দিকে আমার অগ্রেই রওনা হইয়াছিলেন। কুমিল্লায় আসিয়া প্রচারক দলের সহিত কমনীয় বাবুর বাড়ীতে আমার সাক্ষাত হইল, তাঁহারা পূর্ব্ব ২৷৩ দিন তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য করিয়া অদ্যই ব্রাহ্মণবেড়িয়া রওনা হইলেন।

কমনীয় বাবু গম্ভীর প্রকৃতি সুন্দর যুবক। আমার আগমন সংবাদ পাইয়া আমাকে ডাকিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। যথাসময়ে যখন অন্নব্যঞ্জন দিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সহসা তাঁহার মুখখানি দেখিয়া আমার মনে হইল, বুঝি বা আমার কোন স্নেহময়ী কন্যা এখানে আসিয়া রহিয়াছে। অতঃপর অন্নজলের মধ্যে স্নেহময়ী অন্নদায়িনী জননীর হস্ত দর্শন করিয়া ভক্তিভরে সুখাদ্য সকল পান ভোজন করিলাম; এবং প্রায় পক্ষকাল এমন সচ্ছন্দে এগৃহে থাকিয়াই কুমিল্লার কাজে ঈশ্বর-কৃপায় সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম, এসকলই দয়াময়ের প্রত্যক্ষ করুনার নিদর্শন।

কমনীয় বাবুর বাটীর সম্মুখের নির্জ্জন গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যুষে শুনিলাম গৃহের পার্শ্বে অনতিদূরে ব্রহ্মনাম গান করিয়া কেহ উপাসনা করিতেছেন; শীঘ্র উঠিয়া দেখি পার্শ্বে এক কুটীরবাসী গৃহস্থ জনৈক বৃদ্ধ উপাসনা করিতেছেন। কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া তৃপ্ত হইলাম। শেষ পরিচয়ে জানিলাম ইনি শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিশ্বাস, নিবাস শ্রীহট্ট, কিন্তু এখন কুমিল্লায় অনেকদিন সপরিবারে আছেন, এখানে এক স্কুলে ক্লার্কের কাজ করেন; আমি সহজে অতি নিকটে তাঁহাকে সর্ব্বদা পাইয়া অনেক সময় অযাচিত আনন্দলাভ করিয়াছি। ইঁহার বালিকা কন্যাকে আমি "ছোট্ট মা" বলিয়া কত মিষ্ট হাসি উপহার পাইয়াছিলাম।

শ্রীমান্ কমনীয় বাবু হইতে কুমিল্লা সহরের গণ্যমান্য কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের তালিকা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত বাবু সতীশচন্দ্র রায় জমিদার এবং মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করি। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি এমন সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন যে,আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাই। তিনি "কুশদহের" একটি গ্রাহক হইলেন এবং আমি যে পর্য্যন্ত কুমিল্লায় ছিলাম প্রায় প্রত্যহ যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাত হইয়াছে, তখনই তিনি পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জন-হিতকর নানাবিধ সাধারণ কাযে এত ব্যস্ত যে, প্রায় কোনদিনই তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্যও নিশ্চিন্ত ভাবে পাইলাম না। এজন্য তাঁহাকে শান্ত মূর্ত্তিতে না পাইয়া কর্ম্মঠ-মূর্ত্তিতে পাইয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল।

এখানে বিধাতার আর একটি করুণার নিদর্শন প্রকাশিত হইল; প্রথম দিনেই সতীশ বাবুর সহিত আলাপের সময় তাঁহার গৃহে আর একটি বন্ধুকে পাইলাম : যাহাকে এখন বন্ধু সম্বোধন ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। কারণ তিনি কয়েক দিনের মধ্যে চির পরিচিত পরম বন্ধুর ন্যায়ই হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার নাম বাবু শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি জমিদার, এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট—আরো কত কি। অর্থাৎ কুমিল্লা সহরে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পরদিন প্রাতে ইঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হই; তখন সেখানে আরো কয়েকটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন; শ্রীশ বাবু প্রথমে সরলভাবেই আমাকে এই প্রশ্ন করেন। "জগতকর্ত্তা ভগবান্ একজন আছেন ইহা না হয় বিশ্বাস করিলাম,

কিন্তু তিনি যে দয়াময় তাহা তো মনে হয় না। অর্থাৎ দয়াময়ের রাজ্যে মানবের এত দুঃখ কেন ?" ইহার উত্তরে আর একটি ধর্ম্মবন্ধুর সঙ্গে প্রসঙ্গের মধ্যে ঐ ভাবের একটি কথা শুনিয়াছিলাম, তখন তাহাই আমার মনে পড়িল জাগিল এবং তাহাই বলিলাম ; সে কথাটি এই—

"কোন মায়ের কয়েকটি সন্তান ; একটি রৌদ্রে খেলায় মত্ত, মা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, সে কিছুতেই খেলা ছাড়িয়া আসিবে না, মা পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া ধরিয়া আনিয়া ঘরে বিছানায় শোয়াইলেন। আর একটিকে ক্ষুধার্ত্ত জানিয়া সন্দেশাদি সুখাদ্য আহার করিতে দিলেন, কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে আর একটির জ্বর হইয়াছে, তাহাকে তিক্ত ঔষধ ও সাগু খাইতে দিলেন, সে তাহা খাইবে না। তাহার প্রতিও বলপ্রয়োগ করিতে হইল। জগন্মাতার ব্যবহার ইহা অপেক্ষা অনন্তগুণে গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্যে পূর্ণ,তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?" যাহা হউক, ত্রয়োদশ দিন তাঁহার সঙ্গ এবং সৎ প্রসঙ্গ করিয়া যখন বিদায় লইব, তাহার পূর্ব্বে তিনি আমাকে এক মধ্যাহ্নে ভোজন করাইলেন। তিনি আমাকে প্রথমেই তাঁহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার গৃহে আপন ঘরের মত ছিলাম, তিনি হয়তো মনে করিবেন যে, আমার কোন কষ্ট হইল তাই অন্যত্র গেলাম, এজন্য তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই।

তাঁহার পুত্রগণ এবং কন্যা জামাতা কলিকাতায় আমার বাসার নিকটেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে থাকেন ; পুত্রগণ ও কন্যাটি ছুটীতে এ সময় ওখানে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া আমি যাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করি এমন অনুরোধ করিলেন। কুশদহের গ্রাহক হইয়া, অবশেষে ভগবানের নামে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া কতই প্রাণের সদ্ভাব এবং ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। আর তাঁহার কোন কোন বন্ধুকে কুশদহের গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়া আমার উপকার করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার দ্বারা বাবু সতীশচন্দ্র আইচ জমিদার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। তিনিও কুশদহের গ্রাহক হইলেন, সতীশ বাবুও অতিশয় শান্তশিষ্ট ব্যক্তি।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা হয়। ডাক্তার উষারঞ্জন মজুমদারের নাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করি। অল্পক্ষণ আলাপের পর তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে যান ; একটু পরে

আমাকে তাঁহার বালক পুত্র আসিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যায় এবং উষারঞ্জন বাবু নিজ কুমারী কন্যা শোভনাবালাকে ডাকিয়া হারমোনিয়াম যোগে আমাকে সঙ্গীত শোনাইতে আদেশ করেন। শোভনার কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীত সাধারণ রকমের নয়—আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম যে, এত অল্প বয়সে বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট এমন প্রণালীশুদ্ধ ভাবে সঙ্গীত এবং তৎসহ লেখা-পড়ার চর্চ্চা করা, পিতামাতার কি গভীর যত্ন ও একাগ্রতার পরিচয়! বস্তুত, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম তারপর উষাবাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। তিনি যখন আমার সম্মুখে আসিলেন, তখন আমার আবার সেই বাৎসল্য ভাবই মনে আসিল। ভক্ত একস্থানে বলিয়াছেন, "যে ছেলেটা যতো খায় সে ততো লালায়," অর্থাৎ তাহার মুখে ততো লালা নিঃসৃত হয়। বাস্তবিক আমার ভাগ্যে কি শেষ এই অবস্থা ঘটিবে? স্ত্রীজাতিকে সৰ্ব্বত্র খাঁটীভাবে মাতা, ভগিনী, আর কন্যারূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। শোভনার জননী কেন জানি না, আমাকে আত্মীয়ের মতই মনে করিয়া আপন সুখ দুঃখের কথা কহিলেন, আমিও আমার জীবনে বিধাতার বিচিত্র লীলার মধ্যে সংসার-ধর্ম্মের ২১টা পরীক্ষার পরিচয় করিলাম। অল্প ক্ষণের মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধের নৈকট্য ভাব জন্মিয়া গেল, এ সকল প্রেমময়ের স্পর্শ-গুণের পরিচয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

এই কয়েকদিনে কুশদহের আরো কয়েকটি গ্রাহক পাইলাম এবং কুমিল্লা সহর বেড়াইয়া রাস্তাগুলি খুব পরিচিত স্থানের ন্যায় হইয়া গেল। এখানে ঔষধ বিক্রেতা সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। তিনি তাঁহার জন্ম-ভূমির জন্য অনেক সৎকার্য করিয়া, উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, সমগ্র ত্রিপুরা-রাজ্য এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ বৃটীশ শাসনাধীন, অপর স্বাধীন ত্রিপুরা বা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা (Hill Tippera) বৃটীশ শাসনাধীনের মধ্যে কুমিল্লা সদর। একটি সদর সাবডিভিসনের উপযোগী শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত, এবং শিক্ষা চিকিৎসাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি যেমন থাকা প্রয়োজন তাহা এখানে আছে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, এই স্থানটি উত্তম স্বাস্থ্যকর। এখানকার খাদ্যের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। মিহি চাউল ৫৲ টাকা মণ। চাউল ও কোন কোন দ্রব্যের ওজন ৮২৷৷৵০ সিক্কার। দুগ্ধ এবং

গাওয়া ঘৃত অধিকাংশ স্থলেই খাঁটী পাওয়া যায়। মৎস্য মাংসও খুব সুলভ।

এখানে এক একটি দীঘি যথা ধর্ম্মসাগর, রাণীদীঘি, নানুয়ার দীঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড জলাশয়গুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এগুলি বহু পূর্ব্বকালের খোদিত। এখন ইহা মিউনিসিপালিটীর অধীনে (রিজার্ভ ট্যাঙ্ক) কেবল পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন অসংখ্য পুষ্করিণী, তাহার অধিকাংশেরই জল ভাল। পার্ব্বত্য ভূমির কঠিন মাটীর জন্যই বোধ হয় জল এত স্বচ্ছ এবং লৌহকণা-মিশ্রিত, সুতরাং স্বাস্থ্যকর। সম্ভবত কঠিন মাটীর গুণেই জলাশয় সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে। কুমিল্লা মিউনিসিপালটীর আয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এখানকার ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা ভাল। রাত্রেরমধ্যে সমস্ত সহরের পাইখানা পরিস্কৃত হয়। রাস্তা ও ড্রেণ পরিষ্কার

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। তাহাতে আই-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। শীঘ্রই বি-এ ক্লাস হইবার সম্ভাবনা।

প্রথমে ৭ দিন এখানে থাকিয়া আগরতলা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কালীকচ্ছ গমন করি। এবং শেষ আবার কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিয়া ৬ দিন থাকিয়া, চাঁদপুর হইয়া ঢাকায় ১১ দিন থাকিয়া কলিকাতায় আসি। তদ্বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শান্তিপথে

নবম পরিচ্ছেদ

"আমরা যাত্রী"

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে, জন-বিহীন পল্লী পথে মুহ্যমান অবস্থায় সুবোধচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন। গ্রামের ভিতর মানব-কণ্ঠের দূর-শ্রুত অস্ফুট-ধ্বনিও নিকটের উচ্চ-নিনাদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ষষ্ঠীর চন্দ্র তখন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছেন। তারা-বধূগণ উচ্চ-চূড়ায় বসিয়া আপন আপন স্তিমিত আলোকে জনপদ সমূহের গোপন রহস্য-লীলা অবলোকন করিতেছে। নগরান্তদেশে শৃগালাদি হিংস্র পশু-সকল

বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক-পত্র-স্তূপের উপর দিয়া খস্ খস্ শব্দে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

সুবোধচন্দ্র নীরবে গ্রামের পথ ধরিয়া বিষণ্ণমনে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণদিকে ভাগীরথী কুল-কুল-স্বরে রাগিণী তুলিয়া কূলে কূলে সৈকতে সৈকতে মাথা ঠুকিয়া কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে যেন কাহার সঙ্গ-কামনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলিনী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সুবোধচন্দ্র সেই অন্ধকার পথে একাকী নিরাশ-হৃদয়ে সুরপুর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। গৃহ যাহার অরণ্য, প্রান্তরে তাহার ভয় কোথায়? তিনি চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রামের বসতি শেষ হইল, উদ্যান শ্রেণী ফুরাইল, অবশেষে ধান্যক্ষেত্রও ফুরাইল। তথাপি তাহার চরণের গতি থামিল না। কখন্ সুরপুরের সীমা অতিক্রান্ত হইল, তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। কিছু দূর এইভাবে যাইবার পর, একজন সন্ন্যাসী এক আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে সুবোধের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, এস, সুবোধ এস, এই সাম্নের ঘরে রাত্তিরটা কাটিয়ে যাও

সেই জনশূন্য পল্লীপথে হঠাৎ মানব-কণ্ঠের ধ্বনি শুনিয়া সুবোধ চমকিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে?

স। আমি একজন পথিক।

সু। আপনি কোথায় যাবেন?

স। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে যাবো। আমরা দুজনেই এক পথের পথিক ভাই,আমরা দুজনেই শান্তিপথের যাত্রী।

সু। আপনার হেঁয়ালি শোন্‌বার আমার এখন সময় নেই। ক্ষমা ক'রে আমায় যেতে দিন।

স। সুবোধ,কোন, ভয় কোরো না, আমি তোমার ভাই,অতি নিকট সম্পর্ক। আমায় অগ্রাহ্য কোরো না। আমি তোমার সব দুঃখের কথা জানি। আমার কথা শোনো, তোমার ভাল হবে।

সু। আপনি আমার কি রকম ভাই?

স। সব ব'লব, এস, এই ঘরে বসি। ঘরে গেলেই সব কথা ব'লব।

সুবোধচন্দ্র সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহপার্শ্বস্থ সু-বিস্তৃত

ও প্রশস্ত দেহলীর উপর, উন্মুক্ত আকাশ-তলে, গঙ্গার তীরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, সুবোধ, ভাই, আজ কয় দিন থেকে এই ঘরই আমার বাড়ী হয়েচে। গুরুদেব আমায় আনিয়ে এইখানে রেখেচেন। অল্পক্ষণ আগে তিনিই আদেশ করে পাঠালেন, তুমি এই পথ দিয়েই যাবে, তোমাকে এইখানে আজকের রাত্তিরের মত আশ্রয় দিতে হবে।

সুবোধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনার গুরুদেবকে প্রণাম জানাচ্চি; কিন্তু তিনি কে, যিনি এই হতভাগ্যকে গোপনে এত স্নেহ করেন?

স। তিনি তোমার পরিচিত, তোমার ভক্তির পাত্র, শাস্ত্রী মহাশয়।

সুবোধ এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকাবাবু! আপনার গুরু, তবে আপনি সন্ন্যাসীবেশে কেন?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, সব ব্যাধিরোগের কি একই রকম চিকিৎসা হয়? গৃহস্থাশ্রম আমার কাছে পাপের দরজা, তাই গুরুদেব আমায় এমন ক'রে ঘোরাচ্ছেন, কোনও জায়গায় একাদিক্রমে একমাস রাখেন না। তিনি এত দয়া ক'রে ঘোরাচ্ছেন বলেই বেঁচে আছি, ভাই।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুবোধকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ সেই অমৃতময় কাহিনী শুনিয়া সুবোধ বলিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর, ওসব কথা শুনে লাভ কি? সকল দেশের শাস্ত্রেই ওরকম দুটো চারটে কথা আছে।

স। ভাই, সবই শোনা ভাল। তোমার যে রকম মনের অবস্থা তাতে এই রকম দু'চারটে দৃষ্টান্ত মনে ক'রলে, দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা হবে। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাসের জোরেই সকল দুঃখ কেমন আনন্দ মনে বহন করলেন?

সুবোধ হাসিয়া বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসী, গভীর দুঃখের সময় বুকে যে কি শেল বেঁধে তা আপনি কি বুঝবেন?

স। দুঃখের কথা আমি খুব বুঝি, সুবোধ, তুমি পত্নীর হৃদয়-হীনতায় আর পিতার কঠোরতায় কষ্ট পাচ্ছ, আমি এর চেয়েও কষ্ট পেয়েচি। আমি স্ত্রীর বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখেচি। দেখে নীরবে সংসারের দিকে পিছন ফিরেচি।

সু। সে কি রকম? সব কথা খুলে বলুন, শুনতে ইচ্ছা করচে।

সন্ন্যাসী তখন আপন জীবনের মর্ম্ম-যাতনার কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। সে হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুনিয়া সুবোধ কোথাও হায়, হায়, করিলেন, কোথাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কাহিনী সমাপ্ত হইলে সুবোধ বলিলেন, এই সব সয়েও আপনি হেসে খেলে বেড়াচ্চেন কি ক'রে, ঠাকুর?

সুবোধের প্রশ্নে সন্ন্যাসী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, সব সময় হাস্‌তে পারি না, সুবোধ। যাতনায় বুকটা যেন মাঝে মাঝে ফেটে যায়; চোখের জল সব শুকিয়ে যায়, কেঁদেও জুড়ুতে পারি না; কিন্তু তবু যে মাঝে মাঝে হাসি, সে কেবল গুরুদেবের কৃপায়।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কি ক'রে এ কষ্ট সহ্য ক'রব?

সন্ন্যাসী তাহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, কোনও ভাবনা নেই। তুমিও সব সইবে। তুমিও শান্তি পাবে। কিন্তু কবে তা তো জানি না ভাই। এখন আমরা যাত্রী মাত্র। শান্তিধামে পৌঁছিলে, তবে সে খবর হয় তো দিতে পারবো, ভাই। এখনও সে যায়গায় যাই নি।

উভয়েই তখন স্ব স্ব জীবনের কাহিনীর তুলনা করিতে লাগিলেন। উভয় যুবকেরই হৃদয় পরস্পরের দুঃখে গলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাক্য বন্ধ হইল, স্ফুট ভাষা দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিণত হইল। দীর্ঘ শ্বাস তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত করিয়া বায়ু হিল্লোলে মিশিতে লাগিল। বায়ুর তরঙ্গ আবার নদী-বক্ষে আঘাত করিয়া ফেণ পূর্ণ প্রবাহের উপর বীচিমালা সৃজন করিয়া দুঃখের নূতন গান রচনা করিতে লাগিল।

ক্রমে উষার ক্ষীণ শুভ্র আলোক রেখা আকাশ প্রান্তে দেখা গেল। অদূরে নীড়ে বসিয়া বিহঙ্গমকুল প্রভাতী গাহিয়া নূতন দিনের আগমন কথা জানাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া স্নানে গমন করিলেন।

যেস্থানে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাহা একটি ধর্ম্মশালা। নিকটেই স্নানের ঘাট। ঘাটের দুই পার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির।

সন্ন্যাসী স্তব পাঠ করিতে করিতে ঘাটে নামিয়া যাইলেন। সুবোধ ঘাটে নামিলেন না, সোপান-শ্রেণীর উপর বসিয়া নদী জলে ভাসমান তরণী শ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিলেন মাত্র, লক্ষ্য কিছুই করিতেছিলেন না। ক্রমে প্রভাত-সূর্য্য উজ্জ্বল কনকালোকে দিগন্ত শোভিত করিয়া আকাশে উদিত হইল। ঘাটেও লোকের জনতা হইল, কত লোক ঘাটে নামিল, কত

লোক উঠিল। সুবোধ কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না। এক বৃদ্ধা বিধবা সিক্ত বসনে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, কে বাবা, সুবোধ, তুই এখানে বসে রয়েছিস্? আমি অমর্ত্তর কাছে কাল রাত্তিরেই সব শুনেচি। শুনে সমস্ত রাত্তির আমরা ঘুমুতে পারি নি। মনে করলুম, না জানি কি হলো, ছোঁড়া কোথায় গেল? যা হোক্, দেখা হ'ল, ভালই হ'ল। এখন চল্, ঘরে চল্।

সুবোধ এই বৃদ্ধা বিধবাকে চিনিয়া বলিলেন, মাসিমা, তুমি এখানে?

বৃদ্ধা বলিলেন, এখানে কি রে? এই তো, পতিতপাবণীর ঘাট। এই যে দ্বাদশ মন্দির, এই তো আমাদের গাঁ, শ্যামগঞ্জ। কাল তো এইখানেই তুই ছিলি, আজ এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি।

সুবোধ তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সমস্তই তাহার পরিচিত। সুরপুর হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি শ্যামগঞ্জে আসিয়াছেন। গত রাত্রে বিষম চিন্তাকুল থাকায় তিনি স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। যে বৃদ্ধাটি সুবোধের সহিত কথা কহিলেন, তিনি সুবোধের মাতার অভিন্ন-হৃদয়া বাল্য সখী। সুবোধ তাঁহাকে মাসীমা বলিতেন। এই বৃদ্ধার এক পুত্র আছেন, তাঁহার নাম অমৃতলাল বসু। তিনি সুবোধের বয়োজ্যেষ্ঠ, এখন ডেপুটিগিরি করেন। সম্প্রতি দুই বৎসরের "ফার্লো" লইয়া সস্ত্রীক বিলাত-ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ছুটীর অবশিষ্টাংশ স্বগ্রামেই যাপন করিতেছেন। সুবোধ ইহাঁকে দাদা বলিতেন।

অমৃতবাবুর মাতা সুবোধকে আপন পুত্রের ন্যায়ই স্নেহ করিতেন, উভয় পরিবারেই বংশানুক্রমিক আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

সুবোধ বলিলেন, আমি শ্যামগঞ্জের ঘাটে বসে আছি, তা আগে বুঝতে পারি নি। আচ্ছা, তোমরা আমার সব কথা শুনলে কি ক'রে মাসীমা?

বৃদ্ধা বলিলেন, শাস্ত্রী মশাই কাল রাত্রেই লোক পাঠিয়ে ছিলেন। অমর্ত্ত তোকে খোঁজবার জন্যে সকাল বেলাই ষ্টেশনে গিয়েচে।

সুবোধ। বেশ হয়েচে। তবে সেইখানেই যাই, দাদার সঙ্গে সেই-খানেই দেখা হবে।

বৃদ্ধা। সেখানে আবার কোথায় যাবি? এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল্। বাড়ী গিয়ে পাঁড়েকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেবো, এখন।

সুবোধ হাসিয়া বলিলেন, মাসীমা, আমি তোমাদের বাড়ী গেলে তোমরা যদি একঘরে হও? আমার যে জাত নেই।

বৃদ্ধা। সে ভয় আমি করি না। শ্যামগঞ্জে তো আর নগেন দত্ত নেই যে, সহজে একঘরে করার ঢেউ উঠবে। তুই এখন ঘরে চল।

সুবোধ আর আপত্তি না করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধি-পূজা

অন্নপূর্ণার ভবনে আসিয়া সুবোধ যেন এক নূতন জগৎ দেখিতে পাইলেন। সুরপুরে নির্য্যাতন ও স্বার্থপরতা যেন কর্ত্তব্যের সৌষ্ঠব-ময় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। আর এখানে সহৃদয়তা ও সেবা আনন্দ-মণ্ডলে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া আসিল। বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র অমৃত বসুর পত্নী, পুত্র ও কন্যা লইয়া, তাঁহাকে যে আদর অভ্যর্থনা করিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের বিষাদ কালিমা ধৌত করিয়া আনন্দাশ্রুর প্রবাহ শতধা হইয়া প্রবাহিত হইতে চাহিল। অমৃত বাবু ষ্টেশন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেমের বাহুবেষ্টনে তাঁহার হৃদয় মনকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন।

সুবোধ বাবু শ্যামগঞ্জে আগমনে ক্ষুদ্র-পরিসর গ্রামে একটা নীরব আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু সুরপুরের ও শ্যামগঞ্জের আন্দোলনের প্রণালী মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। সুরপুরে যাহা নির্য্যাতন ও শাসন ছিল, শ্যামগঞ্জে তাহাই বিস্ময়রূপে দেখা দিল। দুই এক স্থলে দুই একজন কেবল একটা অর্দ্ধস্ফুট প্রতিবাদের কথা গোপনে উচ্চারণ করিলেও অপর পক্ষের রক্তবর্ণ চক্ষু তাহার স্ফুরণ-পথে বাধা উৎপাদন করিল। এ গ্রামের নেতারা সংস্কার-বিরোধী ছিলেন না। সকলে বলিলেন, "অমৃত দু'চার দিনের জন্য মার কাছে এসেছে, দু'দিন পরেই চলে যাবে; এই নিয়ে মিছে একটা সোরগোল পাকিয়ে লাভ কি? পতিতপাবনীর ঘাটে মহিলা মজলিসে কয়েকদিন এই বিষয় একটু কানাঘুষা হইয়াছিল কিন্তু পরোপকার পরায়ণা স-হৃদয়া দানশীলা স্নেহময়ী শ্রীমতী অন্নপূর্ণার

খাতিরে সেই আলোচনা আর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধেরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিলেন, যুবক ও বালকেরা তাহাকেই বিস্ময় ও কৌতূহল-দৃষ্টিতে দেখিলেন। তাহারা দলে দলে আসিয়া অমৃত বাবু ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ বলিল, কই এরা তো সাহেব ও মেম হয় নি। কেহ বলিল, ও মা, এরা যে আমাদেরই মত আসনে ব'সে ডাল ভাত খায় গো।

ভূপতি নামক একটি যুবক বলিল, মেয়েটা কিন্তু বেশ গান করে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতি বলিল, আমার বে হ'লে বউকে এই রকম গান করতে শেখাবো।

ভূপতি বলিল, তার চেয়ে একেই বে করো না কেন?

শ্রী। দূর! মা দেবে না। ওরা যে বিলেত ফেরৎ।

এই ভ্রাতাদ্বয় পিতৃহীন, মাতাই ইহাদের সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহারা দুই ভাই কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করিত—জ্যেষ্ঠ তৃতীয় বার্ষিক ও কনিষ্ঠ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। শ্রীপতির বয়স অষ্টাদশ বৎসর আর ভূপতির বয়স ষোড়শ বৎসর। অমৃত বাবুদের সহিত ইহাদের একটা দূর সম্পর্কও ছিল।

সুবোধচন্দ্র তথায় আসিলে এই দুই ভ্রাতা তাহাদের অধ্যাপকেরা সহিত দেখা করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাতের গল্প করিয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং কয়েক খণ্ড কেক্ ও বিস্কুট ভক্ষণ করিয়া আসিল। বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীপতি বলিল, দেখিস্ মাকে যেন এই চা খাওয়ার কথা বলিস্ নি।

ভূপতি বলিল, কেন জাত যাওয়ার ভয়ে?

শ্রীপতি বলিল, দুর, জাত বুঝি আমি মানি? আমিও বিলেত যাবো কিনা, তাই গোড়া থেকে একটু সাবধানে থাক্‌তে চাই। এখন মা এ সব টের পেলে, বড়ই গোল বাধাবে।

ভূ। সত্যি দাদা, তুমি বিলেত যাবে?

শ্রী। সত্যি না তো কি মিথ্যে রে? না হ'লে এত জোরে বিলেতের খোঁজ নিচ্ছিলুম কেন?

ভূপতি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, তুমি ফিরে এলে তবে আমিও যাব। কেমন দাদা?

শ্রীপতি গম্ভীরস্বরে বলিল, বেশ।

সন্ধ্যার সময় অমৃত বাবুর পত্নী, পুত্র অসিত ও কন্যা অসীমাকে লইয়া সুবোধ বাবুর সহিত নানাপ্রকার হাস্যামোদে রত হইলেন। অসিত অসীমা সঙ্গীত করিল। এই সকল অনাবিল আমোদ তরঙ্গের মধ্যে শ্রীমতী সীতা বলিলেন, সুবোধ বাবু, কিছু মনে করবেন না, আমার তো মনে হয় আপনি ইচ্ছা ক'রলেই আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে পারতেন?

সু। কি ক'রে?

সীতা। একটু কড়া মেজাজে জোর দেখালেই হ'ত। এদেশের মেয়েদের মন তো কাদার ড্যালামাত্র; যা গড়্তে চাইবেন, তাই গড়্তে পারবেন।

অমৃতবাবু বলিলেন, না হে ভায়া, না; আমার গিন্নীর কথায় বিশ্বাস ক'রো না। উনি যাকে কাদার ড্যালা বলচেন, আমি তো দেখ্চি সেটা পাথরের চেয়েও শক্ত।

সীতা হাসিয়া বলিলেন, তোমার খাতিরে এত করলুম তবু বল্বে শক্ত। অমন ঠাট্টা করলে সত্যি সত্যিই শক্ত হব, তখন আর কিছুতেই হেলবো দুলবো না।

অমৃতবাবু তখন পরাজয় স্বীকার করিলে সুবোধবাবু বলিলেন, আমি তাকে বোঝাবার সময় পেলুম কই, বউদি? একটু কথা হ'তে না হ'তেই সব যে ফস্কে গেল।

সীতা বলিলেন, আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্বো। দেখি আমার হাতে সে বীণার তার বাজে কি না? আর কিছু না পারি তো ললিতাকে চুরী ক'রে আনবো।

অসিত বলিল, হাঁ মা, আমরা বিলেত থেকে এসে অবধি ললিতাকে দেখিনি, তাকে নিয়ে এসো।

অসীমাও তাহার অ-বেণী-বদ্ধ কুঞ্চিত কেশদাম দুলাইয়া বলিল, হ্যাঁ মা, লক্ষীটি, কালই কেন ললিকে এখানে আনো না?

পরদিন অমৃত বাবুর মাতা এক দ্বারবান ও এক পরিচারিকা সঙ্গে সুরপুরে হরকান্ত বাবুর বাড়ীর সন্ধি-পুজা দেখিতে যাইলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে গৃহস্বামীর বসিবার কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর চারিদিকেই গোলমাল, তিনি সে সকল কিছু লক্ষ্য

না করিয়া মিত্র মহাশয়ের নির্জ্জন কক্ষে, টানাপাখার মৃদু বায়ু কম্পন স্থলে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ তখন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সট্‌কার সুবর্ণ নির্ম্মিত নল মুখে দিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেছিলেন।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ললাটের উপর অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ টানিয়া দিয়া বলিলেন, মিত্তির মশাইয়ের কি ঘুম হচ্চে না কি?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিত্র মহাশয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যে উপবেশন করিয়া বলিলেন,ঘুমুইনি ভাই, তোমারি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। এখন দেখচি,স্বপ্নটা সত্যি হ'ল। বলি,একেবারে ভুলে গেলে? সই থাকতে কত আসা যাওয়া ছিল, আর এখন সব পর ক'রে দিয়েচ। ইত্যাদি প্রকার আলাপের পর তিনি বেহারাকে আদেশ করিয়া নিকটে মখমলের আসন বিছাইয়া বৃদ্ধাকে বসাইলেন। আসন গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, আর আস্‌বো কি? লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ীতে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। সই থাক্‌তে তুমি মানুষ ছিলে, আর এখন তোমার বাহাত্তুরে ধরেচে, মানুষ আছ কি না বুঝ্‌তে পারচি না।

মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, আমায় কি দেখ্‌লে? আমার যে এখন নব-যৌবন ফিরে আস্‌চে। আবার বে কর্‌বার ইচ্ছে কর্‌চে। তোমরা একটা নূতন সই টই জুটিয়ে দেবে কি?

বৃদ্ধা। দেবো বই কি? তা আর দেবো না? এইবার একেবারে কাঁধে খড়ে বের যোগাড় করব।

মিত্র মহাশয়। বলি, ও সই, একেবারে চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে হাজির কেন গা? হয়েচে কি?

বৃ। হয়েচে, তোমার মাথা আর তোমার নগেনের মুণ্ডু। বলি, ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়ালে কেন?

মিত্র মহাশয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি একবার সম্মুখের দেয়ালের দিকে চাহিলেন, সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর তৈল-চিত্র ছিল। পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে বলিলেন, কি করি, সমাজ!

বৃ। চুলোয় যাক্ তোমার সমাজ। সমাজ নিয়ে কি তুমি ধুয়ে খাবে? কাকে নিয়ে তোমার সমাজ? ছেলেই যদি গেল, তো সমাজ নিয়ে তুমি করবে কি?

এইভাবে কিছুক্ষণ কথার পর বৃদ্ধা অন্দর মহলে বীণার কক্ষে যাইয়া

তাহাকেও "নির্বোধ মেয়ে", "বোকা মেয়ে," বলিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ভৎর্সনা করিলেন। তাঁহার এই সকল নির্দ্দোষ তিরস্কার বাক্য শুনিয়া চম্পকবরণী স্বামীকে বলিলেন, ওগো, বুড়ী এল যেন তাড়কা রাক্ষুসী, কথা তো কইলে না, যেন আগুণ ছড়ালে।

কিছুক্ষণ পরে সন্ধি-পূজার আরতি আরম্ভ হইল। চারিদিকের ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টার দিগন্ত-কম্পি নিনাদে পূজা বাটীর মধ্যে এক নূতন ভাব সৃজন করিল। উচ্চচূড় অতিকায় নৈবেদ্য এবং পুষ্প ও বিল্ব পত্র ও হোম দ্রব্যের বাহুল্য, দর্শকমণ্ডলীর ভক্তি-নত আনন, আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি, এবং যোড় হস্তে, "মা," "মা" ধ্বনি পূজা বাটীর বায়ুতরঙ্গের উপর সাত্ত্বিকতার তরঙ্গ উত্থিত করিতেছিল; পুরোহিত মহাশয়ও অবসর বুঝিয়া তাঁহার শিক্ষিত হস্তের কম্পন-কুশলতায় ভক্তি-প্রবাহকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। আরতির পর সকলে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবনত মস্তকে দেবীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া একে একে বিদায় হইলেন। অন্নপূর্ণাও চলিয়া গেলেন।

আরতি শেষ হইবামাত্র শ্রীমতী চম্পকবরণী কম্পিত ও দ্রুত-পদবিক্ষেপে আপন কক্ষে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নয়নের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া দ্রুত তাহার নিকট আসিয়া এই অপ্রত্যাশিত ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পত্নী বলিলেন। ওগো আমার বড় ভয় করচে। এখনও বুকটা ঢিপ ঢিপ করচে।

স্বামী। কেন?

স্ত্রী। একটা বড় ভয় দেখলুম, যেন মা দুর্গা তাঁর দশহাত বার ক'রে, চোক পাকিয়ে বল্লেন, "রাক্ষুসী, এখনও ফের্!" আমি মনে কল্লুম, আমার দেখবার ভুল হয়েচে। দু হাতে ভাল ক'রে চোখ রগড়ে আবার মাকে দেখলুম। এবার দেখি, তিনি আর মা দুর্গা নন, তিনি কালী হয়েচেন। ঠিক্ যেন কালীঘাটের কালী। তেমনি রক্তমাখা জিব, লাল ডগডগে তিনটে চোখ, হাতে রক্তমাখা খড়্গ আর টাট্‌কা কাটা মানুষের মাথা। ওগো, বড় ভয়ানক—বড় ভয়ানক! আর বলতে পারি না, আমার ভয় করচে! মা বল্লেন, তোর সর্ব্বনাশ করব,—আর— আর—"

চম্পকবরণীর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছিল, বাক্য জড়াইয়া যাইতেছিল, বক্ষস্থল স্ব-জোরে কাঁপিতেছিল।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, থাক্, থাক্ আর বলে কায নেই। অন্য সময়

সব শুনবো। এই বলিয়া আলমারীর ভিতর হইতে একটা ঔষধ আনিয়া পত্নীর নাসিকাগ্রে ধারণ করিলেন। তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরদিন বৈদ্য আসিয়া চম্পকবরণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে। তিনি তাহার জন্য যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাত-চিন্তামণি ও বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে পূজাবাটী হইতে একে একে সকলে বিদায় হইলেও বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় বাহিরে আসিলেন না। শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তরের সোপানের একপার্শ্বে একাকী বসিয়া রহিলেন। অদূরে পরিচারকগণ তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিকটে আসিয়া বলিলেন, মিত্তির মশাই, চলুন, ভেতরে যাই। রাত্তির অনেক হয়েচে। বিশ্রাম করবেন চলুন।

শাস্ত্রী মহাশয়কে নিকটে পাইয়া বৃদ্ধ যেন অকূলে কূল পাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ক্রন্দনের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় তাঁহার শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি বলিলেন, গুরুদেব, আমার সন্ধি-পূজা এখনও হ'ল না; বুঝি এ জীবনে তা হবেও না। আমার প্রাণ চাচ্চে সুবোধকে আঁকড়ে ধরতে, কিন্তু সমাজ তাতে বাধা দিচ্চে। নগেন শক্ত হ'তে বলচে। কিন্তু আমি যে আর শক্ত হতে পাচ্চি না। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বলুন তো কি ক'রে আমার সন্ধি-পূজা সফল হবে।

বহুক্ষণ দুইজনে আলাপ করিবার পর শাস্ত্রী মহাশয় শেষ কথা বলিলেন, এখন আপনি আর সব ছেড়ে দিয়ে কেবল ধর্ম্মের দ্বারাই সংসারকে বিবৃত বলে দেখুন। তাঁর দিকে চেয়েই সকল কায করুন, সমাজের দিকে চেয়ে নয়; নগেন বাবুর আদেশ মতও নয়।

মিত্র মহাশয় ক্রমে সুস্থ হইয়া আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। পূজাবাটী নীরব হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুশদহের ইতিহাস

গাঁড়ার জাতীয় লোক কুশদহে এখন বিরল। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে কুশদহের কয়েক স্থানে ইহাদিগকে দেখা যাইত। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মুড়ী কুটকলাই বিক্রয় করিত। পুরুষেরা নৌজীবী ছিল। ইহাদিগকে অনার্য্য বলিতে পারা যায় না। কোন কোন লেখক ইহাদিগকে গ্রীক গ্রন্থোক্ত গঙ্গারাড়ী বংশ সম্ভূত বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা যেরূপ সাহসী, সত্যবাদী ও সরল তাহাতে ইহারা যে কোন সময়ে সামাজিক উন্নত অবস্থায় ছিল, তাহা বিশ্বাস হইতে পারে। গাঁড়ারের নৌকা জলদস্যুরা আক্রমণ করিতে সাহস করে না। পূর্ব্ববঙ্গে পলোয়ার নামক নৌকা ইহারাই চালাইয়া থাকে এবং বাণিজ্যার্থ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে।

ইহাদের গোত্র আলম্যান। পতিত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। তবে মনসা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে কচ্ছপ বলি দিয়া মনসা পূজা করিয়া থাকে এবং অনেক সময় সত্যনারায়ণের পূজা দিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে খালকুমারী নামে জলদেবতার পূজা হয়। মুসলমান রাজত্ব সময়ে ইহারা সকলে নাবিক সৈন্য দলভুক্ত ছিল। এখন ইহারা কুম্ভীর ও শুশুক শিকার করে এবং শুশুকের তৈল অনেক মূল্যে বাতরোগীদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত। যাহারা বৈষ্ণব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পান দোষ কমিয়াছে। এখন পূর্ব্ববঙ্গে ইহাদের সংখ্যা অধিক। কুশদহে নদী মজিয়া যাওয়ায় বোধ হয়, ইহাদের এখানে আর দেখা যায় না।

চাঁড়াল—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডে চণ্ডালের জন্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে, শূদ্রের ঔরসে চণ্ডালের জন্ম। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও মহাভারতে পূর্ব্বোক্ত মতই প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারতে চণ্ডালকে গুপ্তহন্তা বা ঘাতুকের কার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণেও তাহাদের সম্বন্ধে ভাল কথা নাই। এমন কি সম্রাট আকবরের সময়েও তাহাদের সামাজিক অবস্থার তাদৃশ উন্নতি হয় নাই।

কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চণ্ডালগণের অবস্থায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখন তাহাদের আচার ব্যবহার কোন সৎ শূদ্র অপেক্ষা হীন নহে। পৌরাণিক সাহিত্যে চণ্ডালের

নাম শুনিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, আর এখনকার চাঁড়াল দেখিলে তাহাকে হরিভক্ত মাত্রেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ বিস্তৃত হয় নাই। তথাপি ধর্ম্মের প্রভাবে ইহারা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। হিন্দুসমাজের মধ্যে ইহাদের স্থান এখন পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নে নহে। মহাপ্রভুর বাক্য ফলিতেছে। তিনি যে বলিয়াছিলেন "হরিভক্ত চণ্ডাল দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ" তাহা সফল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে হরিনাম গানে হরিনাম কীর্ত্তনে দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহাতে যোগ দিতে সঙ্কুচিত বোধ করেন না।

কোন কোন স্থানের চণ্ডালদিগের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বে তাহারা ব্রাহ্মণ ছিল। নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও আচরণের জন্য তাহারা পতিত হইয়াছে। কিন্তু তিলির হাটের চণ্ডালগণ বলিয়া থাকে, তাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিল বলিয়া অনেক ব্রাহ্মণাচার রক্ষা করিয়া চলিতেছে। তাহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য একাদশ দিবসেই হইয়া থাকে।

আর এক মতে তাহারা বামদেব ঋষির সন্তান। যজ্ঞকার্য্যে অমনোযোগিতার জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর একমতে তাহারা লোমশ বা নমস্ ঋষির সন্তান। প্রবাদ যাহাই হউক, একেবারে অমূলক নহে। তাহাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ-রক্ত বহিতেছে, তাহা শাস্ত্রমতে অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডালের মধ্যে হেলে, ঘাসী, কন্ধ, কড়াল, বারী, বক্কান, পোদ, বেজুয়া প্রভৃতি আটটি বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে হেলে ও কড়ালের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য চলে। আর বাকী ছয় ভাগের মধ্যে পান ভোজন বা বিবাহাদি প্রচলিত নাই। পোদেরা এখন আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত।

মুর্শিদাবাদ জেলার হেলে চণ্ডালেরা কৃষিকার্য্য করে। অন্যান্য স্থানেও এক্ষণে কৃষিকার্য্য তাহাদের প্রধান অবলম্বন। জেলেরা মৎস্যজীবী। নলোরা মাদুর প্রস্তুত করে। হুগলী জেলায় তাহারা খেজুর ও তালগাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে। সন্দীপ বাসী চাঁড়ালেরা পানের ব্যবসা করে। তাহারা বরোজ করিয়া থাকে।

আমার বিশ্বাস প্রাচীনকালে যাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল তাহারা আধুনিক ডোম। কেননা এখনও ইহারা জল্লাদের অর্থাৎ ঘাতুকের কার্য্য করে। আদালতের বিচারে যাহাদের ফাঁসী হয় ডোমেরা তাহাদিগের ঘাতুকের কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন ফাঁসী হইয়া যায়

[illegible] তাহারা দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। কেন না ফাঁসী জনিত পাপে যেন তাহাদের ভুগিতে না হয়।

ডোমদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, লেট পিতা ও চণ্ডালিনী মাতার গর্ভে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কালুবীরের জন্ম হইয়াছিল। লেট বাগ্দীদের এক থাক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লেটবীর্য্যে চণ্ডালিনীর গর্ভে হাড়ির জন্ম কথিত হইয়াছে। তাহারা বলে কোন সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে তখন একটি শবদাহের চিতা প্রস্তুত করার জন্য কালুর পুত্রকে অনেক অর্থলোভ দেখানো হয়। সেকাজ শেষ করিয়া জল আনিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল। ইহাতে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে তাহার বংশধরেরা মৃতের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিবে। তদবধি তাহারা এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

এক সময়ে কালুবীর নামক কোন ব্যক্তি যে বিশেষ প্রবল হইয়াছিল এবং বিদ্রোহী হইতে ভয় পায় নাই, তাহা কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্য পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। কালুবীরের চার পুত্র হইতে যথাক্রমে আঁকুড়িয়া, বিশডালিয়া, বাজুনিয়া ও মঘাইয়া ডোমের উৎপত্তি। কিন্তু মঘাইয়া ডোমকে সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা হীন মনে করে। শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি-এ)।

অন্ধের যষ্ঠি

—o—

নাহি কোন আড়ম্বর শোভা আভরণ,
মলিন সে, ধুলো কাদা করেছে বরণ;
নাহি করে অভিমান স্বার্থ-সুখ আশ,
পরহিতে করে নিজ আমিত্বের নাশ।
তাই দীন অন্ধ জন তারে নিয়ে হাতে,
আপনার পথ পায় আঁধারে আলোতে।
মোরা যারে করি তুচ্ছ, শোভা হীন দেখি
বাখানি ছড়ির গুণ, ভুলে মোহে আঁখি।
জাগে তাই আড়ম্বর শূন্যতার মাঝে,
নাহি থাকে অধিকার গুরুভার কাজে।
সাধিছেন যাঁরা এই বিশ্বের কল্যাণ,
দীন-সেবা যাঁহাদের একমাত্র প্রাণ,
সঙ্গোপনে তাঁরা এই যষ্টির মতন
করেন আপন মহা-ব্রত উদ্‌যাপন।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় (এম, এস-সি)
(অধ্যাপক সিটী কলেজ)।

দাসের আত্ম-কথা

পশ্চিম মোকামে দুই বৎসর ;—১৩০২ সালের আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ঘৃত খরিদের কার্য্যোপলক্ষে প্রথমত কানপুরের অন্তর্গত কোঁচ নামক স্থানে গমন করি, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুবিধা মতো কোন স্থান ঠিক করিয়া কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে বাবু বঙ্কুবিহারী বসু—যাঁহার পরিচয় এবং আমার এই কার্য্যভার গ্রহণের সূচনার কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তিনিও আমার সঙ্গে গমন করিলেন।

কোঁচ মোকামে বড়বাজার এবং হাটখোলার কয়েকটি বড় ধনীর খরিদ থাকায় পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের ক্ষুদ্র খরিদের পক্ষে এখানে প্রতিযোগীতায় কাজের সুবিধা হইবে না। এজন্য ওখানে কয়েকদিন থাকিয়া সুবিধাজনক কোন নূতন স্থানের অনুসন্ধানে আমরা ঝাঁন্সী হইয়া বড়সাগর পর্য্যন্ত গেলাম ; কিন্তু দেখা গেল, ঐ সকল স্থানের ঘৃত বম্বে অঞ্চলেই চালান যায়, উহা কলিকাতার পড়তায় আসে না, সুতরাং আমরা কয়েকদিন ঘুরিয়া পুনরায় কোঁচে ফিরিয়া আসিলাম।

বঙ্কুবাবু অর্থপিপাসু সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রমনা ছিলেন না, তিনি উদার-হৃদয় প্রেমিক, সরল-চিত্ত ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম হইতে তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। আমরা এই কয়েক দিন ঘুরিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া কর্ম্ম সম্বন্ধে বিফল মনরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তাহাতে তাঁহার অপ্রসন্ন ভাব দেখা গেল না। ভ্রমণের আনন্দেই তাঁহার মুখে হাসি বর্ত্তমান ছিল। পরে যখন আমাদের কোন অসুবিধা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি তখন আগেই একটু হাসিতেন। অতঃপর যখন আমরা কলিকাতায় ফিরিবার কথাই ভাবিতে ছিলাম, তখন এটোয়া জেলার অন্তর্গত অরেয়া নামক একটি মোকামের সন্ধান পাইয়া আমি কোঁচ মোকামের সর্দারকে সঙ্গে লইয়া তথায় গেলাম। সেখানে গিয়া বুঝিলাম এখানে কাজের সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং ওখানেই কাজের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। তখন ওখানে বাবু পার্ব্বতীচরণ আশের গোমস্তা শ্রীমান্ নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়—যাহার সহিত বড়বাজারে আমার পূর্ব্বের পরিচয় ছিল, ঐ যুবকের দ্বারায় তখন আমি এ কাজের অনেক সন্ধান ও সাহায্য পাইয়াছিলাম। বঙ্কুবাবু কোঁচ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কোঁচ মোকামের কায আপাতত বন্ধ রহিল। এই বৎসর এই ঘৃত খরিদের কাযে সম্ভবত ৬০০৲ ৭০০৲শত টাকা লভ্য হইয়াছিল। বিক্রয়ের হিসাব বঙ্কুবাবুর নিকট থাকিলেও, আমার নিকট খরিদের হিসাব এবং আড়ৎদারের পত্রে বিক্রয়ের দর যাহা পাইয়াছিলাম তাহাতে একটা আনুমানিক হিসাবেই ঐরূপ বুঝিয়াছিলাম।

আমি মোকাম হইতে মাসিক ৩৫৲ নাগাত ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত যাহা খরচ করিয়াছিলাম তাহাই আমার প্রাপ্য হইল। বন্ধুবাবুর সহিত সংসারিক ভাবে অর্থের ব্যবহার বা হিসাব পত্রের সম্বন্ধ ছিল না, এজন্য দেনা পাওনা লইয়া আমাদের মধ্যে কোন মনমালিন্য ঘটে নাই।

প্রথমবার প্রায় এক বৎসর বাদে ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। ইতিমধ্যে অরেয়াতেই আমি আমার স্ত্রী-বিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শিশু পুত্রটি কষ্টে সৃষ্টে ভগিনি ত্রৈলোক্যের দ্বারায় প্রতিপালিত হইতেছে এবং সুস্থ আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এবং বিনয়ের পড়া শুনা চলিতেছে বটে কিন্তু ইহাদিগকে ফেলিয়া আর আমার পশ্চিম মোকামে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বড়বাজারের আড়ৎদার এবং বন্ধু বাবুর আগ্রহ-উৎসাহে—অধিকন্তু চুনী বাবুরও ইচ্ছা জানিয়া পুনরায় আষাঢ় মাসের শেষভাগে মোকামে গেলাম।

কিন্তু এবৎসর কাযে অতিশয় অসুবিধা হইল। ক্রমাগত ঘৃতের বাজার নরম হইতে হইতে মনপ্রতি ১০।১১৲ টাকা কমিয়া গেল। আমার হাতে ২০০/ মণ মাত্র ঘৃত আটকাইয়া প্রায় ১৪০০৲ টাকা লোকসানের সম্ভাবনায় দাঁড়াইল। সুতরাং ঘৃত বিক্রয়ও করিতে পারিনা, আবার মৌজুত রাখিতে হইলে মোকামের আড়ৎদার এক হাজার টাকা ডিপজিট চাহিলেন; কিন্তু বন্ধুবাবু তাহার কোন উপায় করিতে পারিলেন না, তখন সমস্ত দায়ীত্ব আমার স্কন্ধে পতিত হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আশ্চর্য্যরূপে আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইলাম।

প্রথম বৎসরে এক বড় ধনী আড়ৎদারের ঘরে কায করিয়া ততো ভাল ব্যবহার না পাইয়া, দ্বিতীয় বৎসরে নূতন আড়ৎদারের চেষ্টা করি। আর এক আড়ৎদারের ভাগিনেয় অযোধ্যাপ্রসাদের সহিত আমার প্রথম বৎসরে কিছু বন্ধুতা হয়, শেষ বৎসর সেই সূত্রে তাঁহাদের ঘরেই আমি ব্যাপারি হইলাম। অযোধ্যাপ্রসাদ ঐ কারবারের কিছু অংশীদারও ছিলেন। লাভের আশায় কায করিয়া লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলে বিষয়ী লোকের মন স্থির থাকা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য খেলা, যখন আমি অযোধ্যা-প্রসাদকে আমার অবস্থার কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলাম এবং শেষ কথা ইহাও বলিলাম যে, যতদিন ঘৃতের বাজার না উঠিবে ততদিন আমি আমার নিজের জীবন দিয়া এখানে পড়িয়া থাকিব। ইহার কোন প্রতিবিধান না করিয়া আমি এখান হইতে যাইব না। এজন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করিব যাহাতে তাঁহার ধনীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ কেন যে আমার কথায় মাত্র বিশ্বাস করিয়া এত টাকা ক্ষতির আশঙ্কা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, ইহা ভগবানের করুণা ভিন্ন আর কি বলিব। এমন কি তাঁহার মনভঙ্গের চেষ্টা করিয়া, গোপনে কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল,"বাবু পলাইয়া যাইবেন" তাহার উত্তরে অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি বলিয়াছিলেন, বাবুর" লোকসানের

টাকা আমি নিজ হইতে ধনীর ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দিব।” অযোধ্যাপ্রসাদের এই বক্তৃতার কথা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

যখন খরিদ বন্ধ করিয়া অতি সামান্য ভাবে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম, তখনও বন্ধুর ন্যায় যথাসম্ভব আমাকে আশ্বস্ত করিয়া আমার সন্তোষ বিধান করিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু কাজ বন্ধ থাকায় কলিকাতার বাসা খরচ পাঠাইবার কোন উপায় রহিল না, এজন্য সেখানে যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা ভাবিয়া আমার শান্তি রক্ষা করা কঠিন হইল। এইরূপে প্রায় ৬ মাস কাল কাটাইয়া যখন ঘৃতের দর আবার ১০৲ টাকা মণ বৃদ্ধি হইল, তখন মজুত ঘৃত আড়দ্দারের নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের দেনা বুঝাইয়া দিয়া ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয়বারে মোকামে আমার যাওয়া সম্বন্ধে চুনীবাবুর সম্পূর্ণ মত ছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি! সুতরাং প্রথমবারের ন্যায় এবারেও যে তিনি আমার বাসার অবিভাবকস্বরূপ রহিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। মোকামে আমি যেরূপে বিপদ-জড়িত হইয়া পড়ি, তাহাও তিনি পর পর ঘটনার কথা আমার পত্রে সমস্ত অবগত ছিলেন। কিন্তু যখন অর্থাভাবে বাসার অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইল, তখন তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য বারম্বার সংবাদ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সেখানে যেরূপ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—তাহাতে আমি ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারি না—অথবা কোনরূপে গোপনভাবে আসাও যে কতদূর ঘৃণ্য তাহা তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেন যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে এমন তাগীদ দিতে লাগিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

চুনীবাবু কথনো আমার সংসারে বিশেষভাবে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার অবস্থা এবং আমাদের বন্ধুতার সম্বন্ধানুসারে আমি কথনো তাঁহার নিকট সে আশাও করিতাম না, তবে অত্যন্ত অনাটনের সময়ে, যে রূপেই হউক তাঁহার সংপরামর্শে বা বল ভরসায় দিন কাটিয়াছে। আমিও এই ভাবেই তাঁহার উপর নির্ভর করিতাম। কিন্তু এই সময় তিনি যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্তত আমার যতদূর মনে হয়, তাহাতে তিনি যেন আমার সংসারের সে ভার টুকুও বহন করিতে অসক্ত। এখন আমি আমার সংসারের ভার গ্রহণ করি যেন তাহাই তিনি চাহিতেছেন।

দ্বিতীয়, তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে এবং আমার সংসারের মধ্যে যতদূর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা স্থাপন করিতে প্রথমে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে গুরুতর বোধ হইতে লাগিল। তথাপি আমার দিক হইতে মুখ ফুটিয়া বন্ধুতা ছেদন করাও যেন আমার পক্ষে সুসাধ্য ছিল না, অথবা ক্রমে ক্রমে আমার মনের মধ্যে একটি বিলক্ষণ গুরু-বেদনার ভার ঘনীভূত হইতেছিল। ইহা যে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে নিজের মধ্যেই

বিদ্রোহের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতাম না। এমন সময় মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সকল জটিলতা ভেদ হইয়া গেল। বিধাতার খেলা দেখিয়া অবাক হইলাম।

প্রথমবারে কলিকাতায় আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে চুনীবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। এবারেও সেইরূপ করিলাম। কিন্তু এবার তিনি প্রথম আলাপের পরই আমাকে যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ, "যান্ আপনার সঙ্গে আমার পোসাইবে না,আপনি কাহার অধীনে (কন্ট্রোলে) চলিবার লোক নহেন। আপনার একটা স্বাতন্ত্রতা (ইন্‌ভিডি জুয়ালিটী) আছে। আপনি আপনার পথ দেখুন।" বাস্তবিক ইহা আমার নিকট "দৈববাণী" তুল্য হইল। সম্ভবত ২।১ দিন পরেই বাসা বদল করিয়া চুনীবাবুর নিকট হইতে বন্ধুতার বন্ধন মুক্ত হইলাম। আপনার পথ আপনি অন্বেষণে পুনরায় নিযুক্ত হইলাম।

ইহার পর আমার নূতন বাসার সম্মুখে গিয়া চুনীবাবু পুনরায় আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার আর সে ইচ্ছা না থাকায় আমি তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি অতঃপর আর কোন চেষ্টা করেন নাই।

পশ্চিম মোকামে ২ বৎসর অবস্থানে আমার জীবনে যে সকল ঘটনার মধ্যে বিধাতার করুণার কথা বলিলাম, তাহা ব্যতীতও গুরুতর কথা— আমার দুর্ব্বলতার কথা—পাপ প্রলোভনে পতনের কথা আছে ; কিন্তু তাহার মধ্যেও আশ্চর্য্যরূপে সেই কৃপা-হস্ত দ্বারাই এ জীবন রক্ষিত হইয়াছে। সেই কৃপার কথা যেমন গোপন করিতে পারি না, তেমনই সে পাপ দুর্ব্বলতার কথাও গোপন করিতে পারি না।

আমি বিশ্বাস করি, "দাসের আত্ম-কথার" মধ্যে যদি বিধাতার কোন আশীর্ব্বাদ থাকে এবং তদ্বারা অন্যের জীবনের কোন কল্যাণ মঙ্গল সাধিত হয়, তবে তাহা সত্যেতেই সিদ্ধ হইবে। যদি কোনরূপে জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করি, তবে তজ্জন্য নিশ্চয়ই অপরাধী হইব।

অরেয়া মোকামে কায আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পরেই বুঝিলাম এ দেশ ব্যবসায়ী প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে কি প্রলোভনের স্থান। স্বদেশ আত্মীয়-পরিবার ছাড়িয়া এখানে অবস্থান করিয়া অল্প শিক্ষিত সাধারণ শ্রেণীর বাঙালীর পক্ষে চরিত্র ভাল রাখা কঠিন। বস্তুত আমার সম্মুখে যখন এই প্রলোভন উপস্থিত হইল, তখন কুপ্রবৃত্তি আকারে আসে নাই। তাহা আমার মনের একটি গূঢ় লক্ষ্য এবং চিন্তার অনুকূল আকারেই আসিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পশ্চিম মোকামে যাইবার সূচনার পূর্ব্বে আমার মনে সাংসারিক অশান্তি এবং একটা কি যেন অভাব বোধ জাগিতে ছিল। সে অভাবের স্বরূপ এখানে এইভাবে প্রকট হইল যে, বিকলাঙ্গিনী পত্নীর সেবা এবং সাংসারিক কার্য্যে সাহায্যের জন্য এ দেশ হইতে যদি একটি কর্ম্মঠ সৎ

শ্রেণীর স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে পারি তবে তাহাতে দোষ কি ? কারণ এ দেশে সাধারণত স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং নিষ্ঠা যেরূপ শিথিল, বিশেষতঃ দরিদ্র অসহায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অনেক। তাহাতে ইহা অসম্ভব বোধ হয় না। ক্রমে অবস্থা এমনই অনুকূল হইল যে, মনের গূঢ় কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনায় আসিয়া দাঁড়াইল। শেষ ঘটনা এবং অবস্থা এমনই হইল যে, তাহা হইতে চরিত্র রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল।

মানব অন্তর যখন নিঃশব্দে প্রলুব্ধ হয়, তখন কি এমনই হয়! সে যে কোথায় যাইতেছে তাহা আর তাহার বুঝিবার শক্তি থাকে না। এইরূপেই সে বিভ্রান্ত হয়!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ অবস্থায়ও সৎপ্রসঙ্গ করিবার উৎসাহ এবং শক্তি আমার কিছু মাত্র কমে নাই। এবং লোকের অশ্রদ্ধা অপ্রীতি-ভাজনও হই নাই; ধর্ম্মভাবের সঙ্গে কিরূপে যে এই নীতিহীনতার স্থান হইয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনও অবাক হইতে হয়। কিন্তু বিধাতার অপার করুণার কথা এই যে, যখনই আমার প্রত্যাবর্ত্তনের দিন নিকট হইতে লাগিল, তন্মধ্যে আমি বুঝিলাম, এই সঙ্কল্প আমার কত অসার এবং মলিন। তখনই এই প্রলোভন হইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার শক্তিতে নয়—একমাত্র দয়াময়ের অপার কৃপাতেই! ধন্য তাঁহার করুণা।

আমার এই পশ্চিম প্রবাসকালের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। সে-টি একটি অযাচিতরূপে সৎসঙ্গ লাভের কথা।

শেষ বৎসরে যখন আমি দেনার দায়ে অপ্রসন্নচিত্তে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেই সময় ঐ দেশীয় একটি গরীব ব্রাহ্মণ—নাম দয়াশঙ্কর, আমাকে দৈনিক কিঞ্চিৎ দুগ্ধ যোগান দিতে আমার বাসায় আসিত। কিছুদিন বাদে তাহাকে আমার নিকটে আসিতে এবং বসিতে দেখিয়া আলাপ পরিচয় করি। ওখানে ব্রাহ্মণরাও চাষ করে এবং গো-গাড়ী চালায়। দয়াশঙ্করের একখানি গোরুর গাড়ী ছিল। তাহার মজুরী হইতে তাহার দৈনিক জীবিকা—পরিবারের ভরণপোষণ চলিত। দিনে কর্ম্ম করিয়া গৃহে আহারীয় দ্রব্য আয়োজন করিয়া দিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হইত। এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিয়া দিনান্তে একবার ঐ যাহা কিছু থাকিত গৃহে গিয়া আহার করিয়া নিদ্রা যাইত। এইভাবে সেদিন মজুরী করিয়া জীবন যাপন করিত। কিন্তু প্রাণের ভীতর ঈশ্বর-প্রেম এবং বৈরাগ্যের সুন্দর ভাবটুকু ছিল। ঠিক যেন ভগবানের দূতরূপে পরিচালিত হইয়া উপযুক্ত সময়েই দয়াশঙ্কর আমার নিকট উপস্থিত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার সে সময় প্রাণের অশান্তি চলিয়া যাইত। দয়াশঙ্কর বিশ্বাসী প্রেমিক লোক, তাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিয়া খুব আরাম পাইতাম।

শেষ সময়ে একবার আমাকে কোঁচ মোকামে গিয়া হিসাব পত্র নিকাশ

করিয়া মোকাম তুলিয়া আসিতে বন্ধুবাবু অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠান। কোঁচে আমি রেলপথে গেলেও পারিতাম, কিন্তু দয়াশঙ্কর বলে, "বাবু চলুন, আমার গাড়ীতে গ্রাম্যপথে লইয়া যাইব, তাহাতে আপনার কোন কষ্ট হইবে না, অথচ আমারও একবার কোঁচে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, আপনার সঙ্গে আনন্দেই যাইব।" আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া দয়াশঙ্করের গাড়ীতেই কোঁচে গেলাম। সেই সময় তাহার সেবার পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, দয়াশঙ্কর একজন শিক্ষিত সেবক। অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই সেবা শিক্ষা করিতে হয়। যিনি যথার্থ প্রেমিক ভক্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাঁহাকে সেবা পরায়ণ হইতেই হইবে। ভক্ত বিশ্বাসী ভিন্ন প্রকৃতরূপে জীবের সেবা কেহই করিতে পারে না।

পথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে দয়াশঙ্করের মুখে ধর্ম্ম-বিষয়ের গল্প শুনিতে শুনিতে অল্পে অল্পে গমন, খুবই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। দয়াশঙ্কর অফুরন্ত গল্প জানিত। যথাসময়ে দুই বেলা আহার্য্য প্রস্তুত, গো সেবা, নিজের স্নানাহার এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করিত যে, পথে চলিয়াছি কি ঘরেই আছি মনে হইত। সে সময় আমার সঙ্গে বালকপুত্রসহ আধ-পাগ্‌লা বৃদ্ধ ভৃত্যও একটি ছিল। পথে ৪টি প্রাণীর ভোজ্য পানীয়ের কোন অভাবই ঘটে নাই।

আরো জানিতে পারি যে, দয়াশঙ্করের পিতা গৃহত্যাগ করিয়া সাধু হইয়া চলিয়া যান। পরে দয়াশঙ্কর পিতৃ-অন্বেষণে তিনবার বহির্গত হইয়া অনেক সাধুসঙ্গ ও দেশভ্রমণের ফলেই তাহার চিত্তে এই সাধুভাব এবং বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। দয়াশঙ্কর গৃহী হইয়াও বৈরাগী ছিল। তাহার সেই ভাব আমার প্রাণে চিরদিন জাগিতেছে।

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

দেশের ধন, জন, স্বাস্থ্যাদি সকল বিষয়েরই অবনতি ভিন্ন উন্নতি দেখা যায় না। এমন যে পূজার অবকাশ, যে সময়ে সকলেরই প্রাণে একটা উৎসাহের বাতাস বহিতে থাকে, তাহার ভীতরেও এখন আর তেমন ভাব দেখা যায় না। অনেক স্থলে রোগ শোক ধনক্ষয়াদির উষ্ণ-নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়া পূজা-মণ্ডপের জ্যোতিও যেন নিষ্প্রভ হইয়াছে। তারপর অধিকাংশ চাকুরী-ক্লিষ্ট জীবনগুলি দেশ ভ্রমণেই উৎসুক, জন্মভূমিতে আসিয়া পরিবার পরিজনের সহিত মিলিয়া ভক্তিনিষ্ঠার সহিত মাতৃ-চরণ পূজায় প্রবৃত্ত হইতে কয়জনকে দেখা যায়? কয়জনের অবস্থাই বা তদ্রূপ অনুকূল আছে। আর প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ঈশ্বর-ভক্তি—অথবা সাকার দেব-দেবীতে বিশ্বাস কয় জনের অন্তরে আছে? তবে একথা আমাদের দিক্ হইতে শুনিয়া হয়তো অনেকে সত্যভাবে গ্রহণ নাও করিতে পারেন। কিন্তু সাকার পূজা পার্ব্বণে আস্থা

বিশ্বাস, পল্লী-নারী সমাজ ব্যতীত অধিকাংশের মধ্য হইতে যে দিন দিন চলিয়া যাইতেছে তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? অথচ ভগবান যে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, ইহার মতো সত্যই বা আর কি আছে!

এবার খাঁটুরা, দত্তবাটী, এবং গোবরডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডের বাটীর পূজা, কোন রকমে নিয়ম রক্ষা হইতেছে। এবং খাঁটুরায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রক্ষিতের বাটীর পূজাও নানাকারণে পূর্ব্বের ন্যায় হয় নাই। অবশ্য একথা বাহ্য-পূজার হিসাবেই বলা হইতেছে, কারণ আন্তরিক পূজার কথা স্বতন্ত্র—সে কথা এখানে হইতেছে না। তারপর জমিদার বাটীর পূজা, "ভাই ভাই, ঠাই ঠাই" তাহা সকলেই জানেন। তবে গৈপুরে মিত্র-বাটীতে নূতন আর একখানি পূজা হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয় উহার অগ্রণী; নুতনে যেমন নবোদ্যম, নবোৎসাহ থাকা উচিত বোধ হয় তাহার ত্রুটী হয় নাই। গৈপুর উত্তরপাড়ার পূজা যেমন হয় তেমনই হইয়াছিল, উহাতে তেমন "জুয়ার ভাঁটা" দেখা যায় না। মাটীকোমরার মুখোপাধ্যায় বাটীতেও পূজা হইয়াছিল, তবে ঘটক মহাশয়কে এবার তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার পূজার সংবাদ বলিতে আমরা এবার এই পর্য্যন্তই অবগত হইয়াছি।

গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার হিসাবে বড় বড় প্রাচীন বাগানের নিষ্ফল আম কাঁঠালের গাছ কাটানোর কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। সুখের বিষয় এখন যেন এদিকে গ্রামবাসীর দৃষ্টি বিন্দুপরিমাণেও আকৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে সুবিধা অসুবিধার কথাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অসুবিধার একটি প্রধান কথা, পুরাতন গাছ কাটাইলে জমিদারী চৌত দিতে হয়, এই কথা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে আশা পাইয়াছি যে, সময়ের পরিবর্ত্তনে এবং দেশের হিতার্থে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ২য় কথা যাঁহারা সময় অভাবে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বৃক্ষ বিক্রয় করিতে পারেন। গ্রাহকের অনুসন্ধান কুশদহ সম্পাদকের নিকট জানিতে পারিবেন।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য

(সম্পাদকের নিবেদন)

একটি আবান্তর কথায় "কুশদহ"র আভ্যন্তরিক একটু স্থান গ্রহণ করা হইল। কিন্তু "কুশদহ"র বিঘ্ন দূরীকরণার্থেই সম্পাদকের এই নিবেদন। এজন্য "কুশদহ"র হিতৈষী গ্রাহক গ্রাহিকা মাত্রেরই দৃষ্টি এই প্রার্থনাটির প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথম কথা,—কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঋণভার মস্তকে লইয়াও ঈশ্বর-কৃপাতেই "কুশদহ" নয় বৎসর চলিতেছে। অবশ্য পুরাতন গ্রাহক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের অভাবে নিয়মিত রূপে সংখ্যাগুলি বাহির করা যে দিন দিন কিরূপ কঠিন হইতেছে তাহা সকলেই জানিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কোনও কারণে "কুশদহ"র প্রতি গ্রাহকগণের অনুরাগ চলিয়া যায়, তবে কাগজ রক্ষা করা যে কত কঠিন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

এবার পূজার বন্ধে নোয়াখালী উৎসবে গিয়া তৎসহ "কুশদহ"র গ্রাহক সংগ্রহ কার্য্যে পূর্ব্ববাংলা ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে, এজন্য যথাসময়ে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা বাহির হইতে পারে নাই। আশা ছিল, পৌষের মধ্যে ৩ সংখ্যাই বাহির হইবে. কিন্তু ছাপাখানার কাজ সকল সময় আশানুরূপ পাওয়া যায় না। অথচ যথাসময় কাগজ না পাইলে স্বভাবত গ্রাহকগণের অনুরাগ চলিয়া যায়। বিশেষ চেষ্টা হইতেছে মাঘ মাসের মধ্যে ঐ মাস পর্য্যন্ত কাগজ যাহাতে বাহির হয়। এ অবস্থায় গ্রাহক-গণের বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকা একান্ত প্রার্থনীয়।

দ্বিতীয় কথা,—এবার বিদেশে গ্রাহক সংগ্রহের সময় শ্রম-সাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মনে হইয়াছে, সমগ্র কুশদহ এবং তদন্তর্গত প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এই প্রয়াস অগ্রে করা উচিত। "কুশদহ"র গ্রাহকের জন্য আমাদের স্নেহ দাবী সর্ব্বাগ্রে কুশদহবাসীর নিকট—পরে অন্যত্র। এজন্য বৎসরে ১।৷০টাকা অর্থাৎ মাসে ৵০ আনা মাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে কে না পারেন। অবশ্য যিনি অক্ষম এবং "কুশদহ" প্রচারের উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি নাই তাঁহার নিকট আমাদের দাবী চলে না।

বর্ত্তমানে যাঁহারা "কুশদহ"র গ্রাহক আছেন, সকলে যদি নিজ নিজ বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণের মধ্য হইতে "কুশদহ"র গ্রাহক হইবার সম্ভব যোগ্য ২।৪টি করিয়া নামের তালিকা আমাদিগকে প্রদান করেন, এবং সকলেই যদি আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন তাহা হইলেও "কুশদহ"র স্থায়ীত্ব কল্পে সাহায্য হইতে পারে। সকলের নিকট দাসের প্রার্থনাটি গৃহীত হইবে কি ?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ { অষ্টম সংখ্যা

দাসের প্রার্থনা

—০—

জননি, এবার নোয়াখালী উৎসবে লয়ে গিয়ে তোমার বিশেষ কৃপা দেখালে। মাতৃরূপে—জননীরূপে দেখা দিয়ে এই মলিনচিত্ত বিগলিত ক'রলে। ঘরে ঘরে তোমার সেই ভাব দেখাবে ব'লে কত স্থানে লয়ে গেলে, আর তো প্রবাস ব'লে, অপরিচিত ব'লে, কিম্বা পথের কষ্টে ভয় ভাবনা রইল না, এ যে সর্ব্বত্র তোমারই ঘর, সকল কন্যাগণের মুখে যে তোমারই মাতৃরূপ। মা, চক্ষু পরিষ্কার করে দাও, ভাল ক'রে তোমার ঐরূপ দেখি, আর,—সহজ সুরে মা ব'লে ডাকি। মা, দাসের জীবনে তোমার যত দান—এই মহাদান যে আমার জন্মভূমির জন্যও বলেছ, তবে দেখাও, তোমার সে বাণী পূর্ণ হবেই; তোমার বিধানের গুণে মাতৃনাম গ্রহণের পথ যদি এত সহজ হয়ে এসেছে; তবে দাও মা প্রাণে ঐ নাম গ্রহণের শক্তি দাও। আর আমার জন্মভূমির জন্য তোমার দান যেন সফল হয়।

———

কুশদহের ইতিহাস

—o—

কৈবর্ত্ত। বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে কৈবর্ত্ত এক প্রধান অঙ্গ। নবশাখদিগের পরেই সাধারণত কৈবর্ত্তকে ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কৈবর্ত্তের পূর্ব্বতন ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন কৈবর্ত্তের গৌরবে হিন্দুসমাজ কিরূপ গৌরবান্বিত। এক সময়ে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগ এবং সমতট ও তমোলিপ্তির মধ্যে কৈবর্ত্তই প্রধান অধিবাসী ছিল।

কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ হইতেছে, যাহারা জলে বাস করে অর্থাৎ নৌজীবী। কিন্তু জর্ম্মাণ পণ্ডিত ল্যাসেন মনে করেন, কিংবর্ত্ত অর্থাৎ কি ব্যবসায় হইতে কৈবর্ত্ত শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ তিনি বলেন, যাহাদের ব্যবসায় অতি হীন। কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী নহে। হীন হইলে কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত না এবং শান্তনু রাজা চেষ্টা করিয়া কৈবর্ত্ত কন্যা বিবাহ করিতেন না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম। সুতরাং কৈবর্ত্ত হীনমর্য্যাদা নহে। মনুর সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে কৈবর্ত্তেরা নৌকর্ম্মজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহা অগৌরবের কথা নহে। বরং সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাতে বিশেষ গৌরব অনুভব করিবেন। যে বাঙালী এক সময়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা বোধ হয় এই কৈবর্ত্ত। যে বাঙালী এক সময়ে চীন ও জাপানে বাণিজ্যার্থে সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত, তাহারা বোধ হয় এই কৈবর্ত্ত। যে বাঙালী য়ুরোপের জর্ম্মাণসাগরে ভগ্নপোত হইয়া রোম সম্রাটের সাহায্যে দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিল, তাহারা সম্ভবত এই বাঙালী কৈবর্ত্ত। যাহাদের জলযুদ্ধের নিপুণতা দেখিয়া রোমবাসীরা চমৎকৃত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এই কৈবর্ত্ত বা গাঁড়ার। যে বাঙালীকে নৌসাধনোদ্যত বলিয়া কালিদাস উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সম্ভবত এই কৈবর্ত্ত। কৈবর্ত্তের নৌবিদ্যা নৈপুণ্য যে এক সময়ে বাংলার গৌরবের বিষয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু কেবল জলেই যে কৈবর্ত্তের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়াছিল তাহা নহে। স্থলেও তাহাদের কীর্ত্তি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৈবর্ত্তেরা প্রবল হইয়া প্রতাপান্বিত পালরাজগণকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্র ভূমির রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে

উল্লিখিত হইয়াছে যে,গৌড়ের পালবংশীয় রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হইয়া নিজ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে বন্দী করিয়া রাখেন। তখন কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্বোক, মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করেন। এবং পালরাজগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। এবং তদীয় ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীমকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামপাল অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক সামন্ত রাজার সাহায্য লইয়া ভীমকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত প্রথম আক্রমণে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনন্তর নিখিল সামন্ত চক্রের সমবেত চেষ্টার ফলে ভীম পরাজিত ও সম্মুখযুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে ধৃত হইয়াছিলেন। ভীম ধৃত হইলেও তাঁহার সৈন্যগণ পুনরায় তাঁহার আত্মীয় হরিকে অধিনায়ক করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধে হরি ধৃত হইলে সৈন্যগণ রণে ক্ষান্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়ী রামপাল সেই যুদ্ধনিপুণ সৈন্যদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়া তাহাদের পরাক্রম ও সাহসের সমুচিত পুরস্কার করিয়াছিলেন।

কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাজিত করা রামপালের সহজসাধ্য হয় নাই। অনেক সামন্ত ও মিত্র নরপতির সাহায্য লইয়া ভীমকে পরাভূত করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভীমকে দেখাইলেও তাঁহার অযথা দোষ দেখান নাই। পরাজিত শত্রুর প্রতি বরং যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ভীম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের অনুগৃহীত ; তাঁহাকে নৃপতিরূপে পাইয়া বিশ্ব সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল এবং সজ্জনগণ অযাচিত দানলাভ করিয়াছিলেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভীম শৈব ছিলেন।

ভীমের পরাজয় ঘটিলে সম্ভবত দক্ষিণদেশে আসিয়া কৈবর্ত্তগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কুমারপালের সেনাপতি বৈদ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়া নৌযুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই জলযুদ্ধ কৈবর্ত্তপ্রধানগণের সহিত হইয়া থাকিবে। ভীমের রাজধানী ডমর নগর কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। রামপাল এই নগরের ধ্বংস সাধন করেন।

কৈবর্ত্তগণের পূর্ব্ব কীর্ত্তির আলোচনা করিয়া আমরা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিছু আলোচনা করিব। যাহারা কৈবর্ত্ত নামে উল্লিখিত হইয়া বাংলাদেশে এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহারা এখন মাহিষ্য নাম গ্রহণ

করিতে ব্যস্ত কেন? মাহিষ্য নাম কি ইহা অপেক্ষা গৌরবজনক? পুরাণ মতে কৈবর্ত্তের মধ্যে যেরূপ খাঁটী আর্য্যশোণিত প্রবাহিত, মাহিষ্যের মধ্যেও কি তাই? এ কথা ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

কৈবর্ত্তগণ উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীভেদে দুই প্রকার। পূর্ব্বদেশে কৈবর্ত্তগণ পরাশর হালিক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে কালা রায়, যাদব রায়, ভুবন কুরী মাঝী, সমাদ্দার, চন্দ্রণ রায় এবং মজুমদার প্রভৃতি উপাধী দেখা যায়। কৈবর্ত্তগণের মধ্যে যাহারা কুলিন, তাহাদের উপাধি মণ্ডল, মাঝী, পাত্তব, শিকদার কাবার প্রভৃতি। তবে চন্দ্রদ্বীপী কৈবর্ত্ত বাঙাল বার-হাজারী অপেক্ষা সম্মানিত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ রাঢ়ী কৈবর্ত্ত মধ্যে একসিধে, দুসিধে, মুকুন্দ, লালচেটাই প্রভৃতি শ্রেণী আছে। যাহারা বিবাহ রাত্রিতে কন্যার বাটীতে আহার করে না, বলিয়া সিধা পায়, তাহারা এক সিধে, যাহারা বিবাহের ও তৎপরবর্ত্তী দিনেও সিধা পায়, তাহারা দুসিধা নামে পরিচিত। যাহারা সমাজে বসিবার জন্য লাল চেটাই পায়, তাহাদের মর্য্যাদা অধিক এবং তাহারা ঐ নামে পরিচিত। মুকুন্দারা বিবাহে কন্যার বাটীতে ভোজ্যদ্রব্য নিজেরাই বহিয়া লইয়া যায়, কাজেই তাহাদের সম্মান অধিক নহে।

কৈবর্ত্ত মধ্যে আলম্যান, পরাশর, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ও ঘৃত কৌশিক গোত্র আছে। তবে আলম্যান ও কাশ্যপ গোত্রের সংখ্যা অধিক। কুশদহের কৈবর্ত্তের সামাজিক আচার সৎশূদ্রের ন্যায় শুদ্ধ। কিন্তু উড়িষ্যার কৈবর্ত্তমধ্যে এখনও বিধবা বিবাহ অর্থাৎ দেবর বিবাহ প্রচলিত আছে। কৈবর্ত্ত সাধারণত বৈষ্ণব। তবে শাক্তও দেখা যায়। গ্রাম্য দেবতা মধ্যে বুড়াবুড়ীর পূজাও কোন কোন স্থানে আছে। পৌষ সংক্রান্তিতে এই পূজা হয়।

ইদানীং কালেও কৈবর্ত্তগণের মধ্যে অনেক চরিত্রবান্ ও ভাগবত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার উত্তরাংশে কৃষ্ণলাল ভুঞার নাম সুপরিচিত ছিল। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, এবং দানে মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়াও জীবে দয়া তাঁহার প্রধান সাধন ছিল। যাঁহাদের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পরমহংসদেব অবস্থান করিতেন, তাঁহারা যে এই জাতির অলঙ্কার ও গৌরব স্বরূপ তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (বি-এ)

আমার নাকাল

—o—

(১)

এফ, এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলে সেই বৈশাখ মাসেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার এবং গেজেটে আমার নাম উঠিবার জন্য কোন পক্ষই অপেক্ষা করেন নাই তাহার কারণ এই যে, ফলাফলের উপর আমার দর নির্ভর করে নাই। আমার জ্যাঠা মহাশয়ের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পৌত্রীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া দেনা পাওনার কোন কথাই উঠে নাই।

আমার সমবয়স্ক বন্ধুদের অনেকেরই ইতঃপূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। আমি সকল বধূকেই দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা যে বেশ সুন্দরী এমন কথা বলা যায় না। আমার স্ত্রী সুন্দরী হওয়া চাই, কি বন্ধুদের স্ত্রীর মতো হইলেই চলিবে, সে চিন্তা আমি কোন দিন করি নাই, যে অভিভাবকগণ কন্যা দেখিবেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচনের উপরই আমার নির্ভর ছিল। ঘটনাক্রমে আমার ভাগ্যে বেশ সুন্দরী স্ত্রী লাভই ঘটিল। বন্ধুগণ তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষা পরায়ণ হইয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে সকলেই বলিয়াছিলেন, "হাঁ, এত দিন পরে আমাদের গ্রামে একটি সুন্দরী বউ আসিল বটে।"

আমার স্ত্রীর নাম সরলা। বিবাহের পর দিন লইয়া সরলা আমাদের বাড়ীতে তিন দিন ছিল, তন্মধ্যে দুই দিন আমার সহিত দেখা শুনা ও কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। সেই দুই দিনেই তাহার হৃদয়ের অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম যে, তাহার বাহিরটা যেমন সুন্দর, ভিতরটা তদপেক্ষা কম নহে। এই বয়সেই সে বিলক্ষণ রসিকা ও রহস্য পটু—ইহাতে সে দুই দিনেই আমাকে বড় মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

অল্প দিন পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর সময়ে আবার সরলার সহিত দেখা হইল। আমি তিন দিন শ্বশুরালয়ে ছিলাম। এবার সরলা আমার সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরলতার সহিত কথা বার্ত্তা কহিল—লজ্জা ও সঙ্কোচের মাত্রা একটু কম বলিয়াই বোধ হইল। অনুমান করি, নিজের কোট বলিয়া একটু সাহস বাড়িয়াছিল এবং আমাকেও একটু চিনিয়াছিল আমি আর

এখন নির্জ্জলা পর নহি। সরলার গুণে আমি তাহাকে ষোলআনা প্রাণটা দিয়া ফেলিলাম। অনেক স্ত্রীই স্বামীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কিন্তু আমার বোধ হইল, যেন সরলার মতো কেহ বাসিতে পারে না। বিদায় কালে আমি তাহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলাম যে, সে আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে; কিন্তু তাহাকে আমার লেখাতে আপত্তি করিল। তবে কি সে আমার সংবাদ জানিতে চাহে না? তাহা নহে। সরলা বলিল, "বাড়ীতে তোমার শ্যালী শ্যালাজ ও দিদি খাশুড়ীর সংখ্যা অনেক, তোমার পত্র আসলে তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের জ্বালায় আমার তিষ্ঠানো ভার হবে।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের বাকী দিনগুলি ও আষাঢ় মাসের কয়েক দিন আমি বাটীতে থাকিলাম, কিন্তু সরলার একখানি পত্রও পাইলাম না। আমি মনে করিলাম, পাছে কেহ দেখে, সেই ভয়ে সরলা বাটীতে পত্র লিখিল না, কলেজ খুলিলে কলেজের ঠিকানায় নিশ্চিত লিখিবে—আমি তাহাকে কলেজের ঠিকানাতেই লিখিতে বলিয়াছিলাম। আমি এবার মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার বিবাহ হইয়াছিল শ্রীরামপুর মালি পাড়ায়।

(২)

এইখানে আমার পরিচয়টা একটু দিয়া রাখি। আমার নাম শরৎ। আমাদের বাড়ী হুগলী হইতে দুই ক্রোশ দূরে দুর্গাপুর গ্রামে। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন আর সম্পন্ন নহে; তবে বংশটা বহু বিস্তৃত এবং বহু পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত। পিতা কলিকাতায় চাকরী করেন, আমি তাঁহার সহিত এক বাসায় থাকিয়া কলেজে পড়ি। আমরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেখানে আমার সমবয়স্ক আর তিনজন যুবক থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন, একজন আমার সতীর্থ, তাহার নাম ব্রজনাথ। কলেজ বন্ধ থাকিলে আমি প্রায়ই বাড়ী যাইতাম, অনেক সময় চন্দননগরে মাতুলালয়েও যাইতাম।

সরলার পত্র না পাইয়া আমি বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। আমাকে কেহ না বলিলেও আমি কোন প্রকারে শুনিয়াছিলাম যে, সম্প্রতি তাহার কি পীড়া হইয়াছিল। এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার পত্র পাইবার জন্য আমার আকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার এমনই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, ছুটিয়া যাইয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আসি; কিন্তু আমি নূতন জামাই, বিনা আহ্বানে ও পিতামাতার বিনা অনুমতিতে যাইতে পারিলাম না।

শ্রীরামপুর নিবাসী আমার কয়েকজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত রথের দিন মাহেশে রথ দেখিতে যাইলাম। আমার উদ্দেশ্য, কলা বেচা অর্থাৎ সরলাকে একবার দেখা। শ্বশুর বাড়ীর পার্শ্বের পথ দিয়া তিনবার যাতায়াত করিলাম, কিন্তু জানালায় বা ছাদে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। বাটীর দ্বারদেশে এমন একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না যে, আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারে ও ডাকিয়া বাটীতে লইয়া যায়। আমি হতাশ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি পত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পড়া শুনায় মন দিলাম; কিন্তু যখনই সরলার কথা মনে হইত, তখনই আমি বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। বন্ধু বান্ধবগণ আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিতেন "যে শনিবারে তোর বাবা বাড়ী যাবেন না,সেই শনিবারে বাড়ী যাবার নাম ক'রে শ্রীরামপুরে চলে যা না. একবার দেখে আয় না।" আমার কিন্তু বুক ফাটিলেও সাহসে কুলাইত না। অবশেষে দেখিলাম যে, কেহই আমার শ্বশুরালয়ে যাইবার কথা দূরে থাক, আমার যে বিবাহ হইয়াছে, একটা শ্বশুরালয় আছে, এমন কথা মুখে আনে না। যদি পূজা পার্ব্বণে তত্ত্ব করিবার প্রথা না থাকিত, তাহা হইলে হয় তো আমার বিবাহটা একটা স্বপ্নে পরিণত হইত। ছয় মাস না যাইতেই আমার ব্যাকুলতা বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম করিল। যে সকল বন্ধু আমাকে লুকাইয়া শ্বশুরালয়ে যাইতে বলিতেন, এখন তাঁহাদের কথা কাণে তুলিতে ও শ্বশুরালয়ে গমন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

কলেজের 'নোটীশ বোর্ডে' দেখা গেল, আগামী শনিবারে কোন লেকচার নাই। তাহার পর জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য সোমবার ও মঙ্গলবার কলেজ বন্ধ। অতএব চারিদিন ছুটি পাওয়া গেল। এ দিকে শুনিলাম, সম্ভবত পূজা উপলক্ষে পিতা ছুটী লইতে পারিবেন না, তাঁহার আপিসে কি একটা জরুরি কাজ পড়িয়াছে। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার বড় ধুম, সেই জন্য আমি মাতুলালয়ে যাইতে চাহিলাম, পিতা তাহাতে আপত্তি করিলেন না। বন্ধুগণ আমাকে এই সুযোগে শ্রীরামপুরে যাইতে পরামর্শ দিলেন, আমিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; কিন্তু বড় ভয় হইতে লাগিল যে, আমার কীর্ত্তি যদি প্রকাশিত হইয়া পড়ে,তাহা হইলে বড় লজ্জায় পড়িতে হইবে; হয় তো তিরস্কারের হাত হইতেও নিস্তার পাইব না।

শুক্রবারে শ্রীরামপুরে যাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে অক্ষয়

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে আমার সম্পর্কে ভাই হয়, আমা অপেক্ষা এক বৎসর কি দেড় বৎসরের বড়। আমি কখনো তাহাকে দাদা বলি, কখন নাম ধরিয়াও ডাকি। আগামী রবিবারে তাহার বিবাহ, সে আমাকে ধরিয়া বসিল যে. আজই আমাকে তাহাদের বাটীতে যাইতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ! ইহা কি পারা যায়? অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম; তবে আমাকে প্রতিশ্রুত হইতে হইল যে, রবিবারে আমি নিশ্চিত তাহাদের বাটীতে যাইব ও বরানুগমন করিব। তাহার বিবাহ ভবানীপুরে।

(৩)

শ্রীরামপুর নিবাসী বন্ধুবর্গের সহিত দুর্গা বলিয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম। আমরা টিকিট ক্রয় করিতেছি, এমন সময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। কি দুর্দ্দৈব! আমার যে এক মিনিট বিলম্ব সহিতেছিল না। নিরুপায় হইয়া পরের ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। যথা সময়ে ট্রেণে উঠিলাম এবং আধ ঘণ্টার পথ আমার বোধ হইল দুই ঘণ্টায় আসিলাম। ট্রেণ হইতে নামিয়া বন্ধুগণ আমার জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতেছেন, এমন সময় আমার দাদা শ্বশুর (সরলার খুল্ল মাতামহ) কাশীনাথ বাবু আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কে হে শরৎ না? তুমি এখানে?" কাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া আমি বলিলাম, "এঁরা আমার সতীর্থ, এঁদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা, কোন মতেই ছাড়লেন না, তাই বেড়াতে এসেছি।"

"সোমবারে গেলেই হবে,এখন বাড়ী চল। আপনারা কিছু মনে করবেন না, শরৎ সোমবারে আপনাদের বাড়ীতে যাবে। আমায় চেনেন বোধ হয়, আমার নাম কাশীনাথ দে, শরৎ আমার নাতজামাই।"

কেহ আর কোন কথাই কহিলেন না। কাশী বাবু আমাকে লইয়া এক খানা গাড়ীতে উঠিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। যোগাযোগটা মন্দ হইল না; কিন্তু তিনি যখন বলিলেন "এই মাত্র সরলাকে কলিকাতায় রেখে আসলাম," তখন আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের কলিকাতা জোড়াসাঁকোতে একটা বাড়ী আছে এবং সরলা মধ্যে মধ্যে সেখানে থাকে। হায়! এত নিকটে থাকিতেও তাহাকে এই আট মাসের মধ্যে এক দিনও দেখিতে পাইলাম না।

গাড়ী হইতে নামিলাম। একি সেই আনন্দ কোলাহল পূর্ণ বাড়ী!

চারিদিক অন্ধকার, কদাচ কোথাও একটি আলোর ক্ষীণ জ্যোতিঃ সেই প্রকাণ্ড পুরীকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। বাটীর পরিজনবর্গ অনেকেই কলিকাতায় আছেন, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ম্যালেরিয়ার কৃপায় শয্যাগত। যাঁহারা সুস্থ আছেন, তাঁহারাও কেমন নির্জীব ও নিরানন্দময়। আমার এ প্রকার অপ্রত্যাশিত শুভাগমনে বাটীর সকলেই যথেষ্ট আনন্দিত হইলেন এবং যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন—কেবল আনন্দ নাই আমার অন্তরে। আমি মনে করিতে লাগিলাম, রাত্রি প্রভাত হইলেই প্রথম ট্রেণে বাড়ী চলিয়া যাইব। মহা আড়ম্বরে জলযোগ সমাধা হইল, তৎপরে আমি শুইয়া পড়িলাম, বাটীর ভিতরেই থাকিলাম, বহির্ব্বাটীতে যাইলাম না। শ্যালিকা ও দিদি শাশুড়ীর দল আমার সহিত গল্প ও হাস্য পরিহাস করিতে আসিলেন। আমি অধিক কথা কহিলাম না, বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। প্রচুর আহার্য্যের আয়োজন হইতে একটু বিলম্ব হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ছোট দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শরৎ! মাথা ধরা ছাড়ল কি?" আমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক নবীনা শ্যালিকা বলিলেন, "ও মাথা কি আর সরলার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়বে ছোট্‌দি?"

"এই ক ঘণ্টা—যাতে কাল সকালেই দেখা হয়, ছোট কর্ত্তা সে বন্দোবস্ত করছেন।"

"বৈকালে গেলেও চলিত, কিন্তু তারা যদি বিয়ে বাড়ী চলে যায়?"

আমি বলিলাম, "না, আমি আর কোথাও যাব না; আমি বন্ধুদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে এসেছি, আমাকে সেখানে যেতে হবে। তাঁদের সঙ্গে আজই চলে যাচ্ছিলাম, ছোট্‌দা মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল, উনি ছাড়লেন না কাজেই এসে আপনাদের দেখে গেলাম।" ছোট দিদি বলিলেন, "তা বেশ করেছ, কিন্তু যাকে দেখতে এলে, তাকে তো দেখা হ'ল না। পূজার এখন অনেক দেরী আছে, তাকে দেখে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারবে।" শ্যালিকাটী বলিলেন, "ছেড়ে আসতে পারলে তো!"

আর অধিক কথা হইল না, আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। আহার নাম মাত্র, খাইবার মত ক্ষুধাই হইল না। সুনিদ্রাও হইল না।

(৪)

প্রাতে স্থির হইল যে, আমি কাশীনাথ বাবুর সহিত তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতেই যাইব। আমি আর অন্য মত করিতে পারিলাম না, আমার যেন কোন অস্তিত্বই নাই। আমাদের আয়োজন করিতে অনেক বেলা হইল।

কলিকাতার বাটীর জন্য সে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর বিবাহ বাড়ীর জন্যও পাতা, মোচা, থোড়, কলা, শাক, শবজী, বাসন, বিছানা একত্রিত হইয়া একখানা গোরুর গাড়ীর বোঝা হইয়া উঠিল। একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া এই সকল সামগ্রী তাহাতে উঠান হইল, আমরাও উঠিলাম। যখন নৌকা ছাড়িল, তখন বেলা সাড়ে আটটা। ভাটার তেজ কমিয়া গিয়াছে বলিয়া নৌকা ভাল চলিল না, এক ঘণ্টার মধ্যে জোয়ার আসিয়া পড়িল। কি বিভ্রাট! সকলেই যেন পরামর্শ করিয়াছে যে, আমাকে সরলার সহিত মিলিত হইতে দিবে না। আমরা যখন কলিকাতার বাটীতে পৌঁছিলাম, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে, পরিজনবর্গ আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সকলেই আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আমার স্নানাহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যে শুভ সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে আমার স্নানাহার ঘুরিয়া গেল। সে শুভ সংবাদ এই যে, তাঁহাদিগের এক নিকট আত্মীয়ের কন্যার বিবাহ কল্য রবিবারে, তদুপলক্ষে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও সরলা দুই তিন দিনের জন্য বিবাহ বাটীতে গিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তাহারা যাত্রা করিয়াছে।

কি অশুভক্ষণেই বাসা হইতে পা বাড়াইয়াছিলাম! যাহা হউক, আমি ভগ্ন হৃদয়ে এই স্থির করিলাম যে, আর সরলাকে দেখিয়া কাজ নাই—বাসায় ফিরিয়া যাই। আমাকে মন-মরা দেখিয়া দিদি শাশুড়ী প্রস্তাব করিলেন যে, সরলাকে আনিবার জন্য লোক পাঠানো হউক; কিন্তু পুরুষ মহলে সে প্রস্তাব টিকিল না। অনেক বিলম্বে আহারাদি সমাপ্ত হইল, আমি একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম, কিন্তু শরীর অবসন্ন ও পূর্ব্ব রজনীর অনিদ্রা বশত আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে, কাজেই সে দিন আর আমার কোথাও যাওয়া হইল না। কোন প্রকারে শ্বশুরালয়ে যাপন করিতে হইল, শ্যালিকা ও দিদি শাশুড়ী সম্পর্কীয়া যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতে ত্রুটী করিলেন না।

পরদিন প্রত্যুষে বাসায় চলিয়া যাইলাম, কিন্তু বাটীতে প্রবেশ করিতেই গবাক্ষ হইতে ব্রজনাথ ইঙ্গিতে জানাইল যে, পিতা বাসায় রহিয়াছেন, আপিসের কাজের জন্য তাঁহার বাটী যাওয়া হয় নাই। আমি ত্বরিৎপদে ফিরিলাম। কোথাই যাই? একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অক্ষয়দের বাটীতে আসিলাম। আজ তাহার বিবাহ, আমারও আসিবার কথা ছিল, সুতরাং আদর যত্ন পাইলাম। লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে গত দুই দিবসের বৃত্তান্ত বলিলাম, সে একটু দুঃখও করিল, আবার হাসিতেও ছাড়িল না। আমরা উভয়ে মীমাংসা করিলাম যে, বিনা নিমন্ত্রণে আর কখন শ্বশুরালয়ে যাওয়া হইবে না।

ক্রমে ক্রমে আমরা অনেকগুলি সমবয়স্ক ও সতীর্থ একত্রিত হইলাম। অক্ষয় অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। দিন বড় আনন্দে কাটিল, আমার আর অবসাদ নাই, বিবাহোপযোগী স্ফূর্ত্তি আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

সরলার সহিত সাক্ষাতে অকৃতকার্য্যতার জন্য নৈরাশ্য একেবারে ভুলিয়াই যাইলাম।

(৫)

আমরা সন্ধ্যাকালে বরানুগমন করিলাম। বিবাহ ভবানীপুরে। মোটর যানে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বিবাহ বাটীতে পৌঁছিলাম। বিবাহের লগ্ন রাত্রি দশটার পরে, সুতরাং বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদিগকে ভোজন করান হইল গেল ; কিন্তু আমরা বরের বন্ধুগণ কেহই বসিলাম না, বিবাহান্তে বরের সহিত আহার করিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। কন্যাযাত্রীর মধ্যেও দুইজন সতীর্থ মিলিল, হাসি কৌতুকে সময় কাটিয়া গেল, বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। অক্ষয়কে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সেই সময়ে তাহার ঘড়ি ও চেন আমার নিকট রাখিতে দিল। বিবাহ আরম্ভ হইল। স্ত্রী আচারের জন্য বর বাটীর ভিতর গেল। কিয়ৎকাল পরে পরামর্শ করিয়া আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম, কেহ আমাদিগকে নিষেধ করিল না। বহু সুবেশধারিণী সুন্দরী নারীর মধ্যে এক পরমাসুন্দরী কিশোরীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। এ কি ভ্রান্তি না স্বপ্ন ! এ যে দেখিতে ঠিক সরলার মতো—না স্বয়ং সরলা। সে যে আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহোপলক্ষে গিয়াছে, এ কি সেই বাটী ? আহা কি ভুল ! কন্যাকর্ত্তার নামটা জানিয়া লই নাই কেন ? কিশোরী কি স্ফুর্ত্তির সহিত চলিতেছে ফিরিতেছে ! কি মধুর হাসির সহিত বয়স্যাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছে ! কি তৎপরতার সহিত আজ কর্ম্ম করিতেছে, আর কি আনন্দের সহিত অক্ষয় দাদার কর্ণ মর্দ্দন করিতেছে। আমি কেবল তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল সেও আমাকে দেখিতেছে—চারি চক্ষু একত্র হইল—সরলা কি আমাকে চিনিল? নতুবা হাসিল কেন ? এক বয়স্যাকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইল—যে এমন অভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাই দেখাইল কি ? সে যদি সরলা না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাই ; আমাকে চিনিতে না পারিয়া অন্য কেহ মনে করিলেও ভদ্রতা বর্জ্জিত লোকটাকে দেখাইয়া দিতে পারে।

বিবাহ সমাধা হইয়া গেলে অক্ষয়কে সরলার কথা বলিলাম। "ফিরোজা রঙের সাড়ী পরা যে কিশোরী তোমার কানের সহিত বহুবার আত্মীয়তা করিল, সেই সরলা।"

"সে যে ভারি সুন্দরী !

"সরলাকে কি সুন্দরী হ'তে নেই ?"

"ঠিক চিনিতে পেরেছ ? আমার বোধ হয়, মনটা সরলায় ভরে রয়েছে, তাই চোখেও সরলা দেখতে পেলে।"

"এতই কি ভুল করলাম ? আর একবার দেখতে পেলে বুঝতে পারতাম—আমার তো বিশ্বাস যে ভুল করিনি।"

"আচ্ছা আমি তাকে আর একবার দেখাবার চেষ্টা করবো এখন।"

আমাদের আহারাদি করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। যাঁহারা বাড়ীতে ফিরিবেন তাঁহাদের জন্য গাড়ী আসিতে লাগিল, তাঁহারা সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমরা বরের আত্মীয় পাঁচ ছয় জন যাইব কি সেইখানেই রাত্রি যাপন করিব, এই পরামর্শ করিতেছি, এমন সময়ে একটি ঝি আসিয়া বলিল, "আপনাদের ভেতর বরের ভাই শরৎ বাবু কে আছেন, তাঁকে জামাই বাবু একবার ডাকছেন।" আমি বলিলাম, "কোথা জামাই বাবু ? আমার নাম শরৎ।"

"আসুন বাসর ঘরে। তিনিই আসছিলেন, শ্যালী শ্যালজরা কি ছাড়ে ?"

আমি ঝির সহিত বাসরে প্রবেশ করিলাম। অক্ষয় আমাকে বলিল, "দেখ, বাবার সোনার ঘড়ি আর চেন আমার কাছে ছিল, হারিয়ে ফেলেছি। কাপড় ছাড়বার সময় যে কার হাতে দিলাম, তা আর মনে হচ্ছে না।"

"কি সুন্দর মন ! আমার হাতে দিলে যে ! এই নাও।"

"আঃ ! বাঁচলাম বড় ভাবনা হয়েছিল। তোর কাছেই থাক।"

(৬)

হাঁ, বাসর ঘর বটে ! কেবল সুন্দরীর সমাবেশ ! আমার বাসর ঘর বাছা বাছা সুন্দরীতে পূর্ণ ছিল, কিন্তু সে ইহার কাছে লজ্জা পায়। আমি একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম, ফিরোজা বসনা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাই কি না।

এক তরুণী বলিলেন, "দেখ, শান্ত ঠান্‌দি ! এই ইনিই স্ত্রী আচারের সময় রাঙা দিদিকে বার বার দেখছিলেন আর হাসছিলেন।" ঠানদিদি বলিলেন, "এদিকে বরের ভাই ওদিকে কনের বোন্, দেখলে তার কি হল ? তোর রাঙাদিদি ক্ষয়ে গেল নাকি ?"

"হলুই বা বরের ভাই. তাই বলে কনের বোনকে অমন হাঁ করে দেখবে নাকি ? হাঁ হে বর ! তোমার ভায়ের বুঝি বিয়ে হয় নি ?" অক্ষয় বলিল, "হয়েছে বই কি—ভারি সুন্দরী বৌ।"

ঠান্‌দিদি বলিলেন "তবে অপরাধ গুরুতর। ডাক্ তো সুরি তোর রাঙা দিদিকে, দিক্ শালার কান মলে।"

আর ডাকিতে হইল না, ফিরোজা বসনা সুন্দরী অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সেই খানেই বসিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া আমার কর্ণ ধরিলেন এবং অবগুণ্ঠনের মধ্যে হাসিতে লাগিলেন! সে হাসি আমার চেনা, সে হাত আমার চেনা। আমি বলিলাম, "এ কি সরলা! আজ থেকে কি আমার সঙ্গে তোমার কান মলবার সম্পর্ক হ'ল নাকি?" সুন্দরী তথাপি কান ছাড়িলেন না, আমার কষ্ট হইতে লাগিল, আমি তাঁহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া আমার কর্ণের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিলাম। আর যাই কোথা! বোলতার চাকে ঢিল মারিলে যেমন শত শত বোলতা গর্জ্জন করিয়া আক্রমণ করে, তেমনই তিন চারি জন নবীনা প্রবীণা আমার লাঞ্ছনায় বদ্ধ পরিকর হইলেন, এক জন বলিলেন, "পরস্ত্রীর গায়ে হাত দাও, তুমি কি রকম লোক!" আর একজন বলিলেন "তাই তো! একটু ভদ্রতা জানে না!" ফিরোজা বসনা সুন্দরী অবগুণ্ঠন খুলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাতাল গো মাতাল—যেতে দাও।"

আমি বলিলাম, "মাতাল নই, তবে আপনাদের ভেল্কীতে আমার ধাঁধা লেগেছে বটে। এই দেখলাম আপনি সরলা—সেই শাড়ী, সেই গহনা, সেই হাত, আবার এখন দেখছি, বিরাজ ঠাকুঝি। বিয়ের সময় শ্রীরামপুরে ও হাতের কানমলা অনেক খেয়েছি।"

ঠান্‌দিদি বলিলেন, "এতক্ষণে বোঝা গেল, এ মানুষটি পাগল; তাই একবার বলে সরলা, একবার বলে বিরাজ ঠাকুঝি, মাথার ঠিক নেই, আমরা তো সরলাও জানি নে, বিরাজও জানি নে।"

"আর পাঁচ মিনিট এখানে থাকলে যে পাগল হ'য়ে যাব, তাতে ভুল নেই। আপনারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারেন। দয়া করে ঝিকে ডাকুন, আমাকে গোলক ধাঁধা থেকে বার করে দিক্।"

বিরাজ ঠাকুঝি বলিলেন, "পাগল তো আছই, আর হতে হবে কেন? নইলে আমাকে কোন্ দিন না দেখেও বলছ কি না, ঠাকুঝি। আমি কি শালী নাকি, লোকটার আক্কেল দেখো।"

এই সময়ে নানালঙ্কার ভূষিতা এক প্রৌঢ়া সুন্দরী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, "গোপালের জামাই শরৎ এখানে এসেছে না?"

এক নবীনা বলিলেন, "এই যে ঠাকুর মা ! তোমার নাত জামাইকে নিয়ে আমরা রাস যাত্রা করছি।"

"তাই বুঝি সরি উঠে গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছে,যা তো বিরাজ ! আন তো ধরে, আজ ডবল বাসর করি।"

এক সুন্দরী বলিলেন, "তাই উচিত বটে, বেচারা হেম্ন্যা হয়ে শ্রীরামপুর, জোড়াসাঁকো, ভবানীপুর অনেক ঘুরেছে।"

আর বাসর বর্ণনায় কাজ নাই. সরলাকে যে দেখিতে পাইলাম, ইহাই যথেষ্ট। অতঃপর জানিয়াছিলাম যে, এই বিবাহে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল এবং অক্ষয়ের স্ত্রী শেফালি সরলার মামাতো ভগ্নী। অক্ষয়ের সহিত পুরাতন সম্বন্ধ বশত আমি যে বরানুগমন করিব, সে কথা পূর্ব্বেই বাটীর লোকে জানিয়াছিলেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

শান্তি পথে

একাদশ পরিচ্ছেদ

তিনি দেবতা

পূজার পরে দ্বাদশীর দিন সীতা বলিলেন, মা, আজ একবার সুরপুর গেলে হয় না? একবার মিত্তির মশাইকে বিজয়ার প্রণাম ক'রে আসি না?

বধূর কথায় বৃদ্ধা অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেশ তো, মা,যাও না। ভালই তো।

অনুমতি পাইয়া শ্রীমতী সীতাসুন্দরী স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন, ওগো আজকে, একবার বীণা বাজাতে যাবো।

অমৃতবাবু বলিলেন. কোথায় গো ?—বীণা বাজাতে কোথায় যাবে ?

সীতা। কেন সুরপুরে, হরকান্ত মিত্রের বাড়ীতে, চম্পকবরণীর পাহারার ভেতরে?

অমৃতবাবু। ওঃ, লোহা পেতলের তার ছেড়ে, একেবারে হাড় মাংসের মানুষ বাজাবে? কিন্তু সে বীণা কি বাজবে ?

সীতা। দেখি একবার চেষ্টা কোরে। সুবোধ বাবু, অমন ভাল মানুষ, দিনরাত কেবল ব'সে ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন, তা আমি দেখতে পারি

না। এ হাতে যদি সে বীণা থাকে তো ভালই, তা না হ'লে সুবোধ বাবুর আর একটা বে দিতে হবে।

অমৃত বাবু কেবল একটু হাসিলেন, কোনও কথা বলিলেন না।

সীতা তখন সুবোধের নিকট যাইয়া বলিলেন, দেখুন, সুবোধ বাবু, আমার একটা উপকার করতে হবে। আমি একটা চুরীর কাজে যাচ্ছি, আপনাকে আমার সহায়তা করতে হবে!

সুবোধ হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম? স্বামী দেন চোরের শাস্তি, তাঁর স্ত্রী করেন চুরী? আপনি কোথায় চুরী করতে যাবেন?

সীতা। সুরপুরে, মিত্তির বাড়ীর চাঁপা বাগানের আড়ালে।

সুবোধ তখন সীতার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ত্রেতাযুগে সীতা গিয়েছিলেন রাবণের অশোক বনে, তার জন্যে তাঁর অশেষ লাঞ্ছনা হয়েছিল। কলিযুগের সীতা কি চাঁপা বনে গিয়ে সেই কলঙ্কটা নতুন ক'রে ভোগ করতে চান।

সীতা। কলঙ্ক হয় আমার হবে, আপনি সঙ্গে যাবেন বই তো নয়?

সু। আমি গরীব স্কুল মাষ্টার ওসব চুরি টুরির মধ্যে আমি নেই। তারপর আর এক কথা চোরাই মাল ভোগে সুখও নেই।

অনেক অনুনয় বিনয়েও সুবোধ যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। কেবল দুই ছড়া হীরক খচিত স্বর্ণ হার বীণা ও ললিতার জন্য তাঁহাকে দিলেন। এই দুইটা মূল্যবান অলঙ্কার পূজার সময় পত্নীকে উপহার দিবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী সীতাসুন্দরী পুত্র ও কন্যা লইয়া সুরপুরে যাইয়া মিত্র পরিবারের সকলকে চমকিত করিয়া দিলেন। নমস্কার ও আশীর্ব্বাদের পালা সমাপ্ত হইলে সীতা বীণার সহিত বহুক্ষণ গোপনে আলাপ করিলেন।

সীতা বলিলেন, তুমি এটা করলে কি বৌ? স্বামীকে ছেড়ে ভায়ের আশ্রয় নিলে? এতে কি সুখ হবে?

বীণা কাতর-কণ্ঠে বলিল কি জানি কি করলুম, দিদি? আমি কি আর মানুষ গা? দাদা, বৌ দিদি বল্লেন, এই রকম করো, আমিও তাই করলুম। এক এক সময় বুকটা যেন ফেটে যায়, কিন্তু কি করব? গুমরে গুমরে মরি।

সীতা। কেন এমন করো।

বী। বুঝিনা, দিদি, বুঝিনা; সকলে বল্লেন, ওর সঙ্গে যাস্‌নি, গেলে জাত যায়, ধর্ম্ম যায়, ইহকাল পরকাল যায়।

সী। যারা অমন কথা বলে, তাদের মুখে আগুণ। বিলেত গেলে কি হয়, এই ত আমি গিয়েছিলুম, আমার কি হয়েচে, বৌ? জাত নেই? কেন জাত কি কর্পূরের ড্যালা যে, হাওয়া লাগ্‌লেই উড়ে যাবে।

বী। তবে কি বিলেত গেলে জাত যায় না?

সী। যাদের জাত ঠুন্‌কো তাদের জাত কথায় কথায় ভাঙে। যারা কাঁচের ঘরে থাকে তাদের ঘর সহজেই ভেঙে যায়। আমরা লোহার ঘরে বাস করি, আমাদের ঘর অত সহজে ভাঙে না।

বী। তবে যে সবাই বলে বিলেত গেলে জাত যায়?

সী। জাত মানে যদি একদলের নিন্দে বা ভ্রূকুটী হয়, জাত মানে যদি একঘরে হওয়া হয়, তা হ'লে জাত কথায় কথায় যায় এবং আরো যাবে। আর জাত মানে যদি চরিত্র, চিন্তা-প্রণালী ও কার্য্য-প্রণালী হয় তো জাত ভাঙে কার সাধ্যি। লাখ লাখ টিকি এক সঙ্গে নড়লেও আমার জাত আমি নিজে না ছাড়লে কেউ ছাড়াতে পারবে না

বী। সমাজে একঘরে তো করতে পারে?

সী। পারে পারুক। আজ পারবে, কাল পারবে, কিন্তু একদিন আসবে যখন এই সব একঘরে লোকদের পুনরায় সমাজ-ভুক্ত কর্‌বার জন্যে এই সমাজকেই চেষ্টা ক'রতে হবে। যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি ভাল লোক হয়, তো তাদের সমাজে টানবার জন্যে চেষ্টা করতেই হবে। জগতময় সকল সমাজেরই এই সনাতন ব্যবস্থা।

বী। আর যারা খারাপ লোক?

সী। খারাপ লোকেরা সমাজের ময়লা। তারা একঘরে হলেও ময়লা, না হলেও তাই। কতকগুলো ময়লা একজায়গায় রাখলে তা পচে উঠবেই, তাতে দুর্গন্ধ হবেই। আজকালকার সমাজের কর্ত্তারা তো চরিত্র দেখে লোককে একঘরে করেন না; করেন বাইরের দু' একটা কাজ দেখে। এই ব্যবস্থাটাই হচ্চে দোষের।

শ্রীমতী সীতার এই সকল সমাজতত্ত্বের কথা বীণা বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করিলেন। সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিলেন না। হয় তো চেষ্টা করিলেও বুঝিতেন না। কিন্তু না বুঝিলেও শুনিলেন, শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি আমায় কি ক'রতে বলো ?"

সীতা বীণার পৃষ্ঠে হস্ত-স্থাপন করিয়া বলিলেন, কি আর ব'লব বৌ ? যা সবাই করে তাই ক'রতে বলি। হিঁদুর ঘরের বৌ, স্বামী বই আর কি জানে ? স্বামীই তার গুরু,স্বামীই তার দেবতা. আমি বলি,স্বামীর কাছে যাও।

এইবার বীণা আপনার প্রাণের কথা বলিবার জন্য হৃদয়ের রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, আমিও তাই বলেছিলুম দিদি! কিন্তু দাদা ভয় দেখালেন ; বৌদি বল্লেন, উনি না কি আর কাকে ভালবাসেন।

সীতা ক্রোধভরে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, মিথ্যা কথা, ফন্দিবাজী মতলবের কথা। ও সব মিথ্যা পতি-নিন্দা শুনলে পাপ হয়। দক্ষরাজার মেয়ে সতী-বাপের মুখে মিথ্যা পতি-নিন্দা শুনে আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। আর তুমি তোমার গুণবতী বৌদিদির কথা শুনে, স্বামীর ওপর বিরূপ হয়েচ। এই কি তোমার ধর্ম্ম, বৌ ?

লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে বীণার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া বাঁ পায়ের কণিষ্ঠাঙ্গুলির নখ খুঁটিতে আরম্ভ করিল। সীতা তখন পুনরায় বলিলেন,পরের কথায় বিশ্বাস করে,কেন কষ্ট পাও? যাও,তাঁরকাছে যাও।

বীণা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, দাদারা কি বলবেন ?

সীতা। দাদারা তোমার মাথাটা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন ? এততেও তুমি দাদা আর বৌদিদিকে চিনলে না ? কেন বল দেখি বৌ, এমন করে পরের মিথ্যা কথা শুনে আপনার পায়ে কুড়ুল মারচ ?

বীণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সীতার প্রতিভা-দীপ্ত মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কি করব ? চিরদিন দাদাকে মেনে এসেচি এখন——

বীণা আরও কি বলিতে চাহিতেছিল, হৃদয়ের আবেগ আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিল,—তাহার বাক্য বন্ধ হইল। সীতা তখন বলিলেন, তবু সেই দাদার কথা ? তোর এইরূপ যৌবন, তোর এই ভোগাকাঙ্খা, কে জুড়বে বৌ ? সকলের সব আছে, তার আর কে আছে ? স্বামীকে ছাড়লে তোর কি থাকবে ? এই কোটা বালাখানা, ধন দৌলৎ, চাকর নফর, নিয়ে তোর কি হবে ? দুধের তেষ্টা কি পাথর চিবুলে মিটবে ?

বীণা ভাবাবেগে বহুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বলিল, তিনি আমায় নেবেন কেন ? তাঁর যাতে তৃপ্তি ও সুখ হ'তে পারে, আমার তো সে সব কিছু নেই।

সীতা। নেই, অথচ আছে। যদি হৃদয়ে ভালবাসা থাকে তবে সব আছে, বোন। এই ভালবাসা থেকেই বিদ্যা বুদ্ধি সব আসতে পারে। কিছু ভেবো না, তুমি যদি তাঁকে ভালবাস, প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে; শরীর দিয়ে, তাঁকে ভালবাস, দেখবে এতেই যা নেই সে সবই ফুটে উঠ্‌বে।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি কি আমায় নেবেন ?

সীতা। নেবেন না? নিশ্চয়ই নেবেন। তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় তাঁর কাছে পৌঁচে দেবো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

বীণা। প্রাণ বলে যাই, কিন্তু সবাই কি বলবে ?

সীতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তবে তুমি মরো। তোমার বরাতে অনেক দুক্ষু আছে।

সীতা বাহিরে যাইবার সময় বলিলেন, একটা কাজ এখনও বাকি আছে। এই দু'ছড়া হার সুবোধ বাবু তোমায় দিয়েচেন—একছড়া তোমার, আর একছড়া ললিতার। আর তিনি জানাতে বলে দিয়েচেন যে, জীবনে কোন দিন যদি তাঁর কাছে তোমার যাবার ইচ্ছে হয়, চলে যেও, তিনি সর্ব্বদাই তোমার জন্য তাঁর ঘর সাজিয়ে রাখবেন।

এই বলিয়া হীরক-হার-দ্বয় ভূমিতে রাখিয়া সীতা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর বীণা কি করিল ? বীণা সেই ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইয়া স্বামীর উপহারের হার বক্ষে চাপিয়া অশ্রু-জলে ভূমি সিক্ত করিতে লাগিল। হীরার হার বক্ষতলে চাপিয়া তোমার ব্যথা জুড়াইল কি, বীণা? কাঁদিয়া তোমার প্রাণের ভার লঘু হইল কি? বুঝি হইল না। কেন না বহুক্ষণ কাঁদিয়াও তাহার ক্রন্দন থামিল না। কিছুক্ষণ পরে ললিতা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি পাঠিয়েচেন মা ?

মাতা চক্ষু মুছিয়া কন্যাকে দুইটি হার দেখাইয়া বলিল, এইটে তুমি গলায় দিয়ে সকলকে প্রণাম করে এস।

ললি। আর তোমারটা তুমি পরবে না ?

বীণা। না, মা, আমি এখন পরব না। আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে-ছিলুম কি না, তিনি রাগ করেচেন—না রাগ করেন নি—তাঁর ভারি দুক্ষু হয়েচে, তিনি আগে এসে আমায় মারবেন, তারপর নিজের হাতে এই হার আমায় পরিয়ে দিলে তবে আমি পরব।

ললিতা বিস্ময়--বিস্ফারিত নেত্রে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

বাঃ, বাবা তোমায় মারবেন কেন? তিনি কি দুষ্টু, যে তোমায় মারবেন?

বীণা। তিনি দুষ্টু না। তিনি দেবতা। আমিই দুষ্টু। তিনি আমাকে না মারলে আমার বুক জুড়বে না মা।

ললি। তুমি কেন তবে তাঁর সঙ্গে ভাব কর না?

বীণা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ মা, ললি, তুই তাঁর কাছে যাবি?

কন্যা তখন শরীরের আনন্দ-চঞ্চল আন্দোলনে বলিল, হ্যাঁ মা, যাব। অসিতের সঙ্গে যাব। তুমি যাবে?

বীণা। আজ না, আগে ভাব হোক। তারপর যাব।

ললিতা তখন পিতৃ-প্রদত্ত হীরক-হার হস্তে লইয়া আনন্দ-চঞ্চল পদ-বিক্ষেপে সকলকে তাহা দেখাইবার জন্য চলিল! শাস্ত্রী মহাশয়, মিত্র মহাশয়, হরির মাতা, অসিত, অসীমা, নগেন্দ্রনাথ চম্পকবরণী, এবং দাস দাসীর অনেককেই সে হর্ষোৎফুল্ল আননে সেই সুন্দর হার দেখাইল। মিত্র মহাশয় হার দেখিয়া গম্ভীর মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দিদি, বাবার দেওয়া হার গলায় পর না কেন? দেখি কেমন দেখায়?

ললি। না, তা পরব' না।

মিত্র। কেন?

ললি। মার হার যে মা পরলেন না।

মিত্র। কেন? বৌমা কেন হার পরলেন না?

ললি। মা বল্লেন, তিনি নাকি কি দোষ করেচেন। বাবা এসে তাঁকে শাস্তি দিয়ে নিজের হাতে হার পরিয়ে দিলে, তবে মা হার পরবেন।

ললিতার কথায় বৃদ্ধের শরীর কাঁপিয়া উঠিল। হাত হইতে গড়গড়ার নল ভূতলে পতিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বৌমা, আমি তোমার জ্বালার কারণ। আমার উচিত তোমাকে সুবোর কাছে পাঠিয়ে দি। কিন্তু তুমি গেলে ললিতাও যাবে। আমি তখন কাকে নিয়ে সংসার ক'রব মা? আমিই সকল অশান্তির কারণ। তুমি, সুবোধ, ললিতা সবাই আমার জন্যে কষ্ট পাচ্চ। আর আমিই বা কি শান্তিতে আছি? ভাবিতে ভাবিতে তিনি পত্নীর চিত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তুমি বেশ আছ গিন্নি, বেশ আছ। তোমার কাছে সমাজের হৃদয়হীন শাসন নেই, প্রেমহীন অত্যাচার নেই।

তুমিই বেশ শান্তিতে আছ। তোমার কাছে আমায় শীগ্‌গির টেনে নাও, আর যে এ রকম করে তুঁষের আগুণে পুড়তে পারি না গো।

পিতামহের গম্ভীর মুখ দেখিয়া ললিতা ইতিপুর্ব্বেই অন্যত্র গমন করিয়াছিল। মিত্র মহাশয়ের চিন্তার অবসান হইলে, তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ললিতা নাই। তিনি ভাবিলেন, সে পালিয়েচে। এই রকম করে সে সত্যি সত্যিই কোন্ দিন আমার কাছ থেকে পালাবে। সবাই যাবে গো, সবাই যাবে; কেবল আমি একা জ্বলে পুড়ে মরবার জন্যে এখানে বসে থাকব। উঃ এত জ্বালাও এই বুড়ো বয়সে ছিল।

ললিতা চম্পকবরণীর নিকট যাইয়া হার দেখাইলে তিনি বলিলেন, বাঃ! বেশ হারতো, দেখি, আমার সুধার গলায় কেমন মানায়।

এই বলিয়া তিনি ললিতার হস্তের হার সুধার গলে দিয়া বলিলেন, হার ছড়া আমার সুধামুখীর গলায় বেশ মানিয়েচে। তুই তো এ হার এখন পরবিনি, তবে সুধা এখন পরুক না?

ললিতা বলিল, আচ্ছা সুধা-দিদিই পরুক।

বৃদ্ধা পরিচারিকা, হরির মাতা, নিকটে ছিল, সে বলিল, আহা ছেলে মানুষ, ওর জিনিষ কি নিতে আছে পিসিমা? বাপ দিয়েছে ব'লে আহ্লাদ ক'রে দেখাতে এল। আহা!

নগেন্দ্রনাথ নিকটে ছিলেন, তিনি বলিলেন, ও হার সুধার গলায় দিয়ে কাজ নেই। আমি ওর চেয়ে ভাল হার সুধার জন্যে গড়িয়ে দেব। ওর বে'র জন্যে গয়না তো গড়াতেই হবে।

সুধা তখন ক্রোধভরে গলার হার খুলিয়া স-জোরে ললিতার পদতলে নিক্ষেপ করিল। সেই স্থানে একখণ্ড বস্ত্র পড়িয়াছিল; হার সেই বস্ত্রখণ্ডের উপর পড়িয়া ভাঙিল না। হরির মাতা তাহা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইয়া বলিল, সোনা কি পায়ে ফেলতে আছে মা অকল্যাণ হবে যে।

সুধা বলিল, ইস্, অকল্যাণ হবে? ভারি তো গয়না? আমি ও ছুঁই না।

সুধা কক্ষের বাহিরে যাইল। ললিতাও অন্য পথ দিয়া আসিয়া হার মাতাকে প্রত্যার্পণ করিল। মাতা দুই ছড়া হারই বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। মাতা ও কন্যা কেহই তাহা ব্যবহার করিলেন না। (ক্রমশ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সান্ত্বনা

—০—

শুষ্ক লতা টেনে' ফেল দূরে।
বরষার নবধারে, সঞ্চিত রসের ভারে,
শত বাহু প্রসারিয়া, খোঁজে চাল জুড়ে;
বিস্তারি' শ্যামল শোভা, নয়ন-মানস লোভা,
একদিন ছিল যার তরুণ যৌবন,
আজি সে সৌন্দর্য্য-হীন শ্যাম শ্রী কোথায় লীন,
শুষ্ক পাতা শীর্ণ লতা অতি অশোভন।
আবর্জ্জনা কোরে দাও দূর;
স্বহস্তে রোপিত লতা, ছিঁড়িতে কি লাগে ব্যথা,
মরমে কি বেজে উঠে বেদনার সুর?
মরেছে সে? মরে নাই, মনে বুঝে দেখ ভাই,
বীজের মাঝারে সে যে রয়েছে বাঁচিয়া।
একছিল বহু হোয়ে, আপনারে বিলাইয়ে,
সার্থক রেখাটি গেছে পিছনে আঁকিয়া।
বীজ তার করহ বপন;
আবার সে নবভাবে, নবরূপে দেখা দিবে,
বরষা করিবে তারে নয়ন শোভন।
আজি মোর মনে হয়, মৃত্যু, অমঙ্গলময়
বলি যায়, তারি মাঝে রয়েছে গোপন
অনন্ত জীবন ধারা; যুগে যুগে বিশ্বে সাড়া,
চলিছে অনন্তস্রোত, নাহিক বিনাশ—
কিছুরই এ বিশ্বধামে; জীবনই মৃত্যু নামে,
ছদ্মবেশে আপনার করিছে প্রকাশ।

শ্রীসরসীবালা বসু।

পূজার অবকাশে

আগরতলা—২২শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কুমিল্লা হইতে ১২টার ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় আগরতলা আসিলাম। কুমিল্লা হইতে আখউড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ।৵১০ আনা। ২ ঘণ্টার মধ্যে আসা যায়। আখউড়া হইতে আগরতলা ৭ মাইল ঘোড়ার গাড়ীর পথ। গাড়ী ভাড়া ১৲ হইতে কখনো কখনো ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

বন্ধুবর ডাক্তার কাজী সাহেবের প্রতিকূল পত্র সত্বেও আগরতলা আসিলাম তাহার কারণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইতে আগরতলা ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়। পীড়িত পুত্রকন্যা লইয়া বন্ধু আছেন—অন্তত তাঁহাকে দেখিয়া যাওয়াও কর্ত্তব্য। কুমিল্লায় যাঁহার কৃপা সম্ভোগ করিলাম তাঁহার সে কৃপা এখানেও আছে, তবে আর ভয় ভাবনা কি?

আমার এক পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু—বাবু বনমালী বসু এবং তাঁহার স্ত্রী, বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্যে এখানে অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের কথা আমার স্মরণ ছিল না, ডাক্তার কাজী সাহেবও সে কথা পত্রে লেখেন নাই; যাহা হউক এখানে আসিয়া শুনিলাম, বনমালী বাবু উপস্থিত তাঁহার পাবনার বাটীতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি সকলে এখানে আছেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিলাম এবং বহুদিনের পর বন্ধুর পরিবারবর্গকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে দুই দিন বাস করিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

আগরতলা একটি উপত্যকা, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অর্থাৎ প্রায় চারিদিকেই পাহাড়, তাহার মধ্যস্থলে আগরতলা রাজধানী। কেবল পশ্চিম-দক্ষিণে আখউড়া ষ্টেশনের দিকে কিছু স্থান সমতল। আগরতলা টাউনে লোক সংখ্যা ৫।৬ হাজার। সমস্ত স্বাধীন ত্রিপুরার লোক সংখ্যা প্রায় ২৷৷০ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমান শতকরা ২০ জন। মণিপুরীদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীই আছে এবং বাঙালী হিন্দুর ন্যায় জাতিভেদ প্রথা দেখা যায়, কিন্তু বিভিন্ন পার্ব্বত্যজাতির মধ্য হইতে ত্রিপুরার রাজ বংশে ঠাকুর শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ দেব বর্ম্মণ করিয়া লওয়া হয়। তদ্ভিন্ন মণিপুরী কন্যা-গ্রহণ প্রথাও আছে; তবে সেই কন্যাগণ রাণী হইলেও পিতৃগৃহে পুনঃ গৃহীত হন না। রাজ পরিবার বা রয়েল ফ্যামিলি ভুক্ত হইয়া যান।

টাউনে একটি হায়ার ক্লাশ স্কুল, মাইনর স্কুল, পাঠশালা, বালিকাস্কুল, সংস্কৃত টোল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মহিলা চিকিৎসক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গুলি সুব্যবস্থিত, তদ্ভিন্ন রয়েল ক্যামিলির ছাত্রগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বোর্ডিং আছে তাহার নাম "ঠাকুর বোর্ডিং।" সর্ব্বাপেক্ষা একটি গৌরবের কথা এই যে, এখানে সমস্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসা অবৈতনিক অর্থাৎ সমস্তই মহারাজার ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। একটি মৌলভীর সহিত আমার আলাপ হয়; তাঁহার নিকট শুনিলাম স্থানীয় মসজিদে নমাজ এবং এস্লামধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে রাজভাণ্ডার হইতে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর মানিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুর যে নূতন প্যালেসে বাস করেন, তাহা আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এক বিস্তৃত এবং সুন্দর প্রাসাদ। উহার সম্মুখে দুইদিকে দুইটি বৃহৎ জলাশয় প্রাসাদের আরো শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। সর্ব্ব সম্মুখে তোরণ সিংহদ্বার; তাহার উপরে ব্যাণ্ড (ঐক্যতান) বাদ্য হয়। সমস্ত পথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরাতন হাবেলী অর্থাৎ পূর্ব্ব রাজবাটী কিছু দূরে অবস্থিত

মহারাণীর মহিলা-ডাক্তার মিসেস্ কাজী, মহারাণীর সহিত কলিকাতায় ছিলেন, এখানে পুত্র কন্যার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি আসিলেন, আমারও আগরতলা হইতে বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল, শেষ দিন প্রাতে অল্পের মধ্যে বন্ধুবর কাজী সাহেব সপরিবারে আমাকে হৃদয় স্পর্শী অভ্যর্থনার দ্বারা আমার আগরতলা ভ্রমণ অত্যন্ত স্মরণীয় করিয়া দিলেন। ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌঁছিলাম।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া;—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আসিয়া আমি বাবু রামকানাই দত্ত মহাশয়ের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইনি বিচক্ষণ প্রবীণ উকিল; কেবল তা নয়, ইনি সাহিত্যিক এবং ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্ত। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হইয়াও নিষ্ঠাবান ব্রহ্মোপাসক। ইঁহার যত্নে এখানে বহু দিন যাবৎ সামাজিক উপাসনা প্রতি রবিবারে চলিয়া আসিতেছে। উপাসনার জন্য পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্থান ছিল না। অল্প দিন হইল, আগরতলা মহারাজার দান ৫০০৲ টাকা আর এই স্থানের একটি বিধবা নারীর ৫০০৲ টাকায় একটি উপাসনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। বিধবা নারী নিতান্ত গরীব। তিনি কলিকাতায় থাকেন, ভদ্রমহিলাদিগের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সেই ক্ষুদ্র আয়ের সঞ্চিত অর্থে ঐ দান, ইহাকে যথার্থ সাত্ত্বিক দান বলা যায়।

তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী, আমরা তাঁহাকে বামাদিদি বলি। অবশ্য তিনি যে নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মোপাসিকা এ কথা বলাই বাহুল্য।

রামকানাই বাবু তাঁহার প্রণীত ৪ খণ্ড পুস্তক আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, যথা ১। সন্তান, ২। হাসন-হোসেন, ৩। আনন্দ গীতা, ৪। সেবক সঙ্গীত। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে এখানে তাহার সমালোচনা করিতে পারিলাম না, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, প্রত্যেক পুস্তকখানিই অতি মিষ্ট-মধুর রচনায় ভাব ও জ্ঞান পূর্ণ। পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার রচনা-শক্তি কেমন স্বাভাবিক স্রোতস্বিনী।

সন্ধ্যার সময় উপাসনালয়ে উপাসনা হইল, মন্দিরটি বেশ খোলা নির্জ্জন স্থানের মধ্যে। সোমবার থাকিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া দেখিলাম। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু শ্রীযুক্ত সলিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাড়ী, তিনি অল্প দিন তথায় গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। ২৭এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে কালিকচ্ছে রওনা হইলাম।

কালিকচ্ছ ;—বেলা ১০॥টার সময় ৯ মাইল চলিয়া কালিকচ্ছে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আশ্রমে আসিলাম।

আশ্রম! বাস্তবিকই আশ্রম। বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান সভ্যতার সঙ্গে সংসার ধর্ম্ম এবং প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন ভজন, সেবা ও ধর্ম্ম প্রচারের একত্রে প্রতিষ্ঠান স্থান এমনটি আর দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কালিকচ্ছ ত্রিপুরা জেলার পূর্ব্ব-উত্তরাংশের প্রায় শেষ সীমায় একখানি প্রাচীন গ্রাম। অনেকগুলি পল্লীতে গ্রামখানি নিতান্ত সামান্য নহে। পথ ঘাট সাধারণত পল্লীগ্রামের ন্যায়, তা ছাড়া বাঁশবাগান ও অন্যান্য জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। জলাশয়—পুষ্করিণীগুলিও তেমন উৎকৃষ্ট নয়, তবু বহু জন বসতি পূর্ণ। কিন্তু ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট কাহাকেও দেখিলাম না।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে এক মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার নাম স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র নন্দী বা "আনন্দস্বামী"। যে সময় কলিকাতা নগরীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গ এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই সময় মহাত্মা আনন্দস্বামী ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার চিত্তেও ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ধর্ম্মসমাজ বা মণ্ডলীর সহিত যোগ রক্ষা করিয়াও তিনি শেষ জীবনে একাকী

নির্জ্জনে গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইয়া "জয়দয়াময়" নামে সিদ্ধি লাভ করেন। আমি আমার ২৫ বৎসর বয়সে ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার নাম এবং তাঁহার সাধন-সিদ্ধির কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনো সচক্ষে দেখি নাই; এবার তাঁহার জন্মভূমি ও সাধন-সিদ্ধির স্থান দর্শন করিয়া অত্যন্ত উপকৃত এবং সুখী হইলাম। তাঁহার সিদ্ধিতে আমার বিশ্বাস হয়;—আমি সিদ্ধির অর্থ এইরূপ বিশ্বাস করি যে, মলিন মানুষ হইয়াও ঐকান্তিক বিশ্বাস বলে যিনি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন এবং লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত যদি সাধনে নিযুক্ত থাকেন, তবে তিনি এমন একটি অবস্থা লাভ করিতে পারেন, যেখানে গিয়া তাঁহার মানবীয় কল্পনা মানবীয় কামনা সমস্ত লুপ্ত হইতে পারে। তখন ঈশ্বর ইচ্ছা তাঁহাতে সরল ভাবে খেলিতে থাকে, সে অবস্থায় তাঁহার সঙ্কল্প, ইচ্ছা, এবং কার্য্য সমস্তই ঠিক হয়। তিনি যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা সত্য হয়। সাধকের পক্ষে ঐ অবস্থা সাধারণ না হইলেও একান্ত দুর্লভ নহে। যাহা হউক, মহাত্মা আনন্দ-স্বামী গৃহাশ্রমবাসী হইয়াও এই সাধনে-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ঐ অঞ্চলে একজন সিদ্ধ-পুরুষ মহাত্মারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ভগবৎ কৃপায় পিতার পদানুশরণে তদ্রূপ ভাবই লাভ করিয়াছেন। ইহা একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা এই যে, অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, কোন মহাপুরুষ মহাত্মার পুত্র, ঠিক পিতার ন্যায় ধর্ম্ম বা চরিত্র লাভ করিতে পারেন না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে মহেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আমি বাস্তবিকই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬০।৬১ বৎসর হইয়াছে। এক দিকে তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার কিন্তু তাঁহার সেই চিকিৎসা ব্যবসায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করাতে তাঁহার এক গুণ শক্তি এবং বিদ্যা বুদ্ধি দশ গুণ হইয়াছে। বড় বড় ইংরাজ ডাক্তার যে ক্ষেত্রে হতাশ হইয়াছেন, তেমন রোগীকেও তিনি আরোগ্য করিয়াছেন। অন্য দিকে তিনি ফকির-সেবক, তাই প্রতি দিন তিনি শত শত নরনারীকে চিকিৎসা করিতেছেন, বিনা মূল্যেও শত শত রোগীকে দেখিয়া ঔষধ দিতেছেন; তাঁহার দর্শনীর কোন নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারণ নাই, অথচ তাঁহার গৃহে প্রতি দিন ৫০।৬০।৭০ জনের অন্ন প্রস্তুত হয়। আরো আশ্চর্য্য কথা এই যে, এই অন্ন ব্যঞ্জন প্রতি দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্তই স্বহস্তে প্রস্তুত ও পরিবেশন করেন।

ইহাও দৈবশক্তির কার্য্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র বাবু কর্ণে মন্ত্র দিয়া কাহাকেও শিষ্য করেন না। এক "জয়:দয়াময়" নাম হিন্দু মুসলমান জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া সকলকে সৎপথে পরিচালিত করেন। যাহারা তাঁহাকে গুরু পদ-বাচ্যরূপে ভক্তি করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই তাঁহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ শিষ্য শিষ্যার নরনারীর সংখ্যা ও প্রদেশে কতো তা আমি ঠিক নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে যে যথেষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি আরো আশ্চর্য্য হইলাম যে, সমস্ত দিন সাধন ভজন ও সেবাতে একাকী এক জন নহে—কিন্তু পরিবারবর্গ বালক বালিকা হইতে শিষ্য শিষ্যা অতিথি অভ্যাগত, এবং আর্ত্ত অনাথ আতুর পর্য্যন্ত শতাধিক লোক, প্রত্যহ এক জমাট ভাবের মধ্যে পরিচালিত হইয়া আশ্রমকে যেন নিত্য উৎসবময় করিয়া রাখিয়াছে। সত্যই বর্ত্তমানযুগে জ্ঞান ধর্ম্মের সহিত ভাব ভক্তির সম্মিলনে, ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত কর্ত্তব্য পালন এবং সেবা ধর্ম্মের এমন হাতে কলমে সাধনভজনের স্থান এমনটি আমি আর কখনো কোথাও দেখি নাই।

মহেন্দ্র বাবু পিতার এক বৃহৎ সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে তাহার ধারণা করা কঠিন, অর্থাৎ সমাধিমন্দির বলিতে সাধারণত আমরা যাহা বুঝি, ইহা তাহা নহে। ইহা একটি বৃহৎ আলয় সদৃশ। মধ্যস্থলে সমাধি স্থান, কিন্তু ইহার চারি দিকে এত বড় প্রশস্ত আচ্ছাদিত বহির্অঙ্গণ যে, তাহার মধ্যে আড়াই শত লোক বসিতে পারে। প্রতি দিন মধ্যাহ্নে রন্ধনশালা হইতে প্রস্তুত সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন তথায় রক্ষিত হইলে, ভোগ আরতির দ্বারা ভগবান্ এবং ভক্তের নামে উৎ-সর্গ করিয়া তাহা প্রসাদরূপে সমস্ত পরিবেসিত হয়, সে এক পবিত্র দৃশ্য। বাস্তবিক সে অন্নগ্রহণে শরীর মন শুদ্ধ হয়। অবশ্য ভারতের শত সহস্র স্থানে এই দৃশ্য দেখা যায় বটে, ইহাও সেই দৃশ্যর আর একটি অন্যতম বলিলে ক্ষতি নাই, তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে, নিরাকার পরব্রহ্মের মন্দিরে এমন দৃশ্য বোধ হয় আমি আর কোথাও দেখি নাই। অনেক নিরাকারবাদী আমার সমবিশ্বাসী ভ্রাতা হয়, তো ইহাকে কুসংস্কার পৌত্তলিক ক্রিয়া বলিতে পারেন, কিন্তু যাহা দেখিয়া আমার মনে সাত্ত্বিকভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না।

প্রতি দিন প্রাতে কিছুক্ষণ এই সমাধি মন্দিরে আরতি অর্থাৎ ভক্তদল লইয়া (সর্ব্বদাই ১০।১৫।২০ জন পর্য্যন্ত ভক্ত নরনারী যাতায়াত ক্রমে নিত্য এখানে উপস্থিত থাকেন) মহেন্দ্র বাবু নিজে সস্ত্রীক সমাধি বেষ্টন পূর্ব্বক ভগবত নাম কীর্ত্তন করেন, তৎপরে তিনি নিজে রোগী দেখিতে ডাক্তারখানায় এবং বাহিরে যান, তাঁহার সহধর্ম্মিণী রন্ধনশালায় প্রবেশ করেন।

অন্তঃপুরে পুত্রবধূ ও কন্যাগণ এবং পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী অন্যান্য পরিজন বালক বালিকা সুস্থ অসুস্থ ভেদে যাহার যেরূপ আহার পথ্যের প্রয়োজন তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা হয়, তৎসহ অভ্যাগত ভদ্রলোকের উপস্থিত মতে চা হইতে জলযোগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়। তৎপরে ১২টার সময় পারিবারিক উপাসনা হয়। ইহা ৩ দিন হয় পৈতৃক দালানে— যেখানে পূর্ব্বে সাকার প্রতিমা পূজা হইত, এখন সেখানে লিখিত হইয়াছে "প্রেমরাজ্য সমাগত", আর একটি মৃন্ময়-গৃহে পরিবারিক সমাধিক্ষেত্র আছে, সেখানে ৪ দিন। তৎপরে সন্ধ্যায় আরতি এবং রাত্রি ১০টার পর নূতন সমাধি-মন্দিরে পাঠ এবং আলোচনা অন্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদত্ত হয়। এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এক গম্ভীর ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া মহেন্দ্রবাবু এমন এক আদর্শ সাধক জীবন প্রদর্শন করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমার মনে যে সকল ভাব হইয়াছিল, তাহার সমস্ত বর্ণনা করিতে গেলে এই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক কালিকচ্ছের এই সাধন ক্ষেত্র, সাধক মাত্রেরই প্রত্যক্ষ করিবার একটি বিশেষ স্থান। দুঃখের বিষয়, আমি এখানে ৩ দিন মাত্র থাকিয়াই সময়ের অল্পতা বশত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ভক্তি ভাজন মহেন্দ্র বাবু আমার সঙ্গে যেরূপ সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া আন্তরিক ভালবাসা দান করিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই ভক্ত দম্পতীর চরণে আমার আন্তরিক ভক্তি প্রণতি অবিচ্ছিন্ন ভাবেই যুক্ত থাকিবে।

মহেন্দ্র বাবুর পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠকে জাপানে পাঠাইয়া শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন, একটি ডাক্তারী পড়িয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বারা তিনি দেশালাই মেশিন প্রস্তুত করিয়া এক্ষণে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সে কাজে লাগিয়া আছেন। আর ২।১টি পুত্রও ঐ সকল বিষয় মনোনিবেশ করিতেছেন।

ফলত ধর্ম্মের সকল ভাব গুলি তিনি একমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাস বলে ফলবতী করিতেছেন। বাস্তবিক ইহা সাধক মাত্রেরই দেখিবার, বুঝিবার এবং সাধন করিবার বিষয়।

মহেন্দ্র বাবুর স্বর্গীয় পিতামহ দেওয়ান রামদুলাল নন্দী মহাশয় ত্রিপুরা রাজের দেওয়ান ছিলেন, তিনি গুরুদেবের প্রার্থনায় অম্লান বদনে বাসভবন তাঁহাকে দান করিয়া ছিলেন।

মহেন্দ্রবাবু অনুগ্রহ করিয়া সযত্নে আমার স্বর-ভঙ্গের ঔষধ দান করিয়া দীর্ঘ সময় আমাকে তাহা ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতে যাত্রা করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং কুমিল্লা হইয়া ঢাকায় আসি। তদ্বিবরণ স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না। আগামী বারে বলিতে চেষ্টা করিব।

দাসের আত্ম-কথা

—ঃঃ—

পৈতৃক অর্থলাভ;—যে স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস রক্ষার জন্য অথবা সংসারিক বাধ্য বাধকতার বশবর্ত্তী হইতে না পারিয়া খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির হইতে কলিকাতায় আসিতে হইল, এবং যে অবস্থা-চক্রে অর্থ কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু-বন্ধন জালে জড়িত হইয়া আন্তরিক বেদনা পাইতেছিলাম, বিধাতার কৃপায় সে অবস্থা এবং সে জাল ছিন্ন হইয়া গেল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম। এক্ষণে নূতন বাসার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টি পড়িল যে, এই ঘোর দারিদ্রতার কিঞ্চিৎ প্রতিবিধান না হইলে ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম মোকাম হইতে প্রায় ৬ মাসকাল নিয়মিত বাসা খরচের জন্য কিছুই পাঠাইতে পারি নাই। যদিও প্রত্যাবর্ত্তন কালে বন্ধুবর অযোধ্যা প্রসাদের সহৃদয়তায় আমাকে একেবারে রিক্ত হস্তে আসিতে হয় নাই, কিন্তু সেই সামান্য অর্থে এ অভাবের কতটুকু পুরণ হইতে পারে? তাই কৃপাময় পিতা পরমেশ্বর অগ্রেই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

আমার দুই জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। তাঁহারা আমার জন্মের কিছু পূর্ব্বে অ-পুত্রক অবস্থায় পর পর পরলোক গমন করেন। তৎপরে আমার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমার পিতামহও ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি

আমার দুই জ্যাঠাইমাতার জন্য ষ্টেট্ হইতে মাসহারা প্রদানের অনুজ্ঞা-পত্র লিখিয়া যান। তদনুসারে বড় জ্যাঠাইমাতা মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাইতেন। মধ্যম জ্যাঠাইমাতা অল্প দিনের মধ্যে পরলোক গমন করেন। কালক্রমে যখন আমার পিতার হস্ত হইতে মূল সম্পত্তি সমস্ত নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল, তখন বড়জ্যাঠাই মাতা তাঁহার মাসহারা পাইবার উপযোগী সম্পত্তি ডিপজিট্ রাখিবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। তদনুসারে পিতা পাঁচ হাজার টাকার (তাৎকালিন ৪৲ টাকা সুদের) কোম্পানীর কাগজ আমানৎ রাখেন। তাহারে সুদ জ্যাঠাইমাতা পাইয়া আসিতেছিলেন।

আমার প্রথম বৎসর অরেয়া মোকামে অবস্থিতিকালে বড় জ্যাঠাইমাতার মৃত্যু হয়। ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ তৎসংবাদ সহ আমাকে শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে পত্র লেখেন। আমি যথা সময়ে কলিকাতায় আসিলে উপেন্দ্রনাথ ঐ অর্থের বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি অন্যায় প্রস্তাব করায় (তখন ভ্রাতার মনের অবস্থা ভাল ছিল না) কোন কাজ হইল না। আমি দ্বিতীয়বার মোকামে চলিয়া গেলাম।

এক্ষণে সেই অর্থ পাইবার জন্য আমারও যেমন প্রয়োজন এবং ঠিক সময় হইল, তদ্রূপ ভ্রাতার মনেও কিছু স্বার্থত্যাগের ভাব এবং অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হইয়া সহজেই সকল মীমাংসা হইয়া গেল। যথা সময়ে যথা নিয়মে আমরা দুই ভ্রাতা ও তৃতীয় ভ্রাতৃবধু, একমাত্র নাবালক পুত্র শ্রীমান জীবন কৃষ্ণের গার্জ্জেন হইয়া, এবং ৪র্থ বিধবা ভ্রাতৃবধু সহ সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া চারি অংশে বিভাগ অনুসারে কিঞ্চিদাধিক বারোশত টাকা আমি প্রাপ্ত হইলাম, এবং হাটখোলার স্বর্গীয় মহানন্দ দত্তের নামীয় ঘৃতের আড়তে বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ দত্তের মারফতে একহাজার টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকায় উপস্থিত ঋণ পরিশোধ করিলাম। দাসের জীবনে উপর্য্যুপরি বিধাতার এই সকল কৃপার কথা বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞভরে মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে। ধন্য মা, অধম সন্তানের প্রতি তোমার এত কৃপা! তাই বুঝি ভক্ত গাইলেন,—"তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনা গো আর, প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,—লইনু স্মরণ মা গো, তব শ্রীচরণে গো মা।"

বিবিধ

—::—

ডাক্তার নন্দী ও ক্লোরেড অব পটাস।—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিতেছেনঃ—ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দ্বারা Chlorade of Patash তৈয়ার করাইবার চেষ্টা হইতেছে! ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার S. D. O. নবগৌরাঙ্গ বাবুর উৎসাহে ও Home industryর অর্থানুকূল্যে ডাক্তার নন্দী এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং Water Hycinth ও কলাগাছ হইতে তিনি যে ক্লোরেড অফ পটাস তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। যদি পরীক্ষায় তাহা ভাল হয় তবে ক্লোরেড অফ পটাস তৈয়ার করিবার জন্য আপাততঃ হোম-ইন্‌ডাষ্ট্রী ফণ্ড হইতে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। মহেন্দ্রবাবু যে দিয়াশলায়ের কল আবিষ্কার করিয়াছেন,তাহা সরকার বাহাদুর হইতে ক্রয় করিবার কথা শুনিয়াছিলাম। মাননীয় মিঃ বেল ও মিঃ মোনাহান মহেন্দ্রবাবুর কল দেখিয়া গিয়াছিলেন, ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড কারমাইকেল রংপুরে মহেন্দ্র বাবুর দিয়াশলাইয়ের কল দেখিয়া খুব উৎসাহ দিয়াছিলেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কল ক্রয় করিয়া মহেন্দ্র বাবুকে প্রকৃত উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। এই সকলের পর এই ক্লোরেড অফ পটাস তৈয়ারী করিয়া পরীক্ষা বিভ্রাটের দরুণ প্রকৃত উৎসাহ না পান আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে। মহেন্দ্র বাবু স্বীয় কল্পনা ও মস্তিষ্কপ্রসূত যে সকল কল তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দিয়াশলাইয়ের কল, কাপড় বুনিবার কল, বোতাম তৈয়ারের কল, উন্নত প্রণালীর চরকা, লোহার ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দান না করিলে এই গুলির উন্নতি অসম্ভব। এই দারুণ দুর্দ্দিনে মহেন্দ্র বাবুর কলগুলিকে সরকার বাহাদুর অর্থানুকূল্যে পুষ্ট করিলে দেশের ও দশের মহা উপকার হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই বিষয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—বাঙ্গালী।

ভক্তের পরলোক যাত্রা।—নামানুরাগী সাধক কৈলাসচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারীর মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত আজুদিয়া গ্রামে তাঁহার নিবাস। তিনি আত্ম চেষ্টায় স্বগ্রামে মহর্ষির নামে একটি মধ্য ইংরাজী

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি, এমন কি নিজের বাড়ী, ঘটী বাটী থালা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ে দান করিয়াছিলেন। দিবা রাত্রি তিনি অবিরাম নাম জপ করিতেন। মৃত্যুর দিনেও তিনি দ্বিপ্রহরে এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন এবং রাত্রি ১০টার সময় নিয়মিত আহার করিয়াছিলেন। রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার তনুত্যাগ হয়!

সহজে কালী প্রস্তুত,--কালী অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। সাধারণ-লোকে বিশেষ পল্লীগ্রামে জার্ম্মাণীর রং কিনিয়া লাল ও ভাওলেট রং করিয়া লিখিত। আর একটা উপায় বলিয়া দিতেছি, ইহা দ্বারা বহুলোকের কালীর সুবিধা হইবে। আফিস অঞ্চলে টাইপ রাইটীং কলের ফিতা ১০।২০ দিন অন্তর বদলাইতে হয়। এই পরিত্যক্ত রিবন বা ফিতা হইতে উৎকৃষ্ট ভাওলেট্ কালী হয়, আমরা সেই ফিতার দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া লিখিতেছি। এগুলি আমাদের টাইপ রাইটীং কলের ফিতা,নূতন দিলেই ফেলিয়া দিতাম। এখন ইহা দ্বারা মহৎ উপকার পাইতেছি। কিন্তু যে সে ফিতায় হয় না। যে ফিতাতে কাপিং ভাওলেট্ রং মাখানো থাকে সেই ফিতার ২।৪ অঙ্গুলি লইয়া একটু গরমজলে ফেলিলেই সুন্দর বেগ্‌নী রঙের কালী হইবে! সকলেই এই উপায়ে কালী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ১ টি পুরা ফিতায় প্রায় ২ বৎসর একটা লোকের চলিবে। ছেলে মেয়েরা এই কালী খুব পছন্দ করে। আমরা অনেক পল্লী-পোষ্টমাষ্টারকে এই ফিতা একটু একটু দিয়াছিলাম, তাঁহারা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (কাজের লোক)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

—ঃঃ—

গতবারে ভ্রমক্রমে স্থানীয় বিষয়ের মধ্যে পূজার সংবাদে লিখিত হইয়াছিল, "মাটীকোমরায় মুখোপাধ্যায় বাটীতে পূজা হইয়াছিল, তবে ঘটক মহাশয়কে এবার তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই।" আমরা পরে শুনিলাম, তিনি বাটী আসিয়াছিলেন। প্রথম কথা লেখার জন্য আমরা ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২২এ অগ্রহায়ণ, শনিবার গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডু পরলোক গমন করিয়াছেন! ইনি কুশদহবাসী কুণ্ডুবংশের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান্ সৎক্রিয়াশীল, বহুজন বিশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন। আমরা বাল্যকালে ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে কেবল"ঠাকুর পূজা" সংক্রান্ত খেলা ধূলার দিকেই তাঁহার রুচি দেখিয়াছিলাম। এই স্বভাব তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়াই মনে হয়। তাই বাল্যের ক্রীড়া পরিণত বয়সে জীবন ব্যাপী হইয়াছিল, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তিনি সে ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন! অনেকে জানেন, বৈষয়িক জীবনে শেষাবস্থায় তাঁহাকে অনেক ক্ষতি এবং মর্মবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি একমাস পূর্ব্বে অন্তিম শয্যায় পড়িয়াও (কার্ত্তিক মাসে) দুর্গোৎসব বন্ধ হইতে দেন নাই। বর্ত্তমান যুগে সমস্ত বিষয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম বিশ্বাসেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সূত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আদৌ ধর্ম্ম নিষ্ঠার কিরূপ অভাব হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। বিনোদ বাবুর বিশ্বাসের বাহ্য আকার যাহাই হউক না কেন, আমরা তাঁহার মূল ধর্ম্ম নিষ্ঠার পক্ষপাতী না হইয়া কখনই থাকিতে পারিনা।—শ্রীমান্ বিনোদ, এখন তুমি কোথায়? তুমি কি তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার পাও নাই? তুমি কি চিন্ময়ী মা দুর্গার দর্শন এখন পাইতেছনা? তবে থাকো মার কোলে চিরদিন থাকো, আর সেখান হইতে তোমার দেশ, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতি তোমার প্রীতি এবং আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করো।

পুরাতন বাগানের জঙ্গল, এবং বৃক্ষ ছেদনের এই প্রকৃষ্ট সময় আসিতেছে। যাঁহারা এজন্য ইচ্ছুক আছেন তাঁহারা প্রস্তুত হউন যাহাতে বর্ষার পূর্ব্বে কাজ শেষ করিতে পারেন। পুরাতন বাগানের ফলহীন বৃক্ষ ছেদন করাতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে কতদূর সহায়তা করিবে তাহা কি আরো সকলকে বুঝাইতে হইবে?

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } পৌষ, মাঘ, ১৩২৪ { নবম ও দশম সংখ্যা

সঙ্গীত

সংসারে বিশ্বাসী ধন্য! যাই তাহারে বলিহারি।
ভব-সাগর তরঙ্গে পেয়েছে অটলতরী।
পড়িলে ভয়-বিপাকে, দয়ালহরি ব'লে ডাকে,
হরি-মুখ চেয়ে থাকে, দুটি হস্ত জোড় করি।
নাহি তার অন্য বাসনা, কারো পানে সে চাহে না,
কেবলই করে প্রার্থনা, দয়ালহরির চরণ ধরি।
সে তাঁহার তার শ্রীহরি, দু'জনে একত্র হেরি,
এই-তো রূপ নরহরি, কিবা শোভা মরি মরি!
সেই বিশ্বাসের কণা, পেলে যায় ভয় ভাবনা,
ভবের ধূলা গায় লাগে না, জীবনে বিরাজেন হরি।

(বিধান-সঙ্গীত ২য় ভাগ)

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২২এ অগ্রহায়ণ, শনিবার গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডু পরলোক গমন করিয়াছেন! ইনি কুশদহবাসী কুণ্ডুবংশের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান্ সৎক্রিয়াশীল, বহুজন বিশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন। আমরা বাল্যকালে ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে কেবল "ঠাকুর পূজা" সংক্রান্ত খেলা ধূলার দিকেই তাঁহার রুচি দেখিয়াছিলাম। এই স্বভাব তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়াই মনে হয়। তাই বাল্যের ক্রীড়া পরিণত বয়সে জীবন ব্যাপী হইয়াছিল, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তিনি সে ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন! অনেকে জানেন, বৈষয়িক জীবনে শেষাবস্থায় তাঁহাকে অনেক ক্ষতি এবং মনোবেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি একমাস পূর্ব্বে অন্তিম শয্যায় পড়িয়াও (কার্ত্তিক মাসে) দুর্গোৎসব বন্ধ হইতে দেন নাই। বর্ত্তমান যুগে সমস্ত বিষয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম বিশ্বাসেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সূত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আদৌ ধর্ম্ম নিষ্ঠার কিরূপ অভাব হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। বিনোদ বাবুর বিশ্বাসের বাহ্য আকার যাহাই হউক না কেন, আমরা তাঁহার মূল ধর্ম্ম নিষ্ঠার পক্ষপাতী না হইয়া কখনই থাকিতে পারিনা।—শ্রীমান্ বিনোদ, এখন তুমি কোথায়? তুমি কি তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার পাও নাই? তুমি কি চিন্ময়ী মা দুর্গার দর্শন এখন পাইতেছনা? তবে থাকো মার কোলে চিরদিন থাকো, আর সেখান হইতে তোমার দেশ, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতি তোমার প্রীতি এবং আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করো।

পুরাতন বাগানের জঙ্গল, এবং বৃক্ষ ছেদনের এই প্রকৃষ্ট সময় আসিতেছে। যাঁহারা এজন্য ইচ্ছুক আছেন তাঁহারা প্রস্তুত হউন যাহাতে বর্ষার পূর্ব্বে কাজ শেষ করিতে পারেন। পুরাতন বাগানের ফলহীন বৃক্ষ ছেদন করাতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে কতদূর সহায়তা করিবে তাহা কি আরো সকলকে বুঝাইতে হইবে?

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ } পৌষ, মাঘ, ১৩২৪ { নবম ও দশম সংখ্যা

সঙ্গীত

সংসারে বিশ্বাসী ধন্য! যাই তাহারে বলিহারি।
ভব-সাগর তরঙ্গে পেয়েছে অটলতরী।
পড়িলে ভয়-বিপাকে, দয়ালহরি ব'লে ডাকে,
হরি-মুখ চেয়ে থাকে, দুটি হস্ত জোড় করি।
নাহি তার অন্য বাসনা, কারো পানে সে চাহে না,
কেবলই করে প্রার্থনা, দয়ালহরির চরণ ধরি।
সে তাঁহার তার শ্রীহরি, দু'জনে একত্র হেরি,
এই-তো রূপ নরহরি, কিবা শোভা মরি মরি!
সেই বিশ্বাসের কণা, পেলে যায় ভয় ভাবনা,
ভবের ধূলা গায় লাগে না, জীবনে বিরাজেন হরি।

(বিধান-সঙ্গীত ২য় ভাগ)

যমুনা সংস্কার সম্বন্ধে ব্যবস্থা

এবার আর মানুষের চেষ্টার ফলে নয়, বিধাতারবিধান রূপে যমুনা সংস্কার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইয়াছে। এইসংবাদ যিনি শুনিতেছেন,তাঁহারই প্রাণে আনন্দের সমাচার বহন করিতেছে। বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডেসের মনে ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি আজ এমন করিয়া বলিলেন "আমার কার্য্যকালের মধ্যে আমি ম্যালেরিয়া ধংশের উপায় করিব।" তাই তিনি এই কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রথমে নদীসংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া, আপাতত ২৪ পরগণা নদীয়া এবং যশোহর এই ৩টি জেলায় কার্য্য হইবে স্থির করিয়াছেন। যমুনাসংস্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল তদন্ত হইয়াছিল তৎপ্রতি তিনি দৃষ্টি করিয়াছেন, এইখানে বলা যায়, দেশবাসী যাঁহারা পূর্ব্বে এই কার্য্যে পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের সেই শুভচেষ্টা ফলবতী হইতে চলিয়াছে। বিধাতার রাজ্যে একবিন্দু সদ্ভাব ব্যর্থ হয় না, তাহা আমরা আপাতত চক্ষে দেখিতে পাই আর না পাই।

উক্ত তিন জেলা বোর্ডের মেম্বার এবং কতিপয় জমিদার ও স্বাস্থ্য বিভাগের মেম্বরদিগকে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার কাউন্সিল ভবনে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিকার না হইলে দেশ রক্ষার উপায় নাই, দেশের পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ায় শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে। মশকই ম্যালেরিয়া বিষের বাহক তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। ডোবা এবং স্রোতহীন নদীর উপর মশক ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং আবদ্ধ জল নিকাশের পথ পরিষ্কার এবং স্রোতহীন নদীকে খর স্রোতা করিতে পারিলেই মশক বংশ ধংশ করা যাইবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সফলতা লাভ করা অসম্ভব হইবে না।

তার পর অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, এ কাজে গভর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন কিন্তু অধিকাংশ ব্যয়ের জন্য জেলাবোর্ড আপাতত ঋণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, কিন্তু গ্রাম যদি ফলশালী হয় তবে ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হইবে না। ড্রেনেজ এ্যাক্ট অনুসারে প্রজার নিকট কর আদায় হইয়া ঋণ শোধ হইবেই।

এই ঋণ করা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতেছেন, জেলাবোর্ডকে ঋণভারে ভারাক্রান্ত করা কি সম্ভব হইবে? সেই ঋণ স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট দান করিলেই তো ভাল হয়। এ বিষয় আমাদের মনে হয়, স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর যখন এই কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন যে উপায়ে সম্ভব এবং সঙ্গত হয় তিনি তাহা করিবেনই। বিশেষত তিনি যে বলিয়াছেন, যে স্থানের উপকারের জন্য যে কাজ হইবে, তাহার ব্যয় সেই স্থানের লোকেরই বহণ করা উচিত, সমগ্র প্রদেশের লোকের অর্থ হইতে তাহা ব্যয় হওয়া উচিত নয়। একথার উপর আমাদের মতামত প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। ফল কথা, যাহাতে কাজ হয় তিনি তাহাই করুন। দেশবাসী আমরাও তাঁহার শুভ ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া সর্ব্বোতোভাবে সে কাজে সহায়তা করি।

কুশদহের ইতিহাস

—o—

গোপ—মনুর মতে আভীর বা আহির জাতি, ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে জাত। সুতরাং খাঁটী ব্রাহ্মণরক্ত আভীরের ধমনীতে প্রবাহিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে গোপ ও নাপিত, তাম্বুলী ও স্বর্ণকার বারুই মোদক, ও বণিক সৎশূদ্র মধ্যে গণ্য। সেই জন্য বোধ হয় পূর্ব্বে গোপ এবং নাপিতের হাতে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেন। যে সময় সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয় সেই সময় এই সকল জাতির সহিতও ভোজ্যান্নতা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্যবংশ সম্ভূত জাতিগুলিকে অনার্য্য সংস্রবে আনিতে পারিলে বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত ল্যাসেন আভীরদিগকে অনার্য্য বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষি গোপালন ও বানিজ্য বৈশ্যগণের বৃত্তি। আহিরগণ আবাহমানকাল তাহাই করিয়া আসিতেছে। তাহারা যে বৈশ্যবৃত্তি করে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহারা সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইল কেন এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, কৃষিকার্য্যের জন্য পুং গোবৎসের পুংত্ব নষ্ট করায় তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও সচরাচর সকলে একাজ করে না তথাপি পূর্ব্ব পুরুষগণের কৃতকার্য্যের ফল সকলেই ভোগ করিতেছে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গোপগণের মধ্যে নন্দবংশীয়, যদুবংশীয়, সূর্য্যবংশীয়, গোয়ালবংশীয়, দেশীয় আহির ও কঠ সম্প্রদায় আছে। ইহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা মথুরাবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে তাহারা সকল স্থানেই নিজেদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের সহিত আদান প্রদান করে না। এখনও মথুরা-মণ্ডল দেখিবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের গোপগণ আপনাদিগকে পল্লবগোপ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পল্লব বা পহ্লব প্রাচীন আর্য্যজাতির একটি শাখা। ঘোষ বৃদ্ধগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা নানা প্রকারের প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভাবমোচন জন্য কামধেনুর সৃষ্টি করেন। তৎপরে কামধেনুর পালন জন্য নিজের অঙ্গ-মলা হইতে কালুঘোষ ও ঘর্ম্ম হইতে আমঘোষ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সৃষ্টি করিলেন এবং কামধেনুর পালনকার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা কামধেনু লইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবার সময় শৃগাল তাহাদের সঙ্গে কামধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া অবতীর্ণ হইল। অনন্তর মাঠের মধ্যে কাশকুসুম বা কেশের ফুল দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজোপকরণ মনে করিয়া খাইতে উদ্যত হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা দয়া করিয়া তাহার আহারার্থ জীব জন্তুর মৃতদেহ প্রদান করিলেন। এই কালুঘোষের সন্তান হইতে কৃষিজীবী গোয়ালার উৎপত্তি। আমঘোষের সন্তানেরা পশুপালক। কিন্তু এখনকার প্রায় সকল গোয়ালকেই কৃষিকার্য্য করিতে দেখা যায়। কৃষিজীবী গোয়াল এখন সংগোপ নামে পরিচিত। আমঘোষের সন্তানেরা এখন সদ্গোপ হইতে অপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু যাঁহারা উভয়ের সামাজিক অবস্থা জানেন তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে বলিবেন যে, বাংলাদেশে সামাজিক মর্য্যাদায় সদ্গোপ কত উন্নত হইয়াছে।

পল্লবগোপগণের মধ্যে বাগড়ী বা উজানীয়া এবং গৌড় ও রাঢ়ী সম্প্রদায় আছে। রাঢ়ী বা ডোগা শ্রেণীর লোকেরা গাভীর পৃষ্ঠে উত্তপ্ত লোহ খুন্তী দ্বারা দাগ দিয়া থাকে ও পুংবৎসের পুংত্ব নষ্ট করে, এজন্য সমাজে তাহারা হেয়। কিন্তু ধর্ম্মানুরোধে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদির সময় ষাঁড় দাগিয়া দিলে কাহারও দোষ স্পর্শে না।

গৌড় গোয়ালারা লাঠিয়ালের জন্য প্রসিদ্ধ। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নীল-

কুঠীর সাহেবেরা এই গৌড় গোয়ালা ও বাউরি লাঠীয়ালের সাহায্যে গ্রাম শাসন করিতে সমর্থ হইতেন। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই গৌড় শ্রেণীর গোয়ালারা* উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের রথ টানার কার্য্য করিতে যাইয়া তথায় বাস করিয়াছে। তাহারা উড়িয়া গোয়ালা হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এমন কি মথুরাবাসী গোপ হইতে আপনাদিগের যে মর্য্যাদা অধিক তাহাও বলিয়া থাকে।

গোপগণের সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ উচ্চশ্রেণীর ন্যায়। তাহাতে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। তাহাদের মধ্যে কাশ্যপ, আলম্যান, মৌদ্গাল্য, শাবিন্য প্রভৃতি গোত্র আছে।

গোপগণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব। তবে শাক্ত সংখ্যাও কম নহে। অনেকে জন্মাষ্টমীর দিন উৎসব করিয়া থাকে। এই জাতির অতিথির প্রতি ভক্তি যথেষ্ট। লক্ষীর কৃপাও তাহাদের উপর কম নহে। প্রায় কেহই নিরন্ন নহে। সকলেই শান্তিপ্রিয়। আজকাল এই শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চাও হইতেছে। কুশদহে হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে গোপ শ্রেণীই জন সংখ্যা হিসাবে অগ্রে গণনীয়। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক বলেন গোয়ালার আসন নবশাখ ও কৈবর্ত্তের নিম্নে, কিন্তু তাঁহারা অবগত নহেন যে,নবশাখের নাম উল্লেখকালে পুরাণকার অগ্রেই গোপের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেহারেও গোপগণ কুর্মি'র সহিত সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন।

উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের গোপজাতির মধ্যে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। উড়িষ্যার গৌড়ীয় ও মথুরাবাসী গোপ ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর গোপগণের গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ নাগবংশীয়, কেহ কচ্ছপবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। যাহারা নাগবংশীয়, তাহারা আপনাদিগকে মহানাগের সন্তান বলিয়া থাকে এবং গোক্ষুরা সর্পকে কুলাধিদেবতা মনে করে। তাহারা কখনও সর্প হিংসা করিবে না। কচ্ছপবংশীয় গোপগণও কচ্ছপ হিংসা করে না। তাহারা স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করে না। ছোটনাগপুর অঞ্চলেও ঐরূপ পশু পক্ষীকে কুলাধিদেবতা রূপে গোপেরা পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নিজকুলে বিবাহ করে না। বাংলার ন্যায় সেখানে কন্যাপণ দিয়া গোপেরা বিবাহ করে। তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাকে মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর বিবাহ করিতে হয়। মথুরাবাসী ও গৌড় গোয়ালা ভিন্ন উড়িষ্যার অন্যান্য গোয়ালাদের মধ্যে

বিধবাবিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিধবা বিবাহে ব্রাহ্মণ পুরোহিত উপস্থিত থাকে না। স্ত্রীলোকের দ্বারা সাগাই প্রথানুসারে ইহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

উড়িয়া গোয়ালার জাতকর্ম্মেরও বিশেষত্ব আছে। প্রসববেদনার সময় হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রসূতিকে এমন স্থানে রাখা হয় যেখানে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে আগুণ জ্বালিয়া সে ঘর সর্ব্বদা গরম রাখা হয়। জাত বালকের নাড়ী ছেদের পর তাহাকে গরম জলে স্নান করান হয়, ঐ গরম জলে ধুতুরা আকন্দ প্রভৃতি পাঁচটি গাছ ঐ জলে সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। পাঁচদিনে আটকৌড়ীর ন্যায় মোদক ভক্ষণ, ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা ও একুশ দিনে অশৌচান্ত হয়। ঐ দিনে মাতা পিতা উভয়েরই অশৌচ যায়।

কুশদহের নানা স্থানে—এমন কি বাংলা আসাম দেশের অনেক স্থানে গো, গোপ ও গোয়ালা শব্দ যুক্ত অনেক গ্রাম ও জনপদের নাম দেখা যায়। যথা গোয়ালপাথান গোপালপুর, গোকর্ণ, গোপনা, ঘোষপুর, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি, সম্ভবতঃ যদুবংশীয় গোপেরা এক সময়ে বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। খৃষ্টাব্দের প্রায় সহস্রবৎসর পূর্ব্বে যে যৌধের জাতি বাংলাদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তদ্বারা বোধ হয় এই যদুবংশীয় গোপজাতি। আভীর ও যৌধের জাতি উভয়কে একই জাতি মনে করিবার কারণ আছে। অশোকের শিলালিপিতে বাংলার যৌধের জাতির উল্লেখ আছে ইহা হইতে অনুমিত হয় অশোকের পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে যৌধের আভীরগণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা বাংলায় সর্ব্ব প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশিক। তৎপরে গঙ্গারাঢ় বা গাঁড়ার আসিয়াছিল। ইহাদের পরে ভোজ গৌড় নামধারী গোপজাতি। ভোজ গৌড়েরা এখন কেবল গাড়ো নামে পরিচিত। তাহারা একই সময়ে বঙ্গ কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিল। এই জাতি পরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। আইনই আকবরী গ্রন্থে ভোজবংশীয় কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। যদিও যৌধের ভোজনাম অশোকের শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনে হয় অশোকের পূর্ব্ব হইতে গঙ্গারাঢ়গণই বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিল। গ্রীকলেখকগণ গঙ্গারাঢ়দিগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক যৌধের ও ভোজগৌড়গণকে গোপ জাতীয় বলিয়া অনেক পুরাতত্ত্বজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন। যদিও ভোজ গৌড় বা ভোজ গাড়োল অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে গালাগালি ছিল, তবে সে গালি কেবল সরলতা ব্যঞ্জক।

কুটিলতার গন্ধহীন। সুতরাং সেটা গালি না হইয়া বরং গৌরবসূচক মনে করা উচিত।

যৌধের জাতীয় গোপগণ প্রথমে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভোজগৌড়েরা সৌরমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বোধ হয় তাহাদের জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে আগমন করেন। ভোজগৌড় বংশের যে ৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায় তদ্বারা অনুমান হয়, তাঁহারা প্রায় তিন শত বৎসর স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (বি-এ)

খুকীর কীর্ত্তি

বড়বাবুর প্রিয়তমা ভার্য্যা সুশীলা, তামাকু সেবনে নিবিষ্টচিত্ত স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওগো শুনেছ, মালবাবুর খুকী হয়েছে। প্রসন্নবাবু দুই তিন বার হুঁকায় টান দিয়া, কহিলেন, সে তো জানা কথা, বসন্তর মেয়ে ছাড়া ছেলে হবে না, এ পক্ষের গিন্নীটি দুবছর অন্তর একটিকরে মেয়েরই আমদানি করতে থাকুন, বসন্তর ঘাড়ে আর লক্ষ্মী বাসা বাঁধছে না।

সুশীলা কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিল, কথার ছিরি শোন, যেন গুণে বোসে আছেন? আমারো তো উপরি উপরি দুই মেয়ে হয়েছে, তাহলে কোনো কালে যেন ছেলে হবে না? এসব কি মানুষের হাতে গো?

প্রসন্নবাবু কহিলেন, তা বটে, তবে বসন্তই বলে কি না যে, এ-বৌটা বড় অপয়া—মেয়ে ছাড়া ছেলে হবে না।

সুশীলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কহিল, আচ্ছা একটা কথা সত্যি কোরে বলো দেখি, সুকুকে আর বড় খুকীকে তুমি প্রাণের সঙ্গে ভালোবাস কি না?

প্রসন্নবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাই আবার জিজ্ঞেস কো'রছ? সুকুকে আর বড় খুকীকে ভালোবাসি কি না, সে কৈফিয়ৎ আজ তোমায় দিতে হবে? হা, হা, হা, কোথায় যাই গো, আচ্ছা পাগল তুমি, নিজের সন্তানকে পশুরাও যে ভালোবাসে। বড় খুকী গেল কোথা, পাগলীটাও যখন-তখন গলা জড়িয়ে ধোরে জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি কাকে ভালোবাস? আমাকে, না মাকে, না সুকুকে?

সুশীলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, হাসি তামাসা কোরো না, সত্যি বলছি, মালবাবুর ছোট বৌটার দুঃক্ষ দেখলে চোখ ফেটে জল আসে, এমন নিষ্ঠুর স্বামীও হয় গা। দুই মেয়ে হবার পর এবারে নাকি বোলে ছিল, যদি মেয়ে হয়, তা হো'লে আর স্ত্রীর মুখ দেখব না। ছুঁড়ীতো ভয়ে কাঠ হয়েই ছিল; তা তার পোড়া কপালে মেয়েই হয়েছে. বৌটার যে কান্না, মেয়েটাকে এক পাশে ফেলে রেখেছে; ভালো করে মাই দ্যায় না, আমি কত বোঝালুম; আহা, বৌটারও বাপ নেই, মা গরীব, শাশুড়ী-মা সবাই গঞ্জনা দিচ্ছে।

বড়বাবু কহিলেন, ছি ছি, বড় অন্যায়, বসন্তটা এত অপদার্থ! কিন্তু মেয়ে দুটিকে বেশ আদর-যত্ন করে, ষ্টেশনে দেখতে পাই. বৌকে তবে অমন করে কেন?

সুশীলা ম্লানমুখে কহিল, না বাবু দেখে শুনে আমারও ভয় হোচ্ছে, আমারও যদি এবারে মেয়ে হয়, তুমিও না আবার অমনি করে বসো, তা হলে আমি সেই দিনই বিষ খাব।

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, ক্ষেপ্‌লে না কি? তোমার যদি এখন সাতটি মেয়েও হয়, আর তা ভগবানের দান বোলে মাথা পেতে না নেই, তবে অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ হোতে হবে। মেয়েগুলো বাপ মাকে বড় স্নেহ করে, হ্যাঁ-গা বড় খুকী কই? একটু নজর রাখ না? একলা পদ্মার ধারে না যায়, যে জল বেড়েছে!

সুশীলা কহিল, মালবাবুর খুকী দেখতে গেছে, এসে রাজ্যির গল্প করবে শুনো। বৌটার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়, পেট ভোরে খেতে পর্য্যন্ত পায় না।

বড়বাবু কহিলেন, বসন্তর মারই বা আক্কেল কি? স্ত্রীলোকের প্রাণও এত কঠিন? তুমি একটু খোঁজ-খবর রেখো।

এমন সময় অলকগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে মলের ঝুনু ঝুনু ধ্বনিতে হাস্যমুখী খুকী চঞ্চলচরণে আসিয়া কহিল, "বাবা তুমি ডিউটী থেকে কখন এলে? তোমার খাওয়া হোয়ে গেছে? আমাকে ভাগ দিলে না?"

পিতা মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দুই হাতে পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া খুকী কহিল, বাবা মেনীর একটি ছোট্ট বোন হয়েছে, ছোট্ট হাত ছোট্ট পা, লাল টুক-টুকে, তাই দেখতে গেছলুম; কেবল কাঁদছে, বেরাল-ছানার মতন অ্যাঁ অ্যাঁ কোরে।

বাহির হইতে ভৃত্য দেওকীলাল ডাকিল, মা-জী, ছোটা খোকী শুত গিয়া। সুশীলা সন্তর্পণে ভৃত্যের ক্রোড় হইতে এক বৎসরের খুকীকে লইয়া দোলায় শোয়াইয়া বড় খুকীকে কহিল, গোলমাল করিস্ না, একটু আস্তে কথা বল্, খুকু যেন ওঠে না, আমি খেতে যাচ্ছি।

২

"কার হাতে দিয়ে এলি রে? কি বল্লি?"

"বুড়া মাইজি কা হাত মে দিয়া, আউর বোলা, বহু মা কো লিয়ে মাইজী ভেজ দিয়া। বুড়া মাইজী তো উসি বখত সব লেড়কা লোগোকো বাঁটনে লাগা"।

"দুর হতভাগা, তোকে যে বলেছিলুম, সেজো বৌমার দুয়ারে নামিয়ে দিবি, তা হলে বুড়ো মাইজী আর ছুঁতোও না।"

প্রসন্নবাবু কহিলেন, ওদের কি অত বুদ্ধি আছে? যা দিতে হয় নিজে গিয়ে দিয়ে এসো।

"আহা, কাঁচা পোয়াতী, তেষ্টায় প্রাণ যায়, সকালে এক গেলাস চাও পায় না, বেলা ১০টার সময় পিত্তি চুঁইয়ে এত কটা চিড়ে ভাজা খেয়ে বেলা বারোটায় ঘর-শুষ্ঠী লোকের খাওয়া হোলে তবে সেই কড় কড়ে ভাত আর হাবজা গোবজা তরকারী তাই খেতে স্থায়, যেদিন খাবার সময় আমি গিয়ে পড়ি সেদিন একটু ভালোকরে খেতে স্থায়। তরকারী নিয়ে আমি যাব এখনই।"

সুশীলা তাড়াতাড়ি গৃহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মাছের ঝোল ও একটি বাটিতে শুজির পায়স লইয়া মালবাবুর বাড়ি বেড়াইতে গেল।

"কি গো বড় গিন্নী, কি হোচ্ছে সব?"

সুশীলার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেনীর জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি ভাড়ার ঘড় হইতে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, দিদি যে, এসো ভাই এসো, মা বড়ঘরে বোসে সুপুরি কাট্‌ছেন। তুমি চল দিদি আমি ছোটবৌকে একটা পাণ দিয়েই যাচ্ছি।

"ছোটবৌ কি এখন ভাত খেলে না কি? কাঁচা পোয়াতী এত বেলায় ভাত খেলে পিত্তি পোড়ে কচি ছেলের অসুখ করবে যে।"

"আর দিদি, মেয়েগুলোর আবার অ:খ, ওরা অখণ্ড পরমাই নিয়ে এসেছে!"

"ছিঃ দিদি, ও কথা বলতে নেই, ভগবান্ যা দিয়েছেন্, তাই ভালো।

আমরাও তো সেই মেয়ে হয়েই জন্মেছি। বেঁচে বর্তে থাক, একদিন পরের ঘরের লক্ষ্মী হোতে যাবে"।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বড়গিন্নী কহিলেন, বাপকে লক্ষ্মীছাড়া করে যাবে তো ?

সুশীলা সেকথার উত্তর না দিয়া সূতিকাগৃহের দরজার কাছে আসিয়া ডাকিলেন, ছোট বৌ, দরজা খোলো,মেয়ে দেখতে এসেছি। বৌ দরজা খুলিয়া দিল। সুশীলা কহিল, বাটি আনত বোন, এই ঝোলটুকু এনেছি বিকেল বেলা খেয়ো।

বাটিতে সেগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত ধুইয়া সুশীলা দরজার সামনে বসিয়া পড়িল। মেনীর জ্যাঠাই মা কহিল, এখানে কেন বোসলে দিদি, আতুড়ের গন্ধে তিষ্ঠুতে পারবে ?

সুশীলা কহিল, তুমি যাও দিদি আমি আসছি এখুনি।

জ্যাঠাইমা চলিয়া গেলেন। মনটা প্রসন্ন হইল না।

সুশীলা কহিল, গোটাকতক জোয়ান-দেওয়া পাণ বেশী করে নিয়ে রেখো, মুখে পাণ থাকলে তেষ্টা কম পাবে।

বৌটি মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতে বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। ভাবটা বেশ বোঝা গেল, একটা পাণ জোটে না, তাই আবার গোটা কতক। আব্দার মন্দ নয়।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, ঝি কই ? খেতে গেছে বুঝি ?

বৌ কহিল, না, কাল, পাঁচুটে হয়ে গেছে বলে' তাকে জবাব দেওয়া হয়েছে।

সুশীলা সবিস্ময়ে কহিল, সে কি ? তবে তোমার আতুড় ঘরের কাজ কর্ম্ম—কচি ছেলের কাঁথা-কাপড় কাচা এ সব করছে কে ?

বৌ হেটমুখে কহিল, আমায় জল ঢেলে দ্যায় আমিই করি, একমাস লোক রাখতে অনেক খরচ পড়বে বলে মা রাখলেন না, যদি ছেলে হোতো তা হলে রাখতেন, তাই বলছিলেন।

সুশীলা বৌটির দুঃখে ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমার বাপের বাড়ী কে আছে বৌ ?

এমন করিয়া বৌটিকে স্নেহেরকণ্ঠে এ বাড়ীতে কেহ কথা বলে না, বৌটির চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া কহিল, মা বিধবা

হয়ে আমায় বড় কষ্টে মানুষ করে ছিলেন, দাদা মাকে গ্রাহ্য করেন না, এখানে যখন সম্বন্ধ হয়, মা কত মানা করেছিলেন, দাদা কারো কথা মানলেন না, মা কত কান্না-কাটি কোরে বললেন, ওখানে দিস না বাবা, একটা মেয়ে, তিনি বেঁচে থাকলে একটু দেখে-শুনে দিতেন। তারপর কপালে যা থাকুক। দাদা বললেন, তোমার টাকা বের করো এক্ষুণি অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করছি। এক পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, তাতে আবার বাচ বিচার! মা তখন বেগতিক দেখে চুপ করে রইলেন।

সুশীলা কহিল, তারপর বিয়ে এই খানেই হোল, সেসব অদৃষ্ট বোন্, তা বাপের বাড়ী যাও কখনো ?

"দুবার গেছলুম, ভাজের বড় মুখ, দাদা ভাজেরই বশ, মাকে যে কষ্ট দ্যায়, তা আমায় আবার নিয়ে যাবে, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ দিদি।

সুশীলা কহিল, তোমার বিকেলের জন্য জলখাবার আমার ওখান থেকে আসবে, তুমি—

বৌ জোড়হাত করিয়া কহিল, না দিদি মাপ করবেন, আমাকে আপনি অত যত্ন করছেন কেন ? আমার বড় কঠিন প্রাণ, ঐ দুটো মেয়ের বেলায়ও আমার এমনি কোরে কেটেছে, আমার প্রাণ কিছুতে বেরুবার নয়, আর যে পোড়াকপালীরা আমার পেটে আসে, তারাও অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে আসে।

কতখানি খেদে নবপ্রসূত সন্তানের মাতা এমন কথা বলিতে পারে, তাহা স্নেহশীলা পুত্রবতী নারী ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে !

সুশীলা কহিল, বাট্ বাট্ অমন কথা বোল না বোন, ওরাই বেঁচে বর্ত্তে থাক্, একদিন ওদের হোতেই তোমার দুঃক্ষু ঘুচবে।

এমন সময় মেনীর জ্যাঠাইমা আসিয়া ডাকিলেন, এস দিদি, মা তোমায় ডাকছেন। সুশীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এই যে আসছি, ছোট বৌ বড় লাজুক দিদি, বলছি তোমার বিকেলের জলখাবার আমার বাড়ী থেকে রোজ আসবে, তা জোড় হাত করছে, বলে কাজ নেই।

বড় বৌ ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, ও সব ঠাট্।

গৃহিণী সুশীলাকে দেখিয়াই কহিলেন, এসো মা লক্ষ্মী এসো, আমি কদিন কাজের ঝঞ্ঝাটে বেরুতে পাই নি, তুমি তো মা এসে, লোক পাঠিয়ে কত খোঁজ নিচ্ছ। এই দেখ না, কপালগুণে এবারেও ছোট বৌয়ের মেয়ে হোল উপরি উপরি তিনটে মেয়ে, দেখে গায়ে জ্বর আসছে !

সুশীলা হাসিয়া কহিল, এই তো মা আমারও দুটো মেয়ে হয়েছে, তার জন্যে এখন থেকে এত ভয় ভাবনা কিসের ?

গৃহিণী কহিলেন, কি করি বল মা, বসন্ত যে এখন হোতেই ভালো করে থাচ্ছে না, এক দিনও বাড়িতে রাত্তিরে শোয় না, ইষ্টিসেনে পড়ে থাকে, বৌ হোতে আমি ছেলে হারাতে বসেছি মা, এমন হা-ঘোরের মেয়ে এনেছিলুম !"

সুশীলার আর সহ্য হইল না, কহিল বৌয়ের দোষ কি মা ? আপনার ছেলেই ভালো না। মদ, গাঁজা খায়। ডিউটীর সময় পালিয়ে মন্দ যায়গায় বোসে থাকে, উনি তবুও রিপোর্ট করেন-নি, কিন্তু ক্রমেই বাড়াবাড়ি হোচ্ছে দেখে খুব বিরক্ত হোয়ে উঠেছেন। ছেলেকে বোঝাবেন, নইলে ভালো হবে না, স্ত্রীর মনে কষ্ট দিলে কি পুরুষের মঙ্গল হয় মনে করেন ? বৌ আপনার খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

গৃহিণী চুপ হইয়া গেলেন। পুত্রের যা' কিছু দোষ, তিনি মনে করেন বৌ-ই তাহার মূল।

ইতিমধ্যে পাঁচ বছরের মেয়ে মেনী—ছোট একটা বাটিতে তেল লইয়া ঠাকুরমার পায়ে মাখাইতে মাখাইতে কহিল, ঠাকুরমা, খুকী তোমার সেবা করে না, বড় দুষ্টু না ? আমায় তুমি বেশী ভালো বাসবে ? আচ্ছা।

সুশীলা কহিল, এই দেখুন, নাতনীগুলি এখন থেকেই আপনাকে মায়া দয়া কোরছে, এর পর আরো কোরবে। গৃহিণী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বেঁচে বর্ত্তে থাক ভালঘরে বরে পড়ুক, ছেলে আমার অবুঝ, বলে ওদের বিয়ে দেবো কি কোরে ? আমি তো বলি আপন আপন বরাত নিয়ে সবাই এসেছে, তোর এত ভাবনা কিসের। বড় ছেলেকে বোলো মা, যেন একটু ধমকা-ধমকি করেন বড়ই বোয়ে যাচ্ছে, আমি আর কি কোরবো।

(৩)

প্রসন্নবাবু আহারে বসিয়াছেন। সুশীলা সম্মুখে বসিয়া পাণ সাজিতেছে; প্রসন্নবাবু কহিলেন, খুকী কই গো ? তাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না, এর পরে আবার ঝগড়া কোরবে,বোলবে খাবার সময় আমাকে ডাকনি কেন ?

"এইখানেই তো ছিল, ও খুকী, কোথা গেলি থাধি তো শীগগির আয় ?" ঘরের মধ্য হইতে খুকী সাড়া দিল কি মা ? স্বরে বোঝা গেল বাহির হইয়া আসিবার তার মোটেই আগ্রহ নাই।

সুশীলা কহিল, কি মাথা-মুণ্ডু করছে, তুমি একবার ডাক।

প্রসন্নবাবু ডাকিলেন, শীগ্‌গির আয় পাগলী, ফাঁকি পড়বি। খুকী পিতার ডাকে বাহির হইয়া আসিল। পিতা কহিলেন, কি হচ্ছিল তোমার?

পিতার হস্ত হইতে এক গ্রাস মুখের মধ্যে লইয়া সেটুকু নিঃশেষ গলাধকরণ করিয়া খুকী কহিল, ঘরের ভেতর চলো বাবা,একটা মজা দেখাব।

"তোর তো সকল কথাতেই মজা" বলিয়া প্রসন্নবাবু নিশ্চিন্তমনে আহার করিতে লাগিলেন। খুকী আবার ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল। সুশীলা কহিল, তুমি খেয়ে নাও, ও আজ কি মজা পেয়েছে খেতে মন নেই।

প্রসন্নবাবু আহার করিয়া মুখ হাত ধুইয়া শয়ন-গৃহে যাইতেছেন, দেওকীলাল কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে পিছনে পিছনে আসিতেছে। খুকী ছুটিয়া আসিয়া পিতার হাত ধরিয়া কহিল, বাবা এসো আমার সঙ্গে একটা মজা শোনাবো।

প্রসন্নবাবু কহিলেন, বিরক্ত করিস নি পাগলী, এই খেয়ে উঠেছি তোর মা যে খাইয়েছে মেরে ফেলবার যোগাড় এখন একটু জিরিয়ে নি, উঠে তোর মজা দেখব। না এখুনি চলো বলিয়া খুকী টানাটানি করিতে লাগিল।

"দাঁড়া হতভাগা মেয়ে, মেরে হাড়গুঁড়ো করছি, ভারি আব্দারে হোচ্ছে দিন দিন।"

"খেয়ে উঠে মানুষকে জিরুতে দিবি না?"

খুকী ভয় পাইল। কন্যার বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য করিয়া প্রসন্নবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, আয় আয় তোর মজাটা আগে শুনেই যাই। খুকী আহ্লাদে পিতার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর আসিল। মেঝেয় কান পাতিয়া কহিল, বাবা তুমি এমনি কাণ পেতে শোন, কেমন একটা শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রসন্নবাবু সবিস্ময়ে কাণ পাতিয়া শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ ভয়বিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন, ওগো সর্ব্বনাশ উপস্থিত, শীগগির এদিকে এসো।

"কি হোয়েছে," বলিয়া সুশীলা ভয়ে ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

প্রসন্নবাবু কহিলেন, মেঝেয় কাণ পেতে শোনো পদ্মার জলের কুল কুল শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেবারে যে ভাঙ্গন ধরেছিল, এই দেখ চুলের মতো সরু ফাট মেঝেতে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। রাতের মধ্যেই এ ইষ্টিসনের

ঘর-বাড়ী সব পদ্মার গর্ভে ডুবে যাবে, কোনো কিছুর চিহ্ন থাকবে না।"

সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল, "কী সর্ব্বনেশে কথা গো। চলো আমরা এখুনি প্রাণ নিয়ে পালাই। তুমি শীগগির সবাইকে খবর দাও। আহা মালবাবুর বৌএর যে জ্বর হয়েছে, তার দশা কি হবে গো?"

"তুমি শীগগির গয়নাপত্তর আর দামী জিনিষগুলো মোট বেঁধে ফেল, আমি চারি দিকে তার করে দি।"

প্রসন্নবাবু বাহির হইয়া গেলেন, সুশীলা সাশ্রুনয়নে মা-দুর্গাকে স্মরণ করিতে করিতে আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে ও ছোট গ্রামটিতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল, সকলেই নিজের প্রাণ ও যথা সম্ভব জিনিষ-পত্র লইয়া পলাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। প্রসন্নবাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ট্রেণগুলি ও মালপত্র সরাইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রসন্নবাবু প্রায় সব দ্রব্যই স্থানান্তরিত করিবার অবকাশ পাইলেন। ষ্টেশনে যত এঞ্জিণ ও ওয়াগন্ ছিল সবই লাইন হইতে সরাইয়া সর্ব্বশেষে একখানি ট্রেণে ষ্টেশন-গৃহের মূল্যবান আসবাব পত্র সমূহ বোঝাই করিয়া প্রসন্নবাবু অন্য ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। সুশীলার আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে ও কন্যা দুইটিকে ইতিপূর্ব্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। খুকী আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, এমন করিয়া দায়ীত্ব রক্ষা ও কর্ত্তব্য করা হইল বলিয়া প্রসন্নবাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অপূর্ব্বভাবোচ্ছাসে ভরিয়া উঠিতেছিল, এ বিপদ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া নয়, সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন ত্রুটি হয় নাই বলিয়া সুশীলা কম্পিত হৃদয়ে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে এক্ষণে নতজানু হইয়া সাশ্রুনয়নে দেবতার চরণে প্রণাম করিল। কন্যাকে লইয়া কৃতজ্ঞতাভরে প্রসন্নবাবুও মস্তক নত করিলেন।

ছোট বৌয়ের কিন্তু এ আকস্মিক বিপদে এমন অবস্থা হইল যে, সে বেগ সে সহ্য করিতে পারিল না। জ্বর অবস্থায় তাহাকে সরান হইলেও ৪দিন পরে তাহার জীবন শেষ হইয়া গেল, এই গোলযোগের সময় তাহার জন্য দুঃখ করিবার অবসর কাহার ছিল কি না জানি না, সুশীলার কিন্তু খাইয়া দাইয়া কাজ নাই, তাই পোড়াকপালী বৌটার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া

চোখ ঢুলাইয়া বসিল। পর দিন প্রাতে সহরের লোক সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, যেখানে ষ্টেশন ছিল সেখানে আর কিছু চিহ্ন মাত্র নাই। পদ্মার বিশাল উদরে সকলেই স্থান পাইয়াছে, চারিদিক জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রসন্নবাবুর খুকীই যে শত শত নরনারীর জীবন রক্ষার কারণ, মুক্ত কণ্ঠে সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া বালিকার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল। যথা সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ প্রসন্নবাবুর কর্ম্মতৎপরতা ও সৎসাহসিকতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া পদোন্নতি করিয়া দিলেন। এবং খুকীই যে দুর্ঘটনাটির সম্ভাবনা অবিষ্কার করিয়া সকলকে ধনে প্রাণে বাঁচিবার অবসর প্রদান করিয়াছিল সেজন্য গুণানুরাগী এজেণ্ট মহোদয় খুকীকে একটি সোনার মেডেল ও পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

আমরা জানি, প্রসন্নবাবু এ ব্যাপারে আত্মপ্রসাদ রূপ যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় অন্য কোনও ধন রত্ন সামান্য মাত্র।

শ্রীসরসীবালা বসু।

আত্মোৎসর্গ

—o—

সহসা একদা কোন দৈব শক্তি বলে,
শৈল বক্ষ বিদারিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
আপনার দুগ্ধ-শ্বেত ক্ষুদ্রতনুখানি,
চায় শ্যাম ধরা বক্ষে বিছাইয়া দিতে।
অসংখ্য শিখর তার দৃঢ় বাহু পাশে,
বাঁধিয়া রাখিতে নারে সহস্র বন্ধনে।
নীলাম্বরে কোটী তারা চন্দ্র সূর্য্য ডাকে;
ডাকিছে মর্ম্মর তানে শ্যামল বনানী।
সে সস্নেহ বাহু পাশ শত সু-কৌশলে,
মহাবেগে ছিন্ন করি চঞ্চলা চপলা,
তুচ্ছ সুতরল গতি; বালিকার প্রায়
খল খল শুভ্র হাস্যে কল রোলে ধায়।
চরণে উপল বাজে নাহি মানে ব্যথা,

ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র গতি তার শৈল ক্রোড় ত্যজি।
হীরকের কণা প্রায় ছড়ায়ে সলিল,
ছুটিয়া চলিছে রঙ্গে বাহু দোলাইয়া,
ধরা পৃষ্ঠ ত্যজি যেন উন্মাদিনী প্রায়।
পরিপূর্ণ ক্ষীণ তনু যৌবনের বেগে
উল্লাসে অধীরা, প্রিয় সমাগম আশে।
ক্রমে বাড়ে গতি শব্দ উদ্দাম উচ্ছল,
অন্তরের সুদুর্দ্দম অসংযত বেগে,
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে দুর্ব্বোধ্য গর্জ্জনে,
আকুল আবেগ লোয়ে সিন্ধুর উদ্দেশে।
সকল বেদনা তার প্রিয় বক্ষে ঢালি,
আপনা ভুলিয়া সে যে নিবেদিতে চায়।
সকল কামনা সর্ব্বসিদ্ধ মনোরথ,
সেই তার কামনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
বক্ষে বক্ষে মিশাইয়া চরিতার্থ হয়,
লভে নীর জীবনের পূর্ণ সফলতা!
অনন্ত বাসনা শান্ত আত্ম সমর্পণে !!

শ্রীপ্রীতিবালা সরকার।

পূজার অবকাশে

গতবারে আগরতলা সংক্রান্ত বক্তব্যের মধ্যে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এবার তাহা অগ্রে বলিব। সে সময় ওখানে মহারাজা কিম্বা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারি কেহই উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং "কুশদহ"র গ্রাহক হিসাবে কোন সুবিধার আশা না করিয়া তথায় যাওয়া সত্ত্বেও তবু যেটুকু সাহায্য পাইলাম তাহা আশার অতীত বলিয়াই অধিক আনন্দের কারণ হইল। বাবু অসিতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ত্রিপুরা ষ্টেটে শিক্ষাবিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারি। (ইনচার্জ্জ অব্ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট) তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। তিনি ১৩২০ সাল হইতে বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের "কুশদহ" গ্রহণ করিলেন।

চাঁদপুর ;—কুমিল্লা হইতে ঢাকা আসিবার সময় বাবু সতীশচন্দ্র আইচ

মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, যাইবার পথে চাঁদপুর অন্তত একদিন হইয়া না যাইবেন কেন ? এমন কি তিনি তাঁহার পরিচিত আত্মীয়ের নামে একখানি পত্র দিতেও চাহিলেন ; আমি ভাবিলাম, ক্ষতি কি ? ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর তিনটি সাবডিভিসনের দুইটি দেখা হইল, তবে চাঁদপুর বাকী থাকে কেন ? সুতরাং তাহাই মনস্থ করিয়া তাঁহার পত্র সহ ৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা ১টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টার সময় চাঁদপুর আসিলাম।

সতীশবাবু যাঁহার নামে পত্র দিয়াছিলেন, তিনি জ্বরে (রেমিটেণ্ট ফিবার) শয্যাগত থাকায় তাঁহার জনৈক আত্মীয় আমাকে আবার তাঁহাদেরই আর এক আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি যাঁহার বাড়ী আসিলাম, তিনি বাবু হরদয়াল নাগ চৌধুরী। ইনি এখানকার বিখ্যাত ব্যক্তি। ওকালতিতে যশস্বী হইয়া এখন দেশের এবং দশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাঁর আতিথেয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুই বেলা আমার সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিয়া আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চাঁদপুর সাবডিভিসনটি, ছোট হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা ঘাট। পদ্মানদী হইতে আর একটি স্রোত বাহির হইয়া টাউনের নিম্নদিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ের পক্ষে স্থানটি বেশ অনুকূল হইয়াছে। ষ্টেশনটি জংশন, এজন্য যথেষ্ট প্রশস্ত।

এখানে আর একটি ধর্ম্মবন্ধু পাইলাম, তিনি বাবু ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; (ডেপুটী ইনেস্পেক্টর অব স্কুলস্) তাঁহার গৃহে রবিবারে সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা হইল। সেই রাত্রেই নারায়ণগঞ্জযাত্রি ষ্টীমারে আসিয়া রহিলাম।

ঢাকা ;—১০ই অগ্রহায়ণ সোমবার ভোরে ষ্টীমার ছাড়িল। প্রায় বেলা ৯টার সময় নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার হইতে ট্রেণে উঠিয়া ১০টার পর ঢাকায় শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের গৃহে আসিয়া অতিথি হইলাম। তখন দেবালয়ে উপাসনার সময় হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের সহিত উপাসনায় যোগ দিয়া বিশ্রাম ও আনন্দ লাভ হইল।

এখানে আমাদের পরমাত্মীয় সমবিশ্বাসী ভক্তিভাজন স্বর্গগত ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের কন্যা কুমারী সরলাবালা রক্ষিত বহুদিন যাবৎ ঢাকা ফিমেল ইডেনস্কুলের কার্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি এই গৃহে আহার উপলক্ষ্যে প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া এবার যে রূপ ভাবে ভগিনী সরলা

বালা ও ভ্রাতা সতীশকে পাইলাম, মনে হয় আমার শেষ জীবনে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পূর্ব্বে মাতৃস্থানীয়া গণেশচন্দ্রের পত্নীদেবীর হস্তে কতদিন অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। এবার সরলার হস্ত-পরিবেশিত অন্নের মধ্যেও সেই মাতৃ-হস্ত দর্শন করিলাম। আমার বিশ্বাস, এই ঘটনায় সরলাবালার মনেও এবার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল, যাহা হউক এ সকলই বিধাতার মহিমার পরিচয় ছাড়া আর কি বলিতে পারি? ভ্রাতা সতীশচন্দ্র এবার বি এ-সি, পরীক্ষা দিবে। আশা করি, গণেশচন্দ্রের সাধনার ফল শ্রীমান্ সতীশে প্রকাশিত হইয়া কুশদহ এবং কুশদহস্থ তাম্বুলিশ্রেণীর নামকে গৌরবান্বিত করিবে। আর এবার স্নেহময়ী ভগিনী সরলার নৈকট্য সন্দর্শনের মধ্যে যে ভাব জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা প্রার্থনার আকারে প্রকাশ হইয়া পড়িল। "ধন্য মা আনন্দময়ী যুগ-ধর্ম্মবিধায়িনী, আমাদের মধ্যে তোমার একি করুণা দান করিলে? যে দেশের—যে শ্রেণীর শত শত নারী, শত শত কন্যা, সুশিক্ষা অভাবে অজ্ঞানতা মোহ-কুসংস্কারে জড়িত হইয়া কত ক্লেশ, কত নির্য্যাতনে নিষ্পেষিত হইতেছেন, যাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, এই জন্যই যেন তাঁহাদের জন্ম, এ অবস্থা হইতে বুঝি তাঁহাদের আর কোনওকালে উদ্ধার নাই; সেই ক্ষেত্রেও তুমি তোমার এই যুগধর্ম্মের মহিমায় এমন একটি কন্যার জীবনাদর্শ দেখাইলে যে, যিনি পিতা মাতার যত্নে স্বাভাবিক শিক্ষাগুণে সদজ্ঞান লাভ করিয়া আপন স্বার্থ, ভোগ বিলাস-বাসনা সংযত দ্বারা, কনিষ্ঠা ভগ্নি-গুলি এবং একমাত্র ভ্রাতাটিকে সুশিক্ষা দান করিয়া, শ্রান্ত পিতা মাতার সাহায্য ও আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সমস্ত শক্তি—সমস্ত জীবন কাল-ব্যাপী উপার্জ্জিত অর্থ উৎসর্গ করিলেন। কঠোর সাধন দ্বারা চিরকৌমার্য্য ব্রত পালন করিয়া দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিলেন, এবং তাহাতেই একমাত্র আনন্দিতা হইলেন। জননী, এই ত্যাগের মন্ত্র কি বিফল হইবে? কখনই না, স্বচক্ষে দেখি আর না দেখি, একদিন নিশ্চয়ই এই সদ্দৃষ্টান্তের ফল ফলিবেই। মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

ভক্তের গৃহ "শান্তি নিকেতন," এবার তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। ভক্ত পরিবারে বাস করিলে শরীর মন শুদ্ধ ও সুখী হয়; ভক্তিভাজন ভক্ত দুর্গানাথের গৃহে এবার দিন যাপন করিয়া তাহা উপলব্ধি হইল। গৃহপার্শ্বে পুষ্পোদ্যানের সুবাসে চতুর্দ্দিক সর্ব্বদাই সৌরভপূর্ণ; রাত্রে যখন বাহিরে আসিয়াছি তখন সেই সৌগন্ধে মনে হইয়াছে, একি?

গৃহাভ্যন্তরে শান্তি আর বাহিরে সুগন্ধ পূর্ণ!! গৃহের প্রত্যেক স্থান যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সকলের ব্যবহারও তেমনই সহজ ও সরল। গৃহকর্ত্রী নিরবে এই অতিথির প্রতি কত স্নেহ কত সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। আমার আর কি আছে যদ্বারা আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, কেবল নমস্কার করিয়াই বিদায় লইলাম। ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় "ইষ্ট" পত্রিকার সম্পাদন এবং মণ্ডলীর কার্যাদি লইয়া এখানে আছেন, পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু প্রভৃতি যাঁহারা এখানে ছিলেন,তাঁহাদের স্মৃতিও সকল কাজের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

ঢাকা সহরটি বড় কম নয়, তাহা প্রায় সকলেই জানেন; আমিও এখানে এই প্রথম যাত্রি, সুতরাং অন্যের সাহায্য অভাবে একাই সমস্ত স্থান ও রাস্তা ঠিক করিয়া লইতে আমার প্রায় দুই দিন লাগিল। যখন বুঝিলাম নবাবপুর রাস্তা সহরটিকে যেন দ্বিভাগ করিয়াছে, তখন পূর্ব্ব পার্শ্বে উয়ারী, গৈলারা, সুত্রাপুর, এক্রামপুর, ফরাসগঞ্জ প্রভৃতি, পশ্চিম দিকে পাটুয়াটুলী, পাথর হাট্টা, বাবুরবাজার; বাংলাবাজার আরমানীটোলা, আমলীগোলা পর্য্যন্ত আমার যতদূর প্রয়োজন হইল সমস্ত ঠিক করিয়া লইলাম। অবশ্য আমি ছিলাম উত্তরদিকে কায়েৎটুলি। ষ্টেশনের নিকট দিয়া নবাবপুর রাস্তা ধরিয়াই অনেক সময় যাতায়াত করিতাম, দক্ষিণে নদীর ধারের (রিভার সাইডে) দিকে এবং উহার উপরিস্থ বড় রাস্তার ধারে সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত। যথা পোষ্টাফিস্, ফিমেলইডেন স্কুল. ইষ্টবেঙ্গল ইনিষ্টীটিউড, পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ, জগন্নাথ কলেজ এবং কোর্ট আদালত, খৃষ্টীয়মিসন ইত্যাদি কিন্তু ঢাকাকলেজ এবং প্রকাণ্ড কলেজবোর্ডিং একেবারে উত্তর প্রান্ত রমনার দিকে নূতন টাউন যেখানে হইতেছে।

এখানে "কুশদহ"র গ্রাহক সংগ্রহের পক্ষে তেমন কোন সুবিধা হইল না, তবু সামান্য কিছু পাইলাম, কিন্তু একটি মহা লাভ হইল এই যে, উয়ারীতে গিয়া প্রফেসার বি, এন, দাস অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস মহাশয়কে পাইলাম। ইহার উর্দ্ধতন পুরুষের পূর্ব্বনিবাস আমাদের কুশদহস্থ জলেশ্বর। ইনি এখন হুগলিতে বাড়ী করিয়াছেন। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হইয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি অতি সদাশয় অমায়িক মহদ্ব্যক্তি। কুশদহর বিবরণ যাহা বাহির হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য ইনি ১৩২০ সাল হইতে "কুশদহ" গ্রহণ করিলেন। ইঁহাকে পাইয়া আমি

অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, ঢাকা আসিয়া আমার যেন কত কি লাভ হইল।

এইবার আর একটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার এই দীর্ঘ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ করিব। শান্তিপুর নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মবন্ধু স্বর্গীয় পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের পুত্র, প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মল্লিক মহাশয় বহুকাল এই ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার অন্য পরিচয়ের মধ্যে প্রধান পরিচয় এই যে, ইনি পতিতা নারীদিগের হিতার্থে উদ্ধারাশ্রম করিয়া জনসমাজের যে মহদোপকার করিয়াছেন তাহাতে ইনি যে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট ধন্যবাদের পাত্র—তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই উদ্ধারাশ্রমের অবস্থা এবং কার্য্য প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "মাতৃ নিকেতন" নামে কার্য্য চলিয়াছে। এক্ষণে এই আশ্রম-বটিকা ঢাকার নিকটস্থ খিলগাঁও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি ১৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, প্রাতে ঢাকা হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ চলিয়া ৯৷৷০ টার সময় খিলগাঁও পৌছিলাম, এবং বেলা ৪টা পর্য্যন্ত তথায় ছিলাম।

আমি যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম, তখন পরিবারিক দৈনিক উপাসনা হইতেছিল। পার্শ্বস্থ যে ঘরে উপাসনা হইতেছিল তাহার সম্মুখের ঘরে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। তদপরে বহুকালের পর শ্রদ্ধেয় শশীবাবুকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, বলা বাহুল্য এরূপ অভাবনীয় রূপে আমাকে পাইয়া তিনিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মাতৃনিকেতনে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১০।১১টি বালিকা এবং মহিলা অবস্থিতি করিতেছেন। বাংলা ইংরাজী পড়াশুনা, সেলাই ও সুলভ গৃহশিল্প ও ধর্ম্মশিক্ষা, সাধন প্রভৃতি কার্য্য এখানে হয়।

স্থানটি অত্যন্ত মনোরম; একটি পুষ্করিণী নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ;—নির্ম্মল বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত জলাশয় দেখিলেই আমার প্রাণে কেন যে এত আনন্দ হয় তাহা আজো ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। ধান্যের চাষ এবং তরকারী ও ফলের বাগানে আশ্রমের অনেক সাহায্য হয়। গাভী দুগ্ধের সাহায্যে স্বাস্থ্যের অনুকূলতা লাভ হয়। পল্লীবাসে সাদাসিদা ভাবে জীবিকানির্ব্বাহের সঙ্গে শান্ত সুস্থ জীবন যাপনের প্রণালী মাতৃনিকেতন একটি দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া বোধ হইল।

শশীবাবুর জীবনে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তিনি তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রভাকে একটি জাপানী সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। কন্যাটি জাপানে শ্বশুরালয়ে গিয়া বৃহৎ তাগেদা পরিবারে কি প্রকার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা "বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা" পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলে জানিতে পারিবেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা শশী বাবু বাঙালীর সমাজসংস্কার বা জাতিভেদ সংস্কার সম্বন্ধে একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে এক দল বলেন, "জাতিভেদ কিছুই নয়; প্রতিপক্ষ বলেন, "জাতিভেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়াছে, সুতরাং জাতিভেদ অনর্থক নয়", এইরূপ একটা বাদ প্রতিবাদ লইয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু যাঁহারা সত্য সত্য জীবন দ্বারা গড়িয়া দেখাইতে পারিতেছেন যে, শিক্ষায়, ভাবে, এবং ধর্ম্মে একীকারণ করিতে পারিলে, যে কোনও শ্রেণীর নর নারী হউক না কেন, কেবল সভা সমিতির মিলনে নয়, রক্তসংস্রবে মিলিয়াও বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক সুবিশাল মানব পরিবারে পরিণত করিয়া সমাজকে যে পুষ্ট ও শক্তিশালী কর্ম্মশীল করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শশীবাবু তাঁহার নিজের এবং তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রভা তাগেদা প্রণীত কয়েক খণ্ড পুস্তিকা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, স্থানাভাবে এখানে তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না, ইচ্ছা রহিল কুশদহে তাহার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

২০শে অগ্রহায়ণ বেলা ১টার সময় ঢাকা হইতে বাহির হইয়া নারায়ণগঞ্জ ট্রেণ হইতে ষ্টীমারে, তথা হইতে রাত্রি ১২টার পর গোয়ালন্দ ট্রেণে উঠিয়া ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় পৌছিলাম।

আমার পূজার অবকাশে এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে ভগবানের কৃপায় প্রাণে যে টুকু সদ্ভাব বিশ্বাস, ভক্তি এবং উদ্যম উৎসাহ লাভ করিয়াছি তাহার সারভাব গ্রহণ করিয়া যদি কাহারও কণামাত্র উপকার হয় তবেই আমার লেখনী-শ্রম স্বার্থক হইবে। এজন্য একমাত্র বিধাতার কৃপাই ভিক্ষা করি।

———o———

শান্তি পথে

—o—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"রিণিকি ঝিণিকি ঝঁ।"

শ্রীমতী বীণাবাদিনীর কক্ষ হইতে সীতা বিফল হইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, চম্পকবরণী দাঁড়াইয়া আছেন। বুদ্ধিমতী সীতা নগেন্দ্র-বণিতার মনোভাব বুঝিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, কি দিদি, আড়ি পাতছিলে? বেশ, বেশ।

চম্পকবরণীও আত্ম-ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া বলিলেন, আড়ি আর কি পাতব বোন? আমি এসেছিলুম তোমায় খুঁজতে, দরোজার কাছে এসে শুনলুম তোমরা কি কথা বোলচ, কি জানি যদি কোন গোপনীয় কথা হয়, তাই একটু থমকে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

সীতা উচ্চরবে হাসিয়া বলিলেন, দিদি, তুমি, দেওয়ানজির উপযুক্ত সহ-ধার্ম্মণী বটে।

চম্পকবরণী সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন. চল দিদি, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। আমার ঐ একটিই শিবরাত্তিরের শলতে, ওরির জন্যেই সব। এখন ভাল ঘরে বরে ওর একটা বে থা হলেই আমি বাঁচি।

সীতা। মেয়ের বয়স কত?

চম্পক। এই দশ বছর যাচ্ছে। তোমার মেয়ের কত বয়েস হোল?

সীতা। আমার অসীমার বয়স ৮ বছর আর অসিতের বয়েস ১২ বছর।

চম্পক। তবে তোমারও ত ভাবনার সময় হোয়ে এলো। বিয়েটা ৮ বছর বয়েসে দিলেই ভাল, তবে সুবিধে মত না পেলে, টেনে মেনে ১০।১১ পর্য্যন্ত রাখা যায়। তার পরে কি আর মা বাপের পেটের ভাত হজম হয়।

সীতা। কি জানি দিদি, ক বছর বয়সে দেওয়া ভাল? সে সব কথা মেয়ের বাপ জানেন। তিনি ত অল্প বয়সে মেয়ের বে দিতে নারাজ।

চম্পক। তা বোন তোমরা বেশী বয়েস পর্য্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো কোরে রাখতে পার। দেশ গাঁয়ের সঙ্গে ত তোমাদের বেশী সম্পর্ক নেই। বিদেশে কে বা কার খোঁজ রাখে?

সীতা আর কোন কথা বলিলেন না। কেবল একটু মৃদু হাসিলেন। কথা কহিতে কহিতে কিছু দুর অগ্রসর হইলে তাঁহারা একটা কক্ষ হইতে বালক বালিকাদিগের কণ্ঠ-সঙ্গীত শুনিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন, সঙ্গীত শুনিয়া চম্পকবরণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বুঝি, দিদি, তোমার ছেলেমেয়েদের গলা? গায় মন্দ নয়।

সীতা বলিলেন, হাঁ, তাইত দেখচি। খোকা গুলোর রকম দেখ দিখি, কর্ত্তা শুনতে পেলে হয়ত রাগ করবেন।

চম্পক। রাগ করবেন কেন? কত সময় ত তিনি ইচ্ছে করে সুধা, ললি এদের গান শোনেন। তুমি দিদি সুধার গান শোননি? বেশ গায়।

সীতা। ছেলে মেয়েদের গানে তোমাদের কোন আপত্তি নেই?

চম্পক। উনি গান বাজনা খুব ভালবাসেন। পাড়ার সখের যাত্রাদলের উনি হচ্চেন কর্ত্তা। তাঁর কাছথেকেই মেয়ে গান শিখেচে। তবে ছেলে মানুষ কিনা? সকলেই রঙ্গ ভঙ্গের গান নিয়ে ব্যাঙ্গ করে। দু দিন পরে, বের জল গায়ে পড়লে কি আর এ সব চলবে দিদি?

তাঁহারা যখন বালক বালিকাদিগের সঙ্গীতের স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন হারমোনিয়ামের টুলে বসিয়া অসিত গান গাহিতেছিল, আর ললিতা তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া সঙ্গীত কালে তাহার অধর ও ওষ্ঠের ব্যাপ্তি ও সঙ্কোচন এবং চক্ষের আনন্দ-চঞ্চল নৃত্য অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে ছিল, ললিতার পার্শ্বে অসীমা দাঁড়াইয়াছিল। অসিত গাহিতেছিল,—

আলাইয়া—ঝাপতাল।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথ হারা।
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হলে না হেরি কুল কিনারা;
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।"

সুধামুখী, সঙ্গীত-প্রিয়া হইলেও অসিতের নিকট না যাইয়া হারমোনিয়মের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। চম্পকবরণী কন্যার

নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা সুধামুখী, গানের সময় তুমি আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে কেন মা ? অসিতকে লজ্জা কি ? ও যে তোমার ভাই হয়।

মাতার কথায় আদরিণী কন্যা মুখ ফিরাইয়া, ওষ্ঠ নিম্নভাগে বক্র ও স্ফীত করিয়া বলিল, ইস্, ভারি ত গান, ও আবার কি শুনব ?

চম্পকবরণী বলিলেন, ছিঃ মা, অমন কথা বলতে নেই।

ক্রমে অসিতের সঙ্গীত বন্ধ হইল। চম্পকবরণী অসিত ও অসীমাকে আলিঙ্গনে ও চুম্বনে আপ্যায়িত করিলে তাহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর অসিত, অসিমা ও ললিতা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইল।

বাহিরে আসিয়া ললিতা বলিল, বেশ গান ভাই।

অসিত। বিলাত থেকে আসবার সময় বাবা রোজ রোজই সকালবেলা জাহাজের ডেকে বোসে আমাদের দিয়ে এই গান গাওয়াতেন। আমরা যখন গান করতুম, তখন দেখতুম বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াতো।

কিছুক্ষণ গল্প ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া অসিতরা যখন গানের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন শ্রীমতী সীতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সুধামুখী তাহার কণ্ঠে লহরীর উপর লহরী তুলিয়া গান এবং চঞ্চল-চরণ ভঙ্গে নূপুর বাজাইয়া শরীরের আলোড়নে মাধুরী ছড়াইয়া নৃত্য করিতেছিল। সুধামুখী নৃত্যের সহিত গাহিল :—

হাওয়া আমার বাবা বোলে
বাপের মত ছুটি,
সাগর ঢেউয়ে জন্ম বোলে
চাঁদের মধু লুটি;
বাবা মোরে গান শেখালে—সাঁ, সাঁ, সাঁ,
নাচের তাল, রিণিকি ঝিনিকি ঝাঁ ;
ঘুরি দিনরাত, ডাইনে আর বাঁ,
নেচে, গেয়ে, রিণিকি ঝিনিকি ঝাঁ।
রোদের দিনে পুড়ে করি সাঁ, সাঁ, সাঁ,
বর্ষা ধারায় নেমে ভাসিয়ে দি গাঁ ;
বসন্তে জোছনা খাই, খাঁ, খাঁ, খাঁ,
শরৎ-শিশির তরে মুখ করি হাঁ।

শীতের রোদে ঘুরি, ফিরি, বাঁ, বাঁ, বাঁ;
রেতের হিমে খাই কুকুঁড়ার ছাঁ,
সারা জীবন গেয়ে বেড়াই ঐ সাঁ, সাঁ, সাঁ,
নেচে বলি রিণিকি ঝিনিকি ঝাঁ।

এই গান সুধা গত পূজার সময় যাত্রার এক সঙের মুখে শুনিয়া শিখিয়াছিল। এই রকম নাচের তালের, হালকা সুরের, তরলভাবের অর্থশূন্য গানই সে অধিক পছন্দ করিত।

এই ভাবের আরও ২।১টা গীত ও নৃত্য হওয়ার পর শ্রীমতী সীতা বিদায় প্রার্থনা করিয়া বাহিরে আসিলে চম্পকবরণী বলিলেন, দিদি, মেয়েত দেখলে, এখন তার একটা বের যোগাড় তোমায় কোরে দিতে হবে।

সীতা বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি কোরে বের যোগাড় কোরব দিদি? আমরা হলুম—জাত নাশা, বিলেত-ফেরত, আমরা তোমার মেয়ের বের সম্বন্ধ করলে তা তোমাদের পছন্দ হবে কেন?

চম্পক। অমন কথা কেন বল দিদি? তোমার পছন্দ খুব ভালই হবে। শুনলুম, তোমাদের কে একটি আত্মীয় আছে—বি, এ, পড়ে। সে নাকি খুব তোমাদের কথার বাধ্য। উনি কাল তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

সীতা। কে, সে? তার নাম কি?

চম্পক। নাম শ্রীপতি ঘোষ, শ্যামগঞ্জের রমানাথ ঘোষের ছেলে, তারা দু' ভাই।

সীতা। ও! হাঁ ছেলেটি মন্দনয়। কিন্তু সে বোধহয় বিলেত যেতে চায়।

চম্পক। যায় যাবে, কিন্তু সে কথা আগে বলাবলি করে লাভ কি?

সীতা। তোমরা বিলেত ফেরত জামাই কোরবে?

চম্পক। বোলে কোয়ে কি কোরব? তবে ছেলে যদি ভাল হয়—৭নিদি ঘর হয়, লেখাপড়ায় ভাল হয়, দেখতে শুনতে মন্দ না হয়, তা চোখ বুজিয়ে তার হাতে মেয়ে দিতে পারি। তা কি করি দিদি, যেমন দিন কাল পড়েছে সব সইতে হবে।

শ্রীমতী সীতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সুবোধের দোষ যে, সে নন্দাই আর শ্রীপতির গুণ যে, সে হবে জামাই—ধন্য বিচার।

শ্রীপতি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ হইলে সীতা বুঝিলেন, সুধার সহিত শ্রীপতির বিবাহ এক প্রকার স্থির। সীতা পুত্র ও কন্যাসহ বিদায় হইলেন।

ইহার পরের ফাল্গুন মাসে শ্রীপতির সহিত সুধার বিবাহ যথাবিধ সমারোহে সম্পন্ন হইল। তাহার পরবৎসর আশ্বিনমাসে শ্রীপতি বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করিলেন।

বিবাহের পর সুধাকে লইয়া শ্রীপতি, ভূপতি ও তাহাদের মাতা কলিকাতায় বাগবাজারের বাটীতে যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সুধাকে বিলাত প্রত্যাগতের পত্নী রূপে সু-শিক্ষিত করাই এই বাসস্থান পরিবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সুধা এই নূতন বন্দোবস্তে আনন্দিত হইল। কলিকাতায় ভোগ-তরঙ্গে নিত্য নব লীলার সংস্পর্শ পাইয়া সুধার জীবন-তরণী সুখের হিল্লোলে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সে আপনাকে মহা সৌভাগ্যবতী মনে করিল। সুরপুরের স্বল্প পরিসর পল্লীজীবনে সে যে সকল ভোগপথের কল্পনাও করিতে পারে নাই, কলিকাতায় নিত্য ভোগ-চঞ্চল জীবনে তাহা অজস্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া সে মহা সুখী হইল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন সুখ, নূতন তৃপ্তি নূতন ভোগরতির আস্বাদ পাইতে লাগিল। শ্রীমতী সুধা বিবাহের পর এই ভাবেই তাহার ভোগ-জীবন আরম্ভ করিল।

শ্রীপতি বিলাত গমনের সময় ভূপতিকে বলিয়া যাইল, "তোর বৌদির ভার তোর উপর দিয়ে গেলুম! একে যদি মানুষ করতে পারিস তবেই ভাল, তা না হোলে হয় গলায় দড়ি, আর তা না হয় "ডাইভোর্স"।"

ভূপতি সুধার উপযুক্ত শিক্ষক হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা পরে হইবে। শ্রীপতি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে এদিকে সুবোধ বাবু পাটনা কলেজের অধ্যাপক হইয়া বাঁকিপুরে চলিয়া যান। হরকান্ত মিত্র মহাশয় নগেন্দ্রনাথের পরামর্শমত সুবোধকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করিয়া ললিতাকেই সম্পত্তির অধিকারিণী নির্দ্দেশ করেন। সুধা কলিকাতায় যাইলে ললিতা ও বীণাবাদীনিকে লইয়া মিত্র মহাশয় সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সংসারে বিরক্ত হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বীণাবাদিনী স্বামী থাকিতেও পতি হীনার ন্যায় শোকের দহনে দগ্ধ হইয়া অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিলেন। আর নগেন্দ্রনাথ ও চম্পবরণী সুধার সম্ভাবিত পুত্রকে মিত্র মহাশয়ের বিষয় সম্পত্তির মালিক করিবার দুরাকাঙ্খায় নিত্য নূতন জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

সুরপুরের সংসার এইভাবে রাখিয়া আমরা এইখানেই এই অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।*

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* বিশেষ কারণে আপাতত "শান্তি পথের" অন্য অধ্যায় প্রকাশ বন্ধ রাখিতে হইল। (সম্পাদক)

দাসের আত্ম-কথা

——::——

(পরিশিষ্ট)

দাসের আত্ম-কথা দীর্ঘসময় ব্যাপীয়া বলা হইল। জানি না তাহা পাঠ করিয়া কাহার মনে কি ভাব হইয়াছে। তবে ইহা বর্ত্তমানের জন্য যত না হউক ভবিষ্যতের জন্যই লিপিবদ্ধ রহিল। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইবেই।

নিজ জীবনের পাপ-দুর্ব্বলতার কথা সত্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সংশ্লিষ্টরূপেও অন্যের হীনতা প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই, সুতরাং তদ্রূপঅংশ পরিত্যক্ত হইল। তারপর শেষ জীবনের এখনও অবশিষ্ট অংশগুলি সবিস্তারে বলিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন কিন্তু তজ্জন্য 'কুশদহ'র আর অধিকস্থান গ্রহণ করা উচিত মনে করি না। এই সকল কারণে এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে শেষজীবনের কিছু কথা পরিশিষ্ট রূপে বলিয়াই শেষ করিতেছি।

ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্মিয়া, বাল্যে সেই অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়া ১২ বৎসর বয়সে পৈতৃকসম্পত্তির অভাবে ব্যবসায় কর্ম্ম শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। তৎপরে ১০ বৎসর শিক্ষার ফলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া যখন ধনাগমের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল—যৌবনের সেই উদ্দামপূর্ণ ২৩।২৪ বৎসর বয়সে কোন্ সূত্রে কি ভাবে বিষয়-বিরাগ উপস্থিত হয় এবং কোন্ পথে কি প্রণালীতে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা একে একে সমস্তই বলিয়াছি। তৎপরে সাধন ক্ষেত্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির হইতে কলিকাতায় আসিয়া, যে অবস্থায় আবার সংসার-সংগ্রামে পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে যেখানে ত্রুটী দুর্ব্বলতা এবং চরিত্রের হীনতা ঘটিয়াছে তাহাও বলিয়াছি। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থায়, যেরূপ সঙ্গ এবং ভাবের মধ্যে পড়িলে একেবারে অন্তরের ধর্ম্মাগ্নি, বৈরাগ্য, পবিত্রতা নষ্ট হইবারই কথা, প্রায় তদ্রূপ অবস্থায় পড়িয়াও যে, কোন্ করুণাতে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে নাই, ইহাই স্মরণ করিয়া এখন কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমার স্বদেশবাসীকে সেই করুণার কথা বলিবার

জন্যই প্রাণের এত ব্যগ্রতা। দাসের আত্ম কথার মধ্যে ভগবানের করুণার কথাই প্রধান বক্তব্য। সকলের মন তাহাতে আকৃষ্ট হইলে দাসের প্রয়াস সফল হইবে।

এক্ষণে পরিশিষ্টের মধ্যে প্রধানবক্তব্য পুনরায় দ্বারপরিগ্রহের কথা। পশ্চিমমোকাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া জ্যাঠাইমাতার দরুণ পাঁচ হাজার টাকার অংশ প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করিয়া বহির্জীবনের দৃশ্যত দায় মুক্ত হইলাম, এ সকল কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু এই সময়, (যাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এখন আমার মনের সেইপূর্ব্বকষ্ট চলিয়া গিয়াছে) সেই অশান্তচিত্ত একমাত্র ভগিনীর উপর নির্ভর করিয়া পারিবারিক শান্তি লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। অথচ সহসা কোনও উপায়ান্তরের পথ পাইতে ছিলাম না। এই রূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যখন আন্তরিক একটি অভাব বোধ জাগিতেছিল, ঠিক সেই সময় এখন যিনি আমার সহধর্ম্মিনী তাঁহাকে আমি প্রাপ্ত হই। ইনি প্রথমত অত্যন্ত দুর্ব্বিপাকের মধ্য হইতে আমার নিকট আসেন। অবিভাবক অভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বারাশাত মহকমার অন্তর্গত পল্লীগ্রাম হইতে ইনি কলিকাতায় আসেন, এবং সৎপথ লাভের আশাতেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু পরিবারের বিধবা নারী। মানব জীবনে ঘটনা এবং অবস্থার অন্ত নাই, কোন্ সূত্রে কাহার কি অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার রহস্যভেদ করা সহজ নহে। কিন্তু মূল অভিপ্রায়ের উপরই জীবনের ইষ্টানিষ্ট ফল নির্ভর করে। আমাদের এই ঘটনাতেও ঐ সত্যেরই প্রকাশ দেখা গেল।

যখন ইঁহার সমস্ত জীবনের ভার গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ হইল, এবং তাহা বিহিত পথেই গ্রহণ করা মনে হইল, কিন্তু তাহার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া যখন ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পড়ি, তখন ভগবানের দূত রূপে এক ভক্তিভাজন ধর্ম্ম বন্ধুর সহায়তা পাইলাম। ইনি "দেবালয়"প্রতিষ্ঠাতা 'সেবাব্রত' শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। যখন আমি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বাহ্যিক সম্বন্ধে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে ছিলাম, তেমন দিনে একমাত্র ঐ সাধু পুরুষের আনুকূল্যেই কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মের সম্মুখে ব্রাহ্মপদ্ধতি এবং ৩ আইন অনুসারে আমরা বিবাহিত জীবনে পবিত্র সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলাম। এজন্য তিনি আমার নিকট চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। শশিপদ বাবুর এই উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিতে

পারিব না। এই ঘটনা ১৩০৬ সালে সংঘটিত হয়। কিন্তু এই ঘটনায় আমি আর একটি নূতন পরীক্ষার মধ্যে পতিত হই। তাহাতে দীর্ঘ সময় ধরিয়া মনকষ্ট, স্বাস্থ্যনষ্ট, অর্থক্ষয় প্রভৃতি পরীক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু কৃপাময়ের অশেষ কৃপায় ইহার শেষফল জয়, এবং আমার আত্মার পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণকরই হইয়াছে।

ইহার পর, জীবনের ঘটনার কথা অনেক আছে কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের জন্যই রহিল। তবে এখানে বিভাগ সূত্রটি বলিয়া রাখিলাম।

প্রথম জন্মকাল হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ। তৎপরে ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ,বিষয়-বিরাগাদি লইয়া ৭ বৎসর জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তৎপরে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত নামিয়া, আবার উঠিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিচ্ছেদ বলা যায় তৎপরে সকল ঘটনা সকল অবস্থার মধ্যেই উত্থানের চেষ্টা চলিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে,জীবনের সেই একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য—যাহা ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছিল, 'স্বদেশ প্রীতি' ইহাকে আমি কোনও দিন ভুলিতে পারি নাই। পুত্র বিনয় ভূষণের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর ভ্রাতৃগণের সহিত গোবরডাঙ্গার বাড়ী বিভাগ হইলে. ৩ বৎসরাধিককাল বাড়ীতে বাস করিয়া যখন ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইবার পর দেড়বৎসর বাগেশ্বরে বাস করি, তখন আর মনে হয় নাই যে. আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিব—আবার স্বদেশের কথা মনে জাগিবে। পুত্র বিনয়ভূষণ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজিকভাবে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার সঙ্গে যখন চিরবিচ্ছিন্ন হইল এবং ঘটনা সূত্রে আমি পশ্চিমপ্রদেশ ভ্রমণে গিয়া হরিদ্বারে ছিলাম, তখনও মনে মনে কল্পনা করিয়া ছিলাম সস্ত্রীক এইখানে বাস করিয়া সাধন ভজনে শান্তিতে শেষ জীবন এইখানেই অবসান করি না কেন? কিন্তু আমার সকল সঙ্কল্প সকল বাসনা ভেদ করিয়া প্রাণে সেই একমাত্র সুর "দেশের জন্য কি করলি?" বাণী বার বার জাগিয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এখন ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ঐ এক প্রবল বাসনারূপ দৈব-শক্তি আমাকে সকল বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের সংযোগে আমার প্রথম ধর্ম্মভাবের উদয় নয়, কিন্তু নিজ জীবনের পাপ-মোহ দর্শনে অনুতাপের উদয়েই জীবনের পরিবর্ত্তন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রায় দুইবৎসরকাল অন্যান্য পথ, অন্যান্য মতের

আলোচনা করিয়া শেষ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অধিকাংশ ভাবের সহিত আমার অন্তরের সায় পাই এবং বহু পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান মণ্ডলীর নিকট আমি আধ্যাত্মিকতার জন্য ঋণী। ঐশ্বরীক-তত্ত্ব এবং ঈশ্বর প্রীতির মধ্যদিয়া স্বদেশপ্রীতি, কিম্বা স্বদেশপ্রীতিরূপ বীজ সূত্রে ঈশ্বর প্রীতি আমার প্রাণে জাগে তাহা আজো নিশ্চয় করিতে পারি নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি পরমসৌভাগ্যেই জীবন্ত-ঈশ্বরাদেশ-তত্ত্ব পাইয়াছি, এবং তাহার বিকাশ, নববিধান মণ্ডলী বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের ফলস্বরূপ। স্বদেশের সেবা আমার জীবনের নিয়তি, ইহা আমি ধর্ম্মজীবন আরম্ভের পর ঈশ্বর-বাণীর দ্বারাই প্রাপ্ত হই, একথা—আত্মকথার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি; ইহাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমার স্বদেশপ্রীতি, ধর্ম্মবিশ্বাসের পূর্ব্বে বা পরেই হউক কিন্তু আমার স্বদেশপ্রীতি রক্ষা প্রাপ্ত হইত না, যদি তাহা ঈশ্বরপ্রীতির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পাইত। আমি আমার জন্মভূমি দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকারেই কল্যাণ কামনা করি কিন্তু সে কল্যাণের প্রকৃত সফলতা এক মাত্র অধ্যাত্মিকতার উন্নতির উপরই নির্ভর করে। মানব জীবনের অন্য যে সকল উন্নতি, তাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না, যদি মানুষ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে না পারে। অবশ্য ধর্ম্মজীবন লাভ করা মানুষ একান্ত দুর্ল্লভই মনে করে, আর কার্য্যত তাহাই প্রতিপন্ন হয়, বোধ হয় এই জন্যই মানুষ ধর্ম্ম জীবন লাভে এত নিরাশ। যাহা হউক আমার জীবনের সকল ঘটনার মূলে সেই একই কথা, ভগবানের করুণার কথা ছাড়া আর কোন কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। দাসের আত্ম-কথার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সেই চেষ্টাই করিয়াছি। সে চেষ্টা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, সিদ্ধিদাতাই তাহা জানিতেছেন। আর আমার দেশবাসী বন্ধুগণও যেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

বিবিধ

জাতীয় মহাসমিতি,—একসময় এমন দিন ছিল, যে-দিন জাতীয় মহাসমিতির প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের তেমন আস্থা ছিল না, সংবাদ পত্র দলের মধ্যেও যাঁহারা উহাকে "কঙ্গ-রস" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, সে-কথা সকলের বোধ হয় স্মরণ আছে। তদপরে জাতীয় মহাসমিতির মধ্যে মতভেদ—

ভাবভেদ লইয়া যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে তাহাতেও বহুলোকের মনে উহার মহতোদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। মতভেদ ভাবভেদের পরীক্ষা এখনও যে শেষ হইয়াছে তাহা নহে, তথাপি বলা যায় এবার জাতীয় মহাসমিতি বহুল পরিমাণে লোকের মনে মহদ্ভাবের উদ্দীপনা করিতে পারিয়াছে। আর এক কথা, জাতীয় মহাসমিতির সূচনা কাল হইতে ধীরে ধীরে নানা বিষয়ের উদ্দীপনা হইতেই যে এখন নানা সভা সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এই প্লাবনে যত রকমের আলোচনা হয়—এবার আরও হইয়াছে সমস্ত গুলিই কাজের কথার মতো। ফলত উন্নতি বলিতে গেলে সমাজের সকল অঙ্গের কথাই আসিয়া পড়ে। তাই জাতীয় উন্নতিকল্পে সকল প্রচেষ্টার কথাই উঠিয়াছে। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ এবং আনন্দের কথা তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আর পূর্ব্বে যাঁহারা সভাসমিতির বেশী পক্ষপাতী না হইয়া কাজের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও একদিকে সত্য আছে। সে দিকে দৃষ্টি করিলে আমরা আজো দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা ভাবের দিকে যত অগ্রসর, কাজের দিকে তাহার তুলনায় অতি অল্পই। কেন না আজ যে সকল দ্রব্যের অভাবে আমরা দুর্মূল্যের পীড়নে পীড়িত হইয়াও সে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিবার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না, ইহাতে বুঝা যায় আমাদের কার্য্যকরি-শক্তি কতটুকু। কাগজ, কাপড় ঔষধ যন্ত্রাদির ত কথাই নাই, সামান্য সামান্য কতদ্রব্য—যাহার উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক উপায় বহুল রূপে আমাদের অভ্যাস থাকিলে সে সকল দ্রব্য কিছু দিন পরেও আবিষ্কারের আশা থাকিত কিন্তু কৈ, চাকরীর আশা ছাড়িয়া কয়টা লোকের মস্তিষ্ক সে দিকে যাইতে সক্ষম। তবে আশার কথা এই যে, দেশের মনীষীগণের এবং জন সাধারণের মনে জাতীয় জীবনে আমাদের কি অভাব এই বোধ দিন দিন জাগ্রত হইতেছে। অগ্রে অভাব বোধ, তদপরে তাহার প্রতি বিধান, এই লক্ষণ সমস্ত দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়।

ব্রাহ্মসমাজ ও মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাক্ষাৎভাবে দেশের জন সাধারণের বড় আকর্ষণ দেখা যায় না। বরং বিরোধী-বিদ্রূপকারী খুঁজিলে সহজেই ২।১০ জন পাওয়া যায়। অথচ সেই রাজা রামমোহন রায়ের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের বা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত মৌলিক

ভাবগুলি সমস্ত সমাজদেহের মধ্যে এমন অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহার ফলে আজ বঙ্গ—ভারত—অথবা পৃথিবী আন্দোলিত। এখন যদি কেবল বঙ্গ বা বাঙালী কিম্বা ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীর কথা বলা যায়, তবে এই যে দেশব্যাপী "কনফারেন্স" যাহার মূলে পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়া, সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে একতার বাঁধনে বাঁধিবার এ চেষ্টা, কোথা হইতে আসিল।

প্রদীপ্ত-প্রভাবশালী রাজা রামমোহন দেখিলেন, বেদ, বাইবেল, কোরাণের মূলে একই সুর, কেবল দেশভেদে আকার প্রকার ভেদ হইয়াছে মাত্র, তবে বাঁধিতে পারিলে সে সুর একতানে বাজিবে না কেন; অন্যথা কি বঙ্গ, কি ভারত অথবা পৃথিবীর যে কল্যাণ নাই। তাইত তিনি বাঙালী হইয়া বঙ্গবক্ষে বসিয়া সেই একত্বের সুরে ভেরীনিনাদ করিলেন, সে সুর বৃষ্টলের ভূমিতে গিয়া কিছু কালের জন্য নীরব হইল। কিন্তু সে অগ্নিত নির্ব্বাণ হইবার নয়, সে যে জগত-কল্যাণ সাধনার্থে উদ্দীপিত হইয়াছে। ছিলেন অগ্নি-হোত্রী হইয়া বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তারপরে উদয় হইলেন দেবেন্দ্রনাথ। উপনিষদ মন্ত্রে মন্ত্রিত হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং নাম রসভাসে ঝঙ্কৃত করিয়া ভূমি প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তারপর আসিলেন ব্রাহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র; আবার সেই এককেই বহুরূপে বহুভাবে লীলাময় বিধাতারূপে দেখিয়া একে বহু, বহুতে একের সমন্বয়-বিধান করিয়া জগতে এক সার্ব্বোভৌমিক আদর্শ রাখিয়া গেলেন। এই মহাকার্য্যে অগ্রসর হইয়া যাঁহারা কত পরীক্ষা কত নির্যাতন সহিলেন, তাঁহারা দেশের সর্ব্বজন পূজ্য হইবেন না? তাই বলি ব্রাহ্মসমাজের নামে দেশবাসী এত উদাসীন কেন?

মাঘোৎসব। অনেকে মনে করেন, ১১ই মাঘ একদিন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয় কিন্তু তাহা নয়, এখন মাঘোৎসব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটি মহা মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। ১লা পৌষ হইতে উষাকীর্ত্তন আরম্ভ, ১৫ দিন পূর্ব্বহইতে প্রস্তুতি লইয়া উৎসব শেষপর্য্যন্ত প্রায় দেড়মাসকাল ব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক স্রোত বহিয়া বহু ধর্ম্মপিপাসু আত্মার পক্ষে যেন সম্বৎসরের খোরাক সংস্থাপিত করে। বিরাট সমাজ-দেহে ইহা অনেক-সময় লোক-চক্ষুর অগোচর ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু ব্যাপারটি বড় সহজ নয়। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব আধ্যাত্মিক প্লাবন। ধর্ম্মের ক্ষুধায় ক্ষুধিত এবং তৃষিত ব্যক্তিরাই ধন্য হন!

যে সরকারী লোককে সভাপতি করার ফল।—রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার যশোহর জেলা বোর্ডের সভাপতি হইয়া জেলার সমস্ত স্থানের জঙ্গল কাটাইতে, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইতে ও পচাজল দূরে নিঃসারিত করিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল জল্পনা কল্পনা নয়, কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত কল্যকার কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম পরমানন্দপুর ও পুটিয়া গ্রামে পুষ্করিণী খননের জন্য জমি ক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছে। (সঞ্জীবনী ২৩শে ফাল্গুন)

কুশদহ-সমিতি

কুশদহবাসী মাত্রেই শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইবেন যে, সম্প্রতি কলিকাতায় "কুশদহ সমিতি" নামে কুশদহবাসীগণের একটি সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য,—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় সহরে এবং মফস্বলে অর্থাৎ দেশ বিদেশে অবস্থিত কুশদহবাসীগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় দ্বারা সদ্ভাব এবং প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমবেত ভাবে কুশদহের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই কুশদহ-সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

নানা কারণে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রতিকার করা একাকী কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ম্যালেরিয়াজ্বরে দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যমুনা সংস্কারের চেষ্টায় "যমুনা-সংস্কার সমিতি" গঠন করিয়া ড্রেনেজএ্যাক্ট অনুসারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কত চেষ্টা হইল—দেশবাসীর যতদূর সাধ্য তাহা করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিধি-বিধানের দিকে মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হইল; সকলেই বুঝিলেন যুদ্ধের গোলযোগ থাকিতে আর কোনও আশা নাই। কিন্তু "লোকভঙ্গ নিবারণকারী সেতুস্বরূপ" হইয়া একজন আছেন। তাই এই সঙ্কটকালেও বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের মনে উদয় হইল, "আমি আমার কার্য্যকালে একটি কাজ করিয়া যাইব—যাহাতে বঙ্গের ম্যালেরিয়া দূর হয় তাহার চেষ্টা করিব।" কুশদহবাসীগণ, ইহার মধ্যে কি ভগবানের কৃপা-হস্ত দেখিতে পাইতেছেন না? ধন্য ভগবানের করুণা এমন সময় 'কুশদহ-সমিতির'ও জন্ম হইল!

জন সমাজের মধ্যে অন্তর্জগতের বিষয় হউক বা বহির্জগতের বিষয় হউক যখন কোনও গুরুতর অভাব হয় এবং তাহার স্থায়ীত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে অথচ বিচ্ছিন্নশক্তির দ্বারা তাহার প্রতিবিধান অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন সকলেই অন্তরে অন্তরে কেবল একটি পীড়া অনুভব করিতে থাকেন। তাই বুঝি কুশদহ সমিতিতে যিনি আসিয়া যোগ দিতেছেন তিনিই অনুভব করিতেছেন, কুশদহ সমিতি? এ-যে আমারই ইচ্ছার বিকাশ!

কুশদহবাসীর মধ্যে একটি সমবেত শক্তির উদ্বোধন-চেষ্টা আজ নয় বৎসর কাল "কুশদহ" মাসিকপত্রের ভিতর দিয়া একটি ক্ষীণ-শক্তির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। মনে হয় তাহা কুশদহবাসীর প্রাণে বিন্দুমাত্রও ঝঙ্কৃত হইয়াছে, তাই বুঝি একটি ক্ষুদ্র আশার আলোকরেখা ঐ পূর্ব্ব গগণে দেখা দিয়াছে। ইহাই বুঝি 'কুশদহ-সমিতি' নামে আমাদের সম্মুখে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হে কুশদহবাসীগণ, এক্ষণে ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে বা অযত্নে বিসর্জ্জন দিতে আপনারা পারেন। এ স্বাধীনতা আপনাদের আছে।

কুশদহ-সমিতির জন্মকথা

একদিন প্রাতে বেড়গুম-নিবাসী, কলিকাতা ৩৭ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট প্রবাসী জনৈক মেডিকেল কলেজের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী ছাত্রের নিকট কিছু কার্য্যানুরোধে দ্বিতীয় জনৈক কুশদহবাসী উক্ত কলেজে গমন করেন। কার্য্যান্তে বাহিরে আসিতে আসিতে ইঁহাদের সহিত তৃতীয় আর একটি কুশদহ অঞ্চলবাসী ৫ম বার্ষিকী ছাত্রের সাক্ষাত হয়, ২য় ব্যক্তি ঐ উভয় ছাত্রের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিবার পরমুহূর্ত্তেই, ৩য় ছাত্রটি, ২য় ব্যক্তিকে বলেন, "আপনি তো আমাদের দেশের কুশদহ, আপনি একটি কুশদহ সমিতি করুন না কেন? যাহাতে আমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হইতে পারে।

কুশদহ সম্পাদকের প্রাণে এই রূপ আকাঙ্খা অনেক দিন হইতে জাগিলেও কর্ম্মির অভাবে তিনি এ কাজে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। সুতরাং ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "একাজে খাটিবে কে?" যুবকদ্বয় একযোগে বলেন, "আপনি নিরাশ হইবেন না, একাজে লাগুন, আমরা খাটীব।"

ঐ দিন রাত্রে ৩৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৩।৪ জনের মধ্যে এই বিষয় কথাবার্ত্তা হয়। এই গৃহের বৃদ্ধ গৃহ-স্বামী হইতে যুবক—এমন কি বালক বালিকাদিগেরও নিকট হইতে কুশদহ-সম্পাদক বহুদিন ধরিয়া স্বদেশ-প্রীতির

রসাস্বাদন করিয়া আসিতে ছিলেন, তাই বুঝি এই স্থান হইতেই বিধাতা সমিতির সূচনা করিলেন। কে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিবে? ঐ দিনে স্থির হয় আগামী শনিবার (২৮শে পৌষ) আরো কয়েকটি কুশদহবাসীকে সংবাদ দিয়া সমিতি গঠনের জন্য আমরা এইখানেই মিলিত হইব। তাহার ফলে ৭ জন কুশদহবাসীর উপস্থিতিতে কুশদহ-সমিতির উপরোক্ত উদ্দেশ্য এবং নিম্ন লিখিত আপাতত কয়েকটি নিয়মাবলী স্থির করিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটেই সমিতির কার্য্যালয় এবং যে পর্য্যন্ত অন্য স্থান স্থির না হয় তত দিন প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় এই কার্য্যালয়েই সমিতির অধিবেশন হইবে স্থির হয়।

নিয়মাবলী

১। কুশদহ এবং তদঞ্চলের অধিবাসীগণই এই সমিতির সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবেন। তবে কোন সভ্যের কোনও বন্ধু অথবা কুশদহ হিতৈষী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইচ্ছা করিলে তিনিও এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

২। প্রতেক সভ্যই সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।

৩। প্রত্যেক সভ্য আপন সাধ্যানুসারে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহ এবং ইহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য মাসিক চাঁদা দিবেন।

৪। এই সমিতিতে স্থায়ী সভাপতির পদ থাকার প্রয়োজন দেখা যায় না; প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভাপতি করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করা হইবে। আপাতত একজন সম্পাদক দ্বারাই সকল কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে। সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (বেড়গুম) সম্পাদক নিযুক্ত হন।

৫। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতির সকল নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা অধিকাংশের মতেই সম্পন্ন হইবে।

৬। ৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই সমিতির কার্য্য হইতে পারিবে।

৭। সমিতিতে উপস্থিত হইয়া, অথবা সম্পাদকের নিকট নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলেই কুশদহবাসী মাত্রেই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। ইত্যাদী—ইত্যাদী—

২৮শে পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১০টি অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫টি ৩৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে, ৬ষ্ঠ অধিবেশন,

১।২,হেমচন্দ্র করের লেনে, গৈপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এবং ভ্রাতৃগণের আমন্ত্রণে তাঁহাদের বাটীতে হয়। তদপরে ৪টি অধিবেশন আপার সারকুলার রোড, রামমোহন লাইব্রেরীতে হয়।*

সভাপতিগণের নাম

১ম অধিবেশন,—শ্রীযুক্ত নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি এল (বেড়গুম)
২য় ,, ,, শরতচন্দ্র বন্দ্যো, সাঃ ইনেঃ স্কুঃ (মাটীকোমরা)
৩য় ,, ,, নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (গৈপুর)
৪র্থ ,, ,, নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, (মাটীকোমরা)
৫ম ,, দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু (কুশদহ-সম্পাদক)
৬ষ্ঠ ,, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুর)
৭ম ,, ,, শরতচন্দ্র মিত্র (বালীয়ানি ও নারিকেলডাঙ্গা)
৮ম ,, ,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ (বালীয়ানি ও গড়পার রোড)
৯ম ,, ,, সুরেশচন্দ্র পাল (খাঁটুরা)
১০ম ,, ,, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (তিলক, খুলনা)

৭ জন সভ্য লইয়া সমিতির ১ম অধিবেশন হয়। এক্ষণে সভ্য সংখ্যা ৭৩ জন হইয়াছে। আর যাঁহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আজও নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠান নাই, এমন সংখ্যা ধরিলে বোধ হয় ১০০ এর অধিক হইবে।

প্রথম ৭জন সভ্যের উপস্থিতিতে সমিতির কার্য্যারম্ভ হয়, ঈশ্বর-কৃপায় প্রতিঅধিবেশনে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া রামমোহন লাইব্রেরীতে ৭ম অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ৩৯ জন হয়।

১ম ও ২য় অধিবেশনে সমিতির মঙ্গলকামনা, স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ৩য় অধিবেশনে অনুষ্ঠান পত্র স্থাপান ধার্য্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। ৪র্থ অধিবেশনে কথা হয়, কেবল আলাপ-পরিচয়উদ্দেশ্যে কতদিন সমিতি স্থায়ী হইবে, সমিতির কিছু কাজ চাই! তাহার উত্তরে কুশদহ-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু বলেন, সমিতির সম্মুখে অসংখ্য কাজ আছে কিন্তু কার্য্যকরী শক্তিরই অভাব, অগ্রে সম্মিলন দ্বারা সেই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে এবং শক্তি বৃদ্ধির

* "কুশদহ" বাহির হইতে একমাস বিলম্ব হওয়ায়, মাঘ সংখ্যাতে ফাল্গুনের সংবাদ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হইলাম। (সম্পাদক)

সঙ্গে সঙ্গে কাজও লইতে হইবে। উপস্থিত আমাদের ক্ষমতার এবং মিলিত স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে, এই কল্পে তিনি এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, সমগ্র কুশদহবাসীর বিবরণ সংগ্রহ করা একটি কাজ, খুব ব্যয় সাধ্য নহে কেবল সমবেত চেষ্টাসাধ্য বলিয়াই ইতি পূর্ব্বে তাঁহার মনে "কুশদহ পঞ্জি" প্রকাশের ইচ্ছা যাহা লুপ্ত রহিয়াছে, সমিতি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এই প্রস্তাব সকলের দ্বারাই সমর্থিত হইলেও ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে পরে অলোচিত হইবে স্থির হয়।

৫ম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তাঁহার স্বগ্রাম মাটীকোমরায় একটি স্কুল স্থাপনের জন্য পাঁচহাজার টাকা দান করিয়াছেন এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশনে, গৈপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কেবল কি আলাপ পরিচয়—কিম্বা সমিতি কোনও কাজ করিবেন, এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এবং সে বিষয় ৭ম অধিবেষন পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হয়।

৮ম অধিবেশনে কুশদহসম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয়,—

১। বঙ্গের গভর্ণর মহামান্য লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর বঙ্গের ম্যালেরিয়া দূরী করণার্থে যে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন তজ্জন্য সমবেত কুশদহ সমিতি তাঁহাকে তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

২। তন্মধ্যে যমুনা নদী সংস্কার সম্বন্ধে কুশদহ-সমিতি আংশিক মাত্রও সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে নিবেদন এই যে, কি উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের মিলিতশক্তি এই মহৎকার্য্যের সাহায্য কল্পে নিয়োগ করিতে পারেন তাহা জানিতে পারিলে কৃতজ্ঞ রহিবেন।

৩। সম্পাদক কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের নকল গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

৯ম ও ১০ম অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহ সভা গঠন জন্য বিশেষ আলোচনা হয়, তাহার ফলেই আপতত এই শতাধিক সভ্যের প্রতিনিধি রূপে ৯ জন সভ্যকে ভোটের দ্বারা মনোনীত করিয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহ সভা (একজিকিউটিভ কমিটী) গঠন করা হউক স্থির হয়। তদপরে ২৭ জন ঐ কমিটীর সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে ভোটের দ্বারা নিম্নলিখিত

৯জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহ সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

১ম ভোট। দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু (কুশদহ সম্পাদক)
২য় " নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল (মাটীকোমরা)
৩য় " দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুর)
৪র্থ " পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (গৈপুর)
৫ম " নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি এল্ (বেড়গুম)
৬ষ্ঠ " শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় (বসুমতি সম্পাদক, গোবরডাঙ্গা)।
৭ম " নারায়ণচন্দ্র ঘোষ (বালিয়ানি)
৮ম " শরতচন্দ্র মিত্র (বালিয়ানি)
৯ম " কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় (বেড়গুম)

হে সমগ্র কুশদহবাসী, আপনারা একণে সমিতিকে রক্ষা এবং কার্য্যকারি শক্তিতে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রত্যেকের কি কর্ত্তব্য এবং দায়ীত্ব আছে তাহা কি চিন্তা করিবেন না? আসুন সকলেই স্বাধীনভাবে আপন আপন মত ও ভাবের দ্বারা সমিতিকে নিজের জিনিস জ্ঞানে অর্থ সামর্থ নিয়োগ করিয়া ইহাকে শক্তিশালী ও কার্য্যকরি করিতে চেষ্টা করুন। আর নীরব থাকিবেন না।

বনগাঁয় গভর্ণর

(প্রাপ্ত)

বিগত ৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার, আমাদের কুশদহবাসীগণের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন যমুনা সংস্কার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করার জন্য আমাদের লোকপ্রিয় লাট সাহেব স্বয়ং যমুনার অবস্থা দেখিয়া বনগাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইহার পর লাট ভবনে সভা করিয়া যমুনা তীরবর্ত্তী গ্রামগুলির জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া সহৃদয় লাট সাহেব যমুনাসংস্কার দ্বারা ম্যালেরিয়া নাশের ব্যবস্থা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুশদহবাসী সকলেই তাঁহার নিকট এজন্য চিরঋণী। প্রজার কষ্ট নিবারণে যে তিনি ঐকান্তিকী চেষ্টা করিতেছেন, অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া স্বয়ং ধ্বংস-প্রাপ্ত গ্রাম সমূহের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন ইহাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ভগবানের কৃপায় তাঁহার সাধু-অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক।

ঐ দিবস লাটসাহেব বনগাঁয় পদার্পণ করিলে তত্রত্য স্কুলের বালকেরা এই শুভাগমন উপলক্ষে ছুটী পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়। একটি সাত বৎসর বয়স্ক বালক একখানি আবেদনপত্র সহ লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি অতিশয় দয়া দেখাইয়া বালকের হস্ত হইতে আবেদন পত্র পাঠ করিলেন। তদনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল কতদূর" স্কুল অতি নিকট শুনিয়া তিনি স্কুল দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া হেডমাষ্টার; চারু বাবু (কুশদহ নিবাসী) ভাবিয়া অস্থির হইলেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। ঘরের ছাদ নাই। প্রাঙ্গণে ইষ্টকাদি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমস্তই অগোছালো—এলোমেলো। কিন্তু ভাবিবার চিন্তিবার সময় নাই। সংবাদ প্রাপ্তির পাঁচ মিনিট মধ্যে স্বয়ং লাট সাহেব যাইয়া স্কুলে উপস্থিত হইলেন। তিনি এমন সদয় ব্যবহার করিলেন। এমন সহৃদয়তা দেখাইলেন যে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বৃদ্ধ হেড-মাষ্টারের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। লাট সাহেব যখন শুনিলেন যে, অর্থাভাবে স্কুলের ছাদ হইতেছে না, তখন সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা দিলেন। তাঁহার দয়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রায়, সাত হাজার টাকা সাহায্য পাইবার আদেশ হইয়াছে। এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ অর্দ্ধেক টাকা ইতিমধ্যে পাইছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। ভগবান সহৃদয় লাট সাহেবের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বিধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
(বনগাঁ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র)

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ।

এবার বিধাতার বিধানে যমুনা-সংস্কারের যেমন ব্যবস্থা আসিয়াছে, তেমন জঙ্গল পরিষ্কারের অনুকূলে এক দৈবঘটনা দেখা যাইতেছে। কয়লার অভাবে কাঠের প্রয়োজনে অনেকেই পুরাতন বাগানের আগাছা—এমন কি ২।৪ টা আম কাঠালের গাছও কাটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যদি আরও কিছু দিন এই রূপ কয়লার অভাব থাকে, তবে বোধ হয় দেশের জঙ্গল পরিষ্কার সহজেই হইয়া আসিবে। গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীও নাকি এজন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক এবার ৩টিই শুভ সংবাদ; ১ম, যমুনা সংস্কারের ব্যবস্থা, ২য়, "কুশদহ সমিতি" প্রতিষ্ঠার সংবাদ, ৩য় জঙ্গল পরিষ্কারের সূচনা। আশা করি দেশবাসী সকলেই অবস্থানুযায়ী জঙ্গল পরিষ্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং কুশদহ সমিতিতে যোগ দিবেন।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দণ্ডীবর পালের সাংঘাতিক মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহাঁর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি কিছু দিন হইতে বধির হইয়াছিলেন। ১১ই পৌষ বুধবার অপরাহ্নে ইনি গোবরডাঙ্গা ষ্টেসনের দক্ষিণ দিকে রেল লাইনের উপর দিয়া আসিতেছিলেন,ঐ সময় ট্রেণ আসিয়া পড়ে। তাহার ধাক্কায় গুরুতর আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি খাঁটুরার পালবংশীয়, এবং গোবর-ডাঙ্গার সুবিখ্যাত পরলোকগত হারাণচন্দ্র কুণ্ডুর দৌহিত্র। তাঁহার জীবনে পরধনে নির্লোভতা—সত্যবাদীতা সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল, এই জন্যই আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পত্রস্থ করিলাম। করুণাময় ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ এবং তাঁহার দুঃখিনী বিধবা কন্যাটির প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সেজোবাবু—জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঈশ্বর-কৃপায় পূর্ব্ববৎ সচ্ছন্দ-স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহার জীবনের প্রধান, অথবা প্রিয়তম কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি এবার আসাম অঞ্চলে শীকারে গিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ১৬ই ফাল্গুন স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের তিরোধান সাম্বৎসরিক উপলক্ষে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা,তদপরে ২৫, ২৬ শে ফাল্গুন শনি রবিবারে যথারিতি মন্দিরেরও উৎসব হইয়াছে।

গৈপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রকৃষ্ণের শুভ বিবাহানুষ্ঠানে, "কুশদহ" পত্রের সাহায্যার্থে ২৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে, ভগবান্ নব দম্পতির মঙ্গল বিধান করুন।

বিশেষদ্রষ্টব্য—ছাপাখানার কার্য্যতৎপরতার অভাবে, সময়ের অল্পতা বশত এবার "কুশদহ" পৌষ, মাঘ একত্রে বাহির করিতে হইল। ফাল্গুন, চৈত্রও একত্রে বাহির হইবে। যাহাতে ৩০ চৈত্রের মধ্যে বাহির হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কুশদহ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

জ্ঞানবিস্তার

সদ্ভাবসঞ্চার চরিত্রগঠন

নবম বর্ষ | ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩২৪ | ১১শ,১২শ সংখ্যা

বর্ষ শেষে

ঈশ্বর-কৃপায় "কুশদহ"র আর একটি বৎসর গত হইল। নানা বাধা-বিঘ্ন ভ্রম-ত্রুটী স্বত্বেও যে, নয় বৎসর 'কুশদহ' প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে একমাত্র সেই পরম কারুণিক হস্তের আনুকূল্যতা না পাইলে 'কুশদহ'র জীবনরক্ষা কখনই সম্ভবপর হইত না। ইহাতে সম্পাদক চিরকৃতজ্ঞ—চির উপকৃত, কারণ "কুশদহ" তাঁহার নিকট সেই কৃপার নিদর্শন স্বরূপেই নিয়ত প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাকে দেশবাসী প্রায় সে দৃষ্টিতে দেখেন না, অনেক সময় অনেকের নিকট মানবীয় ক্ষমতার প্রশংসাবাদই শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য সম্পাদকের বিনীত নিবেদন, সকলে যদি 'দাসের' মধ্যে প্রভুর মহিমা সন্দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিজ নিজ জীবনের কর্ম্মেও তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য এবং সফল হইবেন।

দ্বিতীয় কথা,—অনিবার্য্য কারণে এবং ভ্রম বশত সম্পাদন-কার্য্যে বৃদ্ধ সম্পাদকের অনেক সময় ত্রুটী ঘটে, তাহা সরলভাবে স্বীকার না করিবার কোনও কারণ নাই। ভরসা করি গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সে ত্রুটীতে ক্ষুণ্ণ হইয়া সম্পাদকের উদ্দেশ্যের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইবেন না। যে কৃপায় 'কুশদহ'র জন্ম, সেই কৃপাতেই ইহার পোষণ এবং স্থিতি, আবার সেই কৃপাতেই কুশদহ-বাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

হে জগত-জননী, তুমি কুশদহবাসীরও জননী, তদুপরি তব কৃপারই জয় হউক। আগামী বর্ষের জন্য আবার নববল—নবোদ্যম সঞ্চার করো। তব শ্রীপাদপদ্মে দাসের এই ভিক্ষা।

আহ্বান

—•—

লও বীণা বাঁধ সুর—
তোলো, তোলো তান নব ঝঙ্কার
নব চেতনায়, বাজুক সবার
হৃদয়ে হৃদয়ে নবীন স্ফূর্ত্তার
অবসাদ হোক্ দূর।

লও বীণা বাঁধ সুর—
ঘুচুক দীনতা, জড়তা ঘুচুক
মোহ নাগ-পাশ নিমেষে টুটুক
নবীন প্রভাতে সবাই জাগুক্
নব ভাবে ভরপুর।

এস, ভাই, এস বোন,
উদার সুনীল আকাশের তলে
হও গো মিলিত সবে দলে দলে
মুক্ত বাতাসে বাঁচহ সকলে
ছাড়িয়া ঘরের কোণ।

ঐ শোন বাজে ভেরী,
আহ্বান-ধ্বনি উঠিছে গগণে
রণিছে সে তান নিখিল ভুবনে
কাঁপিছে সে সুর ঐ যে পবনে
কেন আর মিছে দেরী।

নব জীবনের পথে
চলিব আমরা সকল যাত্রী

আশ্বাস-বাণী, অভয় দাত্রী
উচ্চারিবেন জগৎ ধাত্রী,
ডরিব না কোনো মতে।

সব বাধা সব ভয়,
সব ব্যর্থতা দলিয়া চরণে
স্মরিয়া সর্ব্ব দুঃখ-হরণে
বুকের উপরে বাঁধিয়া মরণে
তাহারে করিব জয়।

এস সবে আগুসারি,
কালিকার তরে রেখোনাকো কাজ
যা কিছু করিবে সুরু কর আজ
লও ত্বরা পরি যাত্রার সাজ
এস নর, এস নারী।

সব সংশয় দুঃখ,
আশার আলোকে মিলাবে কোথায়
আহ্বান-গীত ঐ শোনা যায়
যতেক যাত্রী এস পায় পায়
আশ্বাসে ভরি বুক।

লও বীণা বাঁধ সুর,
সবার হৃদয়-তন্ত্রীর তার
সমস্বর যোগে দিক্ ঝঙ্কার
ঘুচুক নিমেষে অবসাদ ভার
জড়তা হউক দূর।

শ্রীসরসীবালা বসু।

ম্যালেরিয়ায় গবর্ণর

মাননীয় বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় কলিকাতায় তাঁহার কাউন্সিল-ভবনে নদীয়া, যশোহর ও চব্বিশপরগণার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সমূহের মেম্বরগণকে ও কতিপয় জমিদার এবং সেনিটারীবোর্ডের মেম্বরগণকে আহ্বান করিয়া বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া মনে হয় ব্যাধিপ্রপীড়িত বঙ্গবাসীর দুর্দশা দেখিয়া তিনি সত্যই ব্যাকুল হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি কয়েক রকমেই গুরুতর ব্যাধি আছে। তিনি আপাতত সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ম্যালেরিয়াকেই ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, —"এখানে আসিবার পর আমি এদেশের ব্যাধি সমূহের প্রকোপের যে ভীষণ কাহিনী শুনিয়াছি তাহাতেই আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে, এবং তখনই স্থির করিয়াছি যে, আমার শাসনকালের মধ্যে এদেশের ব্যাধি নিবারণ কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিব। অল্পকাল মধ্যেই আমি ব্যাধিসমূহের কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা অতীব ভয়ানক! প্রতিবৎসর এই বঙ্গদেশ হইতে সাড়েতিনলক্ষ, চারিলক্ষ লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় মারা পড়িতেছে। যেখানে একজন মারা পড়িতেছে সেখানে একশত জন ব্যারামে ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইতেছে। * * * ইহার ফলে জন্ম সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। শত শত লোক ওলাউঠায় মরিতেছে, সহস্র সহস্র লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে, উৎসাহ উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, শিল্প বানিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে গুরুতর বাধা পড়িতেছে; এই সমস্ত কারণে দেশের লোক দিন দিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে।" এই ভাবে তিনি ভূমিকা করিয়া কিরূপে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌দের রিপোর্ট হইতে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়া, যশোহর এবং চব্বিশপরগণাই ইদানীং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিধ্বস্ত হইতেছে। এজন্ত তিনি সেই তিন জেলাতেই প্রথমত তিনটি খাল কাটাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে

ডায়মণ্ডহারবারে একটা খাল কাটাইয়া সেখানকার প্রায় তিনশত বর্গমাইল পরিমাণ স্থানের বিশেষ উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। উহাতে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই খাল কাটানর পর ঐ স্থানের শুধু স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে এমন নহে জমিগুলিতে যথারীতি চাষ চলিতেছে এবং প্রথম বৎসরেই তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৬৷৷০ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী ফসল জন্মিয়াছে। খাল কাটাইতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে সুদে আসলে তাহা শোধ করিবার জন্য ঐ স্থানের অধিবাসীদিগকে প্রতি একর (এদেশের ৵১০ গণ্ডার অধিক) জমিতে বার্ষিক মাত্র ৷৷৵০ নয় আনা করিয়া কর দিতে হইতেছে, তাহাও ৩০ বৎসরের জন্য।

নদীয়া, যশোহর এবং চব্বিশপরগণায় সেই প্রণালীই অনুসৃত হইবে। নদীয়ায় যমুনা কাটাইতে ৮ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রায় ৩৫০ বর্গমাইল স্থানের উপকার হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা দিবেন। বাকী টাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড যোগাইবে। যশোহরে আরুণ বিলের খাল কাটাইতে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে তাহাতে ৫৩০ বর্গমাইল স্থান উপকৃত হইবে। গবর্ণমেণ্ট সেখানে ৭৷৷০ লক্ষ টাকা দিবেন। চব্বিশপরগণায় নাউয়িসুটি খালে ১০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবেন।

লাট মহোদয় বলেন, "আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি ঐকান্তিক ভাবে এই কার্য্যে হস্তপেক্ষ করিয়াছি। শুধু ঐ কয়টি কার্য্য নহে, আমি ম্যালেরিয়া দমনের জন্য আরো নানা উপায় চিন্তা করিতেছি। সেই সমস্ত কার্য্যে পরিণত করিতে যাহা ব্যয় লাগে সরকারী তহবিল হইতেই তাহা দেওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত হরিহর, বালীবিল, ভৈরব, ধুনিয়া প্রভৃতি কাটাইবার ব্যবস্থা হইবে। হিংলাজ সিংগ্রাম জঙ্গীপুর নবাবগঞ্জ ফরিদপুর ও ইদিলপুর প্রভৃতি স্থানেও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কার্য্যারম্ভ হইবে। তজ্জন্য সরস্বতী, বড়গাছিয়া, ছাপরাবিল, প্রভৃতি কাটাইবার ব্যবস্থা হইবে।

অবশেষে দেশবাসীর দায়ীত্ব সম্বন্ধে লাট মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহা সমর্থন করি। তিনি বলেন, যে কাজ যে স্থানের লোকের উপকারের জন্য হইবে তাহার ব্যয় সেই স্থানের লোকেরই দেওয়া উচিত। সমগ্র প্রদেশের লোকের অর্থ হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সঙ্গত নহে।

এই বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার কি আছে? বরং আমাদের বিশ্বাস লাট মহোদয়ের এই বাক্যে দেশবাসী সকলেই প্রাণপণে সায় দিবেন।

বঙ্গবাসীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য বঙ্গের শাসনকর্তা আজ যেরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন, প্রাণ খুলিয়া দেশবাসীকে তাঁহার সহিত যোগদেওয়ার জন্য আহ্বান করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় তাঁহার ভিতর যেন ঐশী-প্রেরণা আসিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি যে শুধু ম্যালেরিয়ার কথা ভাবিতেছেন এমন নহে, এদেশের লোক যে বিবিধ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছে তাহা হইতে এদেশবাসীকে রক্ষা করাই তাঁহার লক্ষ্য। সুবিজ্ঞ সহযোগী "অমৃতবাজার পত্রিকা" বলিয়াছেন, একার্য্য সহজ সাধ্য নহে, সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না, বহু কোটী টাকার প্রয়োজন। দেশবাসী ঘোর দরিদ্র, অতটাকা কোথায় পাইবে? সহযোগী "ইংলিশম্যান" লিখিয়াছেন—What is wanted is driving power, and LORD RONALDSHAY will earn the gratitude of millions if he can impart some of hiown enthusiasm to the local authorities." আসল কথা এইখানেই। লাট মহোদয় ত ইচ্ছা করিতেছেন—আজই কার্য্যারম্ভ হৌক্, দেশবাসী অচিরে রোগমুক্ত হৌক্, তাহাদের অর্থব্যয় স্বার্থক হৌক্। প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলসাধন যাঁহাদের কামনা তাঁহারা এইরূপ মহোচ্চ সঙ্কল্প লইয়াই ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তাদের দোষে। পরন্তু যিনি ঐরূপ সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, তিনি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলে তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার লক্ষ্য ঠিক তাঁহার ন্যায় থাকে না—এমন কি অনেক সময় একেবারে পরিবর্ত্তীত হইয়া যায়। ভারতে ব্রিটিশশাসনের এই একটি মারাত্মক ত্রুটি আমরা অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি। শাসনকর্ত্তাদের পরিবর্ত্তন ও তাঁহাদের পলিসি পরিবর্ত্তনের যেমন সুফল ফলে, তেমন কুফলও আছে, এদেশবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় কুটাই ইহাদের ভাগ্যে বেশী ফলে। এইজন্য আমরা মাননীয় গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় সমীপে বিনিতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যে শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই কার্য্যে দেশের সকলেই তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, সুতরাং তাহা সুসম্পাদিত করিতে যেন বিলম্ব না ঘটে, কর্ম্মক্ষেত্রের—অর্থাৎ প্রত্যেক জেলার কর্ম্মকর্ত্তাকে তেমন ভাবে আদেশ করুন। (ত্রিপুরা-হিঃ হইতে গৃহীত)

কুশদহের ইতিহাস

যোগী——পুরাণে যুগী জাতির উল্লেখ আছে। শব্দকল্পদ্রুমে যুগীকে বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলা হইয়াছে। গঙ্গাপুত্রের কন্যার গর্ভে বেশধারীর ঔরসে যুগীর উৎপত্তি। প্রচলিত নাম জুগী। কিন্তু জুগীরা বল্লাল চরিত হইতে দেখাইয়া থাকেন যে, জুগী ও পুরাণোক্ত যুগী পৃথক জাতি। বাংলা ভিন্ন অন্যান্য দেশেও জুগীর বসতি আছে। সে সকল স্থানে তাহারা যোগী নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে বেদবিহিত দশবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। গোরখপুর অঞ্চলের যোগীগণ গৈরিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, রক্ত চন্দনের কৌঁটা ধারণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যোগী একটি জাতি নহে, একটি সম্প্রদায় মাত্র। যোগীদের নিজ গ্রন্থ বৃহৎ যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাদেব হইতে আটজন সিদ্ধের জন্ম হয়। তাঁহারা যোগবলে সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, দেবাদিদেব তাঁহাদের পরীক্ষা করার জন্য আটটী যোগিনীর সৃষ্টি করিয়া সিদ্ধগণকে প্রলুব্ধ করেন। সিদ্ধ ও যোগিনীগণের সংসর্গে যে সন্তান জন্মিয়াছিল তাহারা যথাক্রমে কণফট্, অঘোর, মৎস্যেন্দ্র, শারঙ্গীহার, কর্ণপা, ডরীহার, সংযোগী ও ভর্ত্তৃহরি নামে পরিচিত। এই আটজনের সন্তানেরা মাস্যযোগী সম্প্রদায়ভুক্ত।

আর একটী প্রবাদ এই যে, কাশীর কোন সন্ন্যাসী বা অবধূত, সন্তান জন্মাইতে অভিলাষী হইয়া একটী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে এক পুত্র এবং একটী বৈশ্যকন্যার গর্ভে অপর একটী পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত পুত্রেরা একাদশীযোগী ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্রেরা মাস্যযোগী নামে পরিচিত হয়। একাদশীযোগীরা বৃহৎ শাতাতপীয় হইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়া থাকেন যে, কোন সময় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নারদকে ডাকিয়া বলেন, পুণ্যক্ষেত্র কাশীর নিকটে অনেক ব্রাহ্মণবিধবা ও বিধবা বৈশ্যা, নাথ সম্প্রদায়ের অবধূতগণের সংসর্গে অনেক পুত্র কন্যার জননী হইয়াছে। এবং চরকায় সুতা কাটিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহাদের বর্ণ নির্ণয় করিবার জন্য নারদ, সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কাশীতে আগমন করেন এবং অবধূতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানগণের শিব

গোত্র ও একাদশ দিবস অশৌচ হইবে। বৈশ্য গর্ভজাত সন্তানগণের উপাধি নাথ ও এক মাস অশৌচ, হইবে। দেহান্তে শবের মুখাগ্নি করিয়া সমাহিত করিতে হইবে। একাদশী যোগীরা নাথ যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও উপবীত ধারণ করে নাই।

মহারুদ্রের ঔরসে সূর্য্যাবতীর গর্ভে বিন্দুনাথের জন্ম। রাজকন্যা সূর্য্যাবতী নর্মদাতীরে কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনা করিলে বিন্দুনাথের জন্ম হয়। এই বিন্দুনাথ হইতে নাথ বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মীননাথ ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই বংশে জন্মিয়াছিলেন। বিন্দুনাথ কশ্যপ ঋষির সুরভি বা কৃষ্ণা নাম্নী কন্যার গর্ভে মীননাথ প্রভৃতি ১৬টী পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের মধ্যে ৬ জন গৃহস্থ হইয়াছিলেন। মীননাথ সংসারে নিতান্ত জড়িত হইয়া পড়িলে তদীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন—ভক্তমালে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠযোগীগণ সংসার ত্যাগের পর সন্ন্যাস অথবা অবধুত অবস্থায় কামিনী কাঞ্চনে পুনরাসক্ত হওয়াতেই যে নাথযোগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি তাহা যোগীদিগের স্বকথিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।

রঙ্গপুরে যোগীরা রাজা গোপীচন্দ্রের গীত গান করিয়া থাকে। গোপীচন্দ্র সাধারণতঃ গবাচন্দ্র নামে পরিচিত। তাঁহার মন্ত্রীর নাম হবাচন্দ্র। বোধ হয় গোপীচন্দ্রের সময়ে যোগীগণের রাজদরবারে প্রভুত্ব ছিল। তাঁহারা হয়ত রাজা গোপীচন্দ্রের উপদেষ্টাও ছিলেন। সম্ভবত উক্ত রাজার পতনের সহিত তাহাদের সামাজিক অবনতি ঘটিয়া আসিল। পূর্ব্ববঙ্গে যোগীরা কৃষিকার্য্য করে। স্বর্ণকারের কাজও করে। চাকরীও করে। কুশদহে যোগীগণের বস্ত্র বয়ণ প্রধান ব্যবসায় ছিল। কিন্তু ১২৯০ সালে উপবীত গ্রহণের সময় হইতে তাহারা শিল্প কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তাহাদিগকে বস্ত্রের ও অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিতে দেখা যায়।

নুলা পঞ্চানন যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে যোগী একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। সকল শ্রেণীর লোক আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাতে প্রবিষ্ট হইত। পরে কদাচার জন্য মর্য্যাদার হানি হইলে লোকসমাজে যোগীগণ নিন্দিত হইয়াছিল।

"যোগভ্রষ্ট যোগী যদি যোগী নাম ধরে।
মৃৎশিলা কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহ অজাগরে॥

লোকে ডরাত ভয়ে কম্পিত অন্তরে।
ডরাণ দূরে থাকুক, হাসে নিরন্তরে ॥
যোগ ভ্রষ্ট যোগীর নাম যে বান্তাশী।
মলবৎ ত্যক্ত বস্তুর যে হয় প্রত্যাশী ॥
সংসার বিষ্ঠা সম জ্ঞানেতে যে ত্যজে।
পুন যে অমৃত ভেবে সুখে তাতে মজে ॥
সে যে স্বর্গ হতে হঠে নরকেতে পড়ে।
উচ্চ হতে নীচে পড়িলে দুনা ব্যথা বাড়ে।
সংসার ত্যাগী হয় সদা সর্ব্বভক্ষক।
তাতে উচ্চ নীচ জাতি না থাকে লক্ষক ॥
তার কাছে সুখ দুঃখ সম হয় জ্ঞান।
পুনঃ সংসারে আসে কি সে হয়ে অজ্ঞান ॥
তত্ত্বজ্ঞান ত্যজি জুগী ইন্দ্রিয় নিরত।
অশেষ পাতকে পাপী মনে অসংযত ॥
এই হেতু পুত্র কন্যা করে নীচবৃত্তি।
ডোম চণ্ডালের মত তাদের কুকীর্ত্তি ॥
কু আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপর দেখে।
জাতি ভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ বলে শাস্ত্রেতে লেখে ॥
নামে মাত্র যোগী সে কাজেতে ভৈরব।

*   *   *   *   *

তাই কেহ জুগীর দ্বিজত্ব নাহি গণে।
কর্ণফট ওড়ংঘট কালিস্পাদি জনে।
আগম পুরাণ তন্ত্রে সন্ধান না পান।
অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জুগী চতুর্থেতে রন ॥

পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, এখন যোগীগণের মধ্যে সদাচার প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে হেয় মনে করা নিতান্ত ভ্রম। এখন তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখা আবশ্যক। সদাচারের সহিত বিনয় ও নম্রতায় সর্ব্বত্র আদর পাওয়া উচিত।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (বি এ)

জন্মোৎসব

প্রথম দৃশ্য

বন পথ, নদী তীর।

করতলে কপোল রাখিয়া বসুন্ধরা উপবিষ্টা।

বসু। হা অদৃষ্ট,আর যে সহ্য হয় না,সমগ্র মানবজাতির এ শোচনীয় অবস্থা আর যে দেখতে পারি না। জননী, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার প্রতিমা কোরে আমায় গড়ে ছিলে, তাই কি মা আজ পরীক্ষা কোরছ? তা হোলে মা আমাকে পরাজয় মানতে হোচ্ছে, আর পারি না মা, বুকের বাঁধন যে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ধ্বংশ ও আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। এ কি বসুন্ধরা দিদি যে, কাঁদছ না কি দিদি? ইস্, চোখ ফুলে যে রাঙ্গা জবাফুল হয়েছে, কি হয়েছে দিদি, তোমায় কেউ কি মেরেছে না অপমান কোরেছে? মায়ের কাছে বুঝি নালিস কোরতে এসেছ?

ধ্বংশ। কাঁদছ কেন দিদি? কোন দুষ্ট লোক তোমায় কষ্ট দিয়েছে? কারা, একবার নাম কোরে দাও দেখি, তাদের সবংশে নির্ম্মূল কোরে দিয়ে আসি। (ক্রোধভরে পাদচারনা)

বসু। ভাই আনন্দ, ভাই ধ্বংশ, তোদের কাছে বোলে কোনো লাভ নেই, আমি মার কাছেই যাচ্ছি।

ধ্বংশ। ক্যান দিদি, তোমার কি বিশ্বাস হোচ্ছে না? আমাদের দ্বারা কিছু প্রতীকার হবে না? দিদি তুমি আজও এই ছোট ভাইটী কে চিনতে পার নি?

বসু। ওরে পাগল তোকে কি আর চিনিনে? তুই যে বড় ক্রোধী, তোকে বোলে আমি আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসি।

আনন্দ। তা মিথ্যে না, ধ্বংশ বড় দুষ্টু, না দিদি? আর ও বড় নিষ্ঠুর। মা কিন্তু তবু ওকে ভালবাসেন। মা ওকে সর্ব্বদাই কাছে রাখেন। অবশ্য, মার বিচার করা আমাদের উচিৎ নয়।

সুখের প্রবেশ

সুখ। কেন করা উচিৎ নয়? এক শ বার করা উচিৎ, মায়ের আমরা সবাই ছেলে, ভালবাসার সবাই সমান ভাগীদার, মা কিন্তু সব চাইতে যে চুড়ান্ত দুষ্ট সেই ধ্বংশকেই খুব ভালবাসেন, অসংখ্য তার প্রমাণ আছে।

আনন্দ। ভাই সুখ তাতে আর দুঃখ কি? ও তো আমাদেরই ভাই, যাক্ ধ্বংশকে ঘাঁটিয়ে কাজ কি, ও যে হ্যাঙ্গামে ছেলে, এখুনি মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ কোরবে।

সুখ। ইস্ তাতে তো আমার বড় ভয়, ছিঁচকাঁদুনের গালে দুই চড় লাগাতে কি আমি পেছপাও যে—

(সুখকে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ধ্বংশের বেগে পলায়ন)

বসু। নিজের জ্বালায় মরছি, আবার তোদের এই হাঙ্গামায় পড়্লুম। তোর তো গায়ে এক কড়ার ক্ষমতা নেই, আবার ওর সঙ্গে লাগতে যাস ক্যান, ভাই, ওঠ্ এখন ওঠ্।

সুখ। (উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) আমার জামা কাপড়ে সব ধূলো লেগে গেল, আমি এর শোধ নেব, আমার ভাল ভাল পোষাক একেবারে মাটী কোরে দিলে।

আনন্দ। আচ্ছা ভাই সুখ,সত্যি কোরে বলদেখি, তোর গায়ে যে ব্যথা লেগেছে তার চাইতে পোষাকে ধূলো লাগাতে তোর বেশী কষ্ট হোচ্ছে, না? আচ্ছা বাবু হয়েছিস কিন্তু।

সুখ। তা তোমার মতো ধূলো কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে চাষার মতন আমি থাকতে পারি না, (বসুন্ধরার প্রতি) চল দিদি, মায়ের কাছে এখুনি বিচার হবে, ধ্বংসকে আমি সাজা দেওয়াবই।

বসু। ধ্বংশকে বেশী ঘাঁটাসনি। আর তোর ঐ কাঁদুনীই সার, ভাগিস মুখের জোর আছে তাতেই রক্ষে, সে কিন্তু দস্যি ছেলে—নালিস সালিসের তোয়াক্কা রাখে না, বাগে পেলেই ঠুকে দেবে। তার পাছে লাগতে যাসনি বলছি।

সুখ। এই আমি চল্লুম দেখছি তার দস্যিপনা। এতো আর তোমার পৃথিবীর ব্যাপার নয় দিদি, মায়ের কাছে ন্যায্য বিচারই হবে, নইলে তুমিই বা কাঁদতে কাঁদতে নালিস কোরতে এসেছ কেন?

বসু। তা ঠিক। আয় তবে, মায়ের কাছেই যাই।

(বসুন্ধরা ও সুখ হাত ধরা ধরি করিয়া গাহিতে গাহিতে গমন)

চল চল ভাই মার কাছে যাই।
মরম বেদনা, প্রাণের যাতনা,
মায়ের চরণে চল জানাই।

মায়ের সন্তান, সবাই সমান
যার কাছে নাই ভেদা ভেদ জ্ঞান,
যার স্নেহ-ধারা, অমৃতের পারা,
জুড়াইতে জ্বালা ঝরিছে সদাই।
অতি চমৎকার মায়ের বিচার,
সব সন্তানের সম অধিকার,
করুণা-রূপিনী স্নেহ-নির্ঝরিণী,
স্মরিলেও কত আরাম পাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রত্ন সিংহাসনে জননী আসীনা, ক্রোড়ে শিশু বিধান। মাতার চারিদিকে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য, সত্য, মৃত্যু, ধ্বংস প্রভৃতি সন্তানগণ)

সত্য। মা, ধ্বংস নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করে এসেছে, মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

প্রেম। ছেলে মানুষ, ও আমাদের কত ছোট, ওর নামে কি কিছু বলা উচিত? এতে মারও মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

জ্ঞান। সে কথা বোলো না প্রেম, ও যদি অন্যায় করে তার শাসন কোরতে হবে না? নইলে যে ও আরও উচ্ছৃঙ্খল হোয়ে উঠবে? ছোট বোলে কি দুষ্টুমির বা অন্যায়ের একটা মাপকাটী নেই?

সত্য। ঠিক বলেছ দাদা, ঐ দেখ সুখ কাঁদতে কাঁদতে আসছে, ঠিক হয়েছে, ওকে বুঝি মার ধোর কোরে পালিয়ে এসেছে, ওর গা ময় ধূলো লেগেছে কত।

বসুন্ধরা, আনন্দ ও সুখের প্রবেশ

সুখ। এইবার মায়ের কোলের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো হয়েছে। শোন মা, তোমায় ঠিক্ ঠিক্ বিচার কোরতে হবে—সবাই সাক্ষী আছে, ধ্বংস শুধু শুধু আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলো, দিদি দেখেছেন, আনন্দ দাদা দেখেছেন, এঁদের জিজ্ঞেস করো।

সত্য। হ্যাঁ মা, ও বড় বাড়িয়ে তুলেছে, আজ ওকে শাস্তি দাও, নইলে ভবিষ্যতে বড় অনর্থ বাধাবে।

জননী। ধ্বংশ, তুমি সুখকে মেরেছ, ফেলে দিয়েছ?

ধ্বংশ। (নত মুখে) হ্যাঁ মা।

জননী। অপরাধ স্বীকার কোরছো?

ধ্বংশ। হ্যাঁ।

জননী। শাস্তি পাবে জান?

(ধ্বংশ চুপ করিয়া রহিল)

জননী। তিন দিন আমার কাছে এসো না।

সুখ। শুধু ঐ শাস্তি মা? তাতে আর ওর ক্ষতি কি? কেবল ঘুরে ঘুরে ফড়িং ধোরে বেড়াবে, তার চেয়ে ও আমায় যেমন মেরেছে, তেমনি মা তুমি আমায় হুকুম দাও, আমিও দু'ঘা পিটিয়ে দিই।

বৈরাগ্য। সুখ, তুমিও চঞ্চলের চূড়ান্ত, তুমি মায়ের বিচার দাঁড়িয়েই দেখ না? না, তোমার আর দেরি সয় না। ভাই ধ্বংশ, তুমি মা'র খেতে রাজী আছ?

ধ্বংশ। (সানন্দে) খুব রাজী আছি, কে মারবে বড় দা, তুমি, না সুখ?

জননী। কেউ মারবে না তোমায়, আমি যে শাস্তি বিধান করেছি তাই বজায় থাকবে। তুমি এখন যেতে পারো। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধ্বংশের প্রস্থান)

জননী। বৎসগণ, আমি জানি, তোমরা আমার স্নেহের প্রতি কটাক্ষ করো, হা অবোধগণ, তোমাদের দোষ নেই, স্নেহের ধর্ম্মই এই। ধ্বংশ আমার দুরন্ত অশান্ত, সব জানি, সেই জন্যেই ওকে আমি চোখে চোখে রাখি, তাতেই সর্ব্বদা ওর খোঁজ নিই। আমাকে ও কতটা ভালবাসে তা তোমরা জান কি? আমার কাছে তিন দিন আসতে পারবে না এ কথা ওর প্রাণে কতখানি বেজেছে তা তোমরা বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি তা বুঝছি, সন্তানের মনের কোন কথাই মায়ের অগোচর থাকে না।

বসুন্ধরা। (জননীর চরণে প্রণাম করিয়া) মা গো, তবে এ অভাগিনীর দুঃখ কষ্টের কথাও তো তোমার অগোচর নেই, আর কতদিন এ যাতনা সহ্য করি মা, আবার যে পাপের ভরা পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো, মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন নেই, হৃদয়ের যোগ নেই, জাতিতে জাতিতে—ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ। অবিশ্বাস অনিয়ম আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ কোরে দিয়েছে, মানুষের মধ্যে সাধুভাব বিলুপ্ত হোয়ে গেছে, ধর্ম্ম জিনিষটা লোকের আর নিত্যকার জীবন-ধারণোপযোগী নেই, একটা বিলাসের সামগ্রী, বাহিরের ভড়ং হোয়ে দাঁড়িয়েছে, নরনারীর এ পাপের ভার আমার যে আর সহ্য হয় না, প্রেম, আনন্দ, সত্য

ভক্তি এরাও আর আমায় দেখতে যায় না, দিদিকে যেন সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু মা যে মেয়েকে ভূলে আছেন, সেইটেই যে সব চাইতে আশ্চর্য্য !

জননী। বসুন্ধরা, কাতরা হোয়োনা, সবই বুঝতে পেরেছি, সবই জানতে পেরিছি, কেবল তোমার মুখে এ অভিযোগ শোনবার অপেক্ষাতেই ছিলুম ; তোমার কাছে এবার কারে পাঠাবো তাই আজ ক'দিন থেকে ভাবছি, পাঠানো যে অপরিহার্য্য এটা নিশ্চয়। (ক্রোড়স্থ শিশুর প্রতি) বিধান, বাপ্ আমার।

"মা"

জননী। তোমায় এবার পৃথিবীতে যেতে হবে, যেতে পারবেত বাপ।

বিধান। খুব পারবো মা, তুমি আমায় ছেড়ে দেবে ?

জননী। দেবো বৈ কি ধন, পৃথিবীর নর নারী, তারাও যে আমার সন্তান, তারা তোমার মধ্যে আমার সাড়া পেয়ে, আবার ভাল হোতে চেষ্টা কোরবে, আবার তাদের মধ্যে সাধুভাব জেগে উঠ্‌বে। তোমার কপালে আমার স্নেহের চুমার তিলক পরিয়ে দিচ্ছি, আমার আশীর্ব্বাদ তোমার গলায় জয়মাল্য হোক, তুমি বসুন্ধরার সঙ্গে যাও যাদুমণি। মা, বসুন্ধরা, আমার কোলের ধনকে তোমার বুকে দিলাম, চির নির্ম্মল, চির সুন্দর পবিত্র শিশু, আবার এমনি ভাবে একে ফিরিয়ে এনে দিও ; আমার আঁচলের মাণিক, আমার সর্ব্বস্বনিধিকে যত্ন কোরে রেখো, যেন এতটুকু ব্যথা লাগে না।

বসু। মায়াময়ী, লীলাময়ী তোমার মহিমা আজও বুঝলাম না, কি অপরূপ তোমার এ করুণা বিগলিত মাতৃমূর্ত্তি, কত রূপে কত খেলাই দেখাচ্ছ দেবি। তুমিত সন্তানের সঙ্গে সঙ্গেই থাকো, তবে আবার তোমার বিচ্ছেদাশঙ্কা কেন মা ? এও কি একটা খেলা ? অন্তর্যামিনী আর কিছু তোমার বুঝলাম না, শুধু এই টুকু বুঝলাম, এই টুকু জানলাম, তুমি একটা বিরাট শান্তি, বিরাট আনন্দের প্রতি মূর্ত্তি, জগজ্জননী, তবে বিধান কে ফুলের মালায় সাজিয়ে দাও, নিয়ে যাই।

সকলের গীত

এস, সবে সাজিয়ে দি ভাই বিধান রতনে।
ও ভাই পরম যতনে,
মায়ের গোপাল স্নেহের দুলাল,
মনের মতনে ;
সাজিয়ে দি ভাই সাধ মিটায়ে বিধান রতনে,
ও ভাই পরম যতনে।

তৃতীয় দৃশ্য

বালকগণ

মৃত্যু। কে বড় ? আমিই বড়, বড় দা, তুমি বিচার করো।

জ্ঞান। অহঙ্কার রাখ, তোর নামে লোক চমকে ওঠে, আবার বলে আমি বড় ! সে কথা আমি বরং বলতে পারি; আমায় না পেলে মানুষের জীবন বৃথা।

সত্য। আমায় না পেলে আরও বৃথা, সেটাও ভেবে দেখো।

প্রেম। তা হোলে ভাই আমাকেই বড় বলতে হয়। আমি যার কাছে নেই তার জীবন শুষ্ক মরুভূমি তুল্য।

ভক্তি। সে বরং আমি।

সুখ। আমাকে বাদ দিতে চাও নাকি, তাহোলে সব ফাঁকি।

ধ্বংশ। (সুখকে লক্ষ্য করিয়া) এ হিংসুটে টা সবেই আছে, তোকে পোঁছে কে ?

বৈরাগ্য। চুপ কর ধ্বংশ, গণ্ডগোল বাধাসনি বলছি।

জননীর প্রবেশ

বৈরাগ্য। মা, আজ আমারা বিষম সমস্যায় পড়েছি। ছেলের দল, এ বলে আমি বড়, ও বলে আমি বড়, আমায় মধ্যস্থ মেনেছে, আমি বিচার কোরতে এসে আবার দেখছি, আমিই বা সবার বড় নই কেন ? এখন মা তুমি স্বয়ং এসেছ, এ গোল মিটাও।

জননী। বৎসগণ, ও রকম অভিমান মনের মধ্যে হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তবে একটি কথা তোমাদের আমি ভাল কোরে বোঝাতে চেষ্ট করবো, তোমরা মন দিয়ে শোনো, যদি এই মুহূর্ত্তেই তা ভাল কোরে না বুঝতে পারো তাতেও ক্ষুব্ধ বা নিরাশ হোয়ো না, সময়ে বুঝতে পারবে। তোমরা সবাই আমার সন্তান, একদিন তোমরা সকলেই আমার প্রাণের মধ্যে, আমার শোণিত-কণিকায় মিশিয়ে ছিলে, আমারই ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে তোমরা বাহিরে বিশ্বের আলোকে এসে দাঁড়িয়েছ, মূলে তোমরা সবাই এক ; কেউ ছোট কেউ বড় নয়, সকলেই সমান—আমার সমান স্নেহের ধন। তোমরা একপ্রাণ হোয়ে নিজের নিজের কাজ করো, তাহোলেই আমি সুখী হবো। বাহিরে স্বতন্ত্রতা থাকলেও তোমাদের ভিতরে যেন নিগূঢ় যোগ অটুট থাকে। বৎসগণ, এই বিশাল বিশ্বে, কিছু বৃথা নয়, কিছু ছোট নয়,

সবই একটা অখণ্ড আনন্দে পরিপূর্ণ, সবই এক বিশাল প্রাণের অভিব্যক্তি। একে অন্যকে ফোটাবার জন্য—বিশুদ্ধ করবার জন্যই প্রত্যেকের প্রয়োজন।

(বালকগণ জননীর চরণে প্রণত হইল)

বৈরাগ্য। আশীর্ব্বাদ করো মা, তোমার আশীর্ব্বাদই আমাদের মিলন-ভূমি।

কর্ম্ম, সেবা, মৈত্রী ও করুণার প্রবেশ

কর্ম্ম। কই মা, এরা তো কেউ আমার কাছে যায় নি, আমায় মা তুমি ভুলে থাকো, তাই আমার কপালে তোমার সঙ্গলাভ ঘটে না, আর এরা সবাই তোমার সঙ্গে কেমন আনন্দে রয়েছে।

জননী। ঐ ভ্রম দূর করে দাও বৎস, এদের চাইতে তোমার আনন্দ কিছু মাত্র কম নেই, তোমায় যে কাজে পাঠায়েছি, সেই কাজের মধ্যেই তুমি পরমানন্দ ভোগ কোরবে—যদি তা সর্ব্বদা সুসম্পন্ন করবার চেষ্টা করো। কি মা, সেবা, মৈত্রী, করুণা, তোমাদের কিছু অভাব অভিযোগ আছে ?

সেবা। কিছু না মা, শুধু একবার মায়ের চরণ দেখতে এসেছি।

মৈত্রী। সঙ্কল্প দিদি বলে দিয়েছেন, আমাদের ছোট ভাই বিধানকে পাঠায়ে মা যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন, সব ভাই বোনদেরও পাঠিয়ে দিবেন, তাহা হোলে সকলের সঙ্গে থেকে বিধানের আর কোনও কষ্ট হবে না।

সত্য। মা, পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর স্থান, বিধান অতি সুকুমার, তাকে সেখানে কেন পাঠালে মা ? আমার তো বড় ভয় হয়, মানুষ মানুষের প্রতি সেখানে কত অত্যাচার, কত নির্য্যাতন করে, তোমার সন্তানদের কথা স্মরণ কোরে দেখো মা, তোমার বাধ্য পুত্র যিশুর প্রতি কি ভীষণ অত্যাচার কোরে ছিল ; কেউ যে অত্যাচারের হাত হোতে নিস্তার পায় নি।

জননী। কিন্তু বৎস, ভেবে দেখ, সেই যাতনা, সেই অত্যাচার অনন্ত জীবনের পথে কি একদিন পূর্ণ পূজার অর্ঘ্যে পরিণত হয় নি ? প্রবাসে গিয়ে যদি দু'চার দিন দুঃখ কষ্ট কেউ পায়, মায়ের ঘরে ফিরে এসে সে যে কতখানি আদর কত স্নেহ ভোগ করে। যাও বৎসগণ, তোমরা সবাই পৃথিবীতে গিয়ে সকলে বিধানের সঙ্গী হও, যে কার্য্যের জন্য শিশু বিধানকে পাঠিয়েছি, সে কার্য্য সকলে মিলে সফল কোরে এসো। কন্যাগণ, তোমরাও আমার বড় স্নেহের পাত্রী, তোমাদের অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, যাও তোমরা সকল ভাইদের সঙ্গে মিশে, পৃথিবীর নর নারীকে সুপথে

নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো। বিরোধ, বিদ্বেষ কেউ মনেরমধ্যে পোষণ কোরো না, এই আমার আদেশ।

(হাত ধরা ধরি করিয়া সকলে গাহিতে লাগিল)

আমরা সবাই মায়ের ছেলে, কেউ ছোট না, কেউ বড় না,
মায়ের স্নেহে সবাই সুখী, কারো মনে নাই কোনও বেদনা।
মায়ের কাজে ধরার বুকে, বরণ কোরে দুঃখে সুখে,
রইব মোরা, রেষা রেষি মনের কোণে ঠাঁই দেব না।
মায়ের আশীষ সবার শিরে, ঘুচিয়ে দেবে সব ভাবনা।

চতুর্থ দৃশ্য

বসুন্ধরা ও জননী

বসু। মা, যখন এসেছ, আমার এতদিনকার মনের কোণে সঞ্চিত সব কালি মুছে গেল। এখন আমার এই প্রার্থনা জননী, তুমি একবার শিশু বিধানকে কোলে নিয়ে বোসো, দেবলোকবাসী, নরলোকবাসী সবারি চক্ষু সার্থক হোক। সকলেই মা, বড় আশা কোরে এ মহান্ দৃশ্য দেখবার জন্য উৎসুক হোয়ে আছে, সবার আশা সার্থক করো মা। তোমার বিধান তোমারি বুকে ছিল, কে তার সংবাদ জেনেছিল? আজ যদি দয়া কোরে বিশ্বের মাঝখানে, তাকে পাঠিয়ে দিয়েছ, তা হোলে তার জন্মোৎসব দেখে, সবাই ধন্য হোক, ঐ দেখো মা, আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর তরু লতা, স্থল, জল, ব্যোম সবারই মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে, একটা নূতন উৎসাহে, নূতন আনন্দে সবাই ভোরপুর হয়ে উঠেছে।

জননী। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হোক্, তোমাদের হাসি মুখ দেখলেই আমার সুখ।

(বিধানকে লইয়া বালক বালিকাগণের প্রবেশ, জননী বিধানকে কোলে লইয়া বসিলেন। কাঁশার ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজিয়া উঠিল)

সকলের গীত

"এস সবে করি শিশু মুখ দরশন।
যার জনম দিনে হ'ল এ মহামিলন।
শিশু হাসে যার কোলে, বিশ্ব নাচে তালে তালে—

* * * * *

রায়বাহাদুর

ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় *

চব্বিশপরগণা—বসিরহাট ও বারাশাত মহকুমার নিকট ভেবলা গ্রামে মুখোপাধ্যায় পরিবারে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর (ভাদ্র মাসে) ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়,মাতার নাম শান্তদেবী। পোনের মাস বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়,তখন হইতে তিনি পিসিমাতার নিকট প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বাল্যকালে কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভাই যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকিয়া বর্দ্ধমান ও ভবানীপুরে উচ্চ-শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন এবং ভবানীপুর হইতেই প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে অতিশয় কঠিন পরিশ্রম করিয়া পড়িতে থাকেন। আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। জ্যেষ্ঠতাত ভাই মাসে সাতটি টাকা দিতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে এক মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। পরিধেয় একখানা ধুতি ও উড়ানী মাত্র ছিল, জুতা ছিল না; অধিক বস্ত্র ছিল না যে ধোপায় দিবেন, নিজহস্তে সাবান দিয়া কাপড় ধৌত করিয়া লইতেন। গৃহে আলো জ্বালিবার পয়সার সংস্থান ছিল না, অনেক সময় রাস্তার গ্যাসের আলোকে পাঠ করিতেন; পুস্তক ক্রয়ের অর্থসংস্থান হইত না, সমপাঠী ছাত্রদের বই নকল করিয়া লইতেন। জল খাবার এক পয়সার মুড়ি কিম্বা কলা দ্বারা সম্পন্ন হইত। প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল-রূপে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মাসিক সতের টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। মার্টিন কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ স্যার আর, এন্, মুখার্জী মহোদয় মতিবাবুর খুল্লতাত, প্রায় এক বয়সী, এক সময়ে উভয়ে কলিকাতার মেসে একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তখন তাঁহারও একান্ত অর্থকষ্ট ছিল।

মতিবাবু মেডিকালকলেজে পঠদ্দশায় ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করেন।

---

* গৃহ-স্বসাধক মতিবাবুর জীবনী "কুশদহে" প্রকাশের ১ম কারণ,-বারাশাত বসীরহাট কুশদহ-সংশ্লিষ্ট। ২য়,—এমন বৃহৎ পরিবারের পদস্থ অধিনায়ক—সাধক-সাধু ব্যক্তির চরিত পাঠে যদি কুশদহ-বাসী একজনও প্রীতি এবং উপকার বোধ করেন, তবুও সার্থক হইবে। (সম্পাদক)

তখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইয়াছে. দলে দলে যুবকগণ সেখানে উপাসনায় যোগদান করিতেন। মতিবাবু খুড়াকে লইয়া উপাসনায় যাইতেন এবং একাগ্র মনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশাদি শ্রবণ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে এতটা অগ্রসর হইলেন যে, অল্প দিনের মধ্যে পৈতা ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে হিন্দু পিতা ও আত্মীয়গণ অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার দাদা খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। নানারূপ উৎপীড়নের মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবন গড়িতে লাগিল। সেই সময় অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে পড়িয়া বৃত্তিলাভ করেন। মতিবাবু নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন, কিন্তু সকলের পশ্চাতে বসিতেন, সাম্নে বসিয়া লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেন না। তিনি অতি প্রিয়দর্শন যুবা পুরুষ ছিলেন, ভাই কান্তিচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কান্তিচন্দ্রের সঙ্গে মন্দিরেই তাঁহার পরিচয় হয় এবং একটা প্রেমের বন্ধন হয়, যাহা পরবর্ত্তী জীবনে আরো অতি সুদৃঢ় ও মিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মেসে স্বর্গগত রামব্রহ্ম সান্ন্যাল প্রভৃতির সহিত একত্র থাকিতেন।

পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ অধ্যয়ন করিয়া মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রথমতঃ শিয়ালদহ মেডিকাল স্কুলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশ করেন। এই সময় কলিকাতায় পরিবার লইয়া আসেন এবং তাঁহাদের প্রথম সন্তান শ্রীমতী মনোরমার জন্ম হয়। তাহার কয়েক মাস পর চট্টগ্রামে বদলী হইয়া যান, চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশে, ভয়ানক কলেরা এপিডেমিক হইয়াছিল, তিনি সেখানেই নিয়োজিত হন, তৎপর চট্টগ্রাম সদরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন এবং প্রায় নয় বৎসর কাল সেখানে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করেন।

সেখানে অবস্থিতি কালে প্রতিদিন প্রত্যুষে সস্ত্রীক একত্র উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। চট্টগ্রাম হইতে মজঃফরপুর, কুমিল্লা ও দ্বারভাঙ্গায় বদলী হন। দ্বারভাঙ্গায় স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। বিদ্যাশিক্ষার্থ জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কলিকাতায় স্যার্ আর, এন্, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে কিছুদিন রাখা হইয়াছিল। এই সময়ে মতিবাবুর পিতা এবং আত্মীয়বর্গ হিন্দুমতে মেয়ের বিবাহ দিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না।

তিনি দ্বারভাঙ্গা হইতে বালেশ্বরে বদলী হন। তথায় স্বর্গীয় ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। বালেশ্বর হইতে কলিকাতা কাশীপুর হাসপাতালে বদলী হন। এখানে আসিয়া স্বর্গীয় ভাই গিরিশচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ এবং কান্তিচন্দ্র প্রভৃতি প্রচারক মহাশয়গণের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার পরিবারে নবসংহিতা অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে থাকে। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মনোরমার সঙ্গে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতমোহনের (ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপল) বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। মতিবাবুও বিধাতার বিশেষ ইঙ্গিতে এই পরিণত বয়সে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

কাশীপুর হইতে পালামোয়ে সিবিল সার্জ্জন হইয়া যান। সেই পদেই সিংভূম, রঙ্গপুর, ছাপরা, হাতোয়া, বক্সার, খুলনা ও বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কতিপয় বৎসর কর্ম্ম করেন এবং শেষোক্ত স্থান হইতেই পেন্‌সন লইয়া গভর্ণমেণ্ট কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপর কলিকাতা আসিয়া কাশীপুরে বাস করিতেছিলেন। সে অঞ্চলে বহু লোক তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনার্থ বহু নরনারী কাশীপুরস্থ শ্মশানে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

তিনি দারিদ্র্যে জীবন আরম্ভ করিয়া, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন ও আশ্রিতজনগণকে যেন স্বচ্ছন্দ অবস্থায় রাখিতে পারেন. সে সঙ্কল্প শেষ জীবন পর্য্যন্ত সাধন করিয়াছেন। তাঁহার চারিটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আছেন, তাঁহাদিগকে সহোদরের ন্যায় পালন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

ঈশ্বরে ও পরলোকে তাঁহার বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল ছিল, স্বভাবত তিনি সদানন্দপুরুষ ছিলেন, তাঁহাতে বিষণ্ণতা দৃষ্ট হইত না। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের সঙ্গেই মিশিতে পারিতেন। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন সেখানে কথাবার্ত্তায়, হাস্য পরিহাসে সকলকে আমোদিত করিয়া তুলিতেন। সর্ব্বজনে প্রেমবিস্তার তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রেমকেই জগতের সার বস্তু বলিয়া জানিতেন। পুত্র কন্যাদিগকেও উপদেশ "দিতেন, তোমরা সকলকে ভাল বাসিবে। মানুষকে যদি ভাল বাসিতে পার তোমাদের কোনও অমঙ্গল হইবে না।" তাঁহার সরল স্বাভাবিক ভালবাসায় সকলেই সন্তুষ্ট হইত। সর্ব্বদাই সাধু জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধুজনের প্রতি অতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি

প্রচারভাণ্ডারে নিয়মিত—শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাযুক্ত ভাবে দান করিতেন,তাঁহার দানের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যতকাল বিদেশে ছিলেন, মণিঅর্ডার যোগে ঠিক সময় দানটি পাঠাইয়া দিতেন ; যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, মাসের প্রথম ভাগে স্বয়ং প্রচারকার্য্যালয়ে আগমনপূর্ব্বক দানের টাকা দিয়া যাইতেন। এতদ্ব্যতীত গৃহে যখন যে কোনও শুভানুষ্ঠান হইত, তাহাতেই যথেষ্ট দান করিতেন।

সহধর্ম্মিণী, সাতটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা ও একুশটী পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া প্রায় সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে গত ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার, তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। প্রায় পোনের বৎসরকাল তিনি দারুণ বহুমূত্র পীড়ায় ভুগিয়াছেন। নিজে ডাক্তার — অতি সাবধানে থাকিতেন বলিয়া এ পীড়া তাঁহাকে এতকাল তত কাহিল করিতে পারে নাই। গত জানুয়ারীর শেষভাগে ঘাড়ে অতি সঙ্কটজনক স্থানে একটি ব্রণ হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মতিবাবুর দেহ অতি দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু এবার পীড়া আক্রমণের তিন চারি দিন পরেই তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ তাঁহার পীড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন, এবার রক্ষা পাওয়া কঠিন ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিজেও বিলক্ষণ বুঝিলেন, সুতরাং বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দুইবার অস্ত্র করা হয়, প্রথম বার সামান্য ক্লোরাফরম সহযোগে কাটা হয়, দ্বিতীয় বার বিনা ক্লোরাফরমেই অস্ত্র করা হয়। অত্যন্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগের ক্লেশ বহন করেন, তদ্দর্শনে ডাক্তারগণও আশ্চর্য্যান্বিত হন। ডাক্তার ব্রাউন, জে, এন্, দাস গুপ্ত, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, বিধানচন্দ্র রায়, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, এস্, এন্, রায়, অমরনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি উপযুক্ত চিকিৎসকগণ অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য চিকিৎসকগণও মাঝে মাঝে দেখিয়াছেন। চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা যতদূর হইতে পারে তাহা করা হইয়াছে। তাঁহার ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ডাক্তারগণ সদ্য নরশোণিত তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; পিতাকে না জানিতে দিয়া পুত্রেরা স্ব স্ব দেহ হইতে রক্ত দান করিয়া আশ্চর্য্য পিতৃভক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। পুত্রেরা চারিজন উপযুক্ত হইয়া বিষয়কর্ম্ম ও বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছেন, কন্যারা সকলেই যোগ্যপাত্রে বিবাহিতা হইয়াছেন। মতিবাবু তাঁহার সমবিশ্বাসী

মণ্ডলী এবং পরিবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের যে সাধু দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, তাহা আরো উজ্জ্বল হৌক; ভগবান্ স্বর্গগত আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর লোকে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি বর্ষণ করুন।

(ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে গৃহীত)

কুশদহ সমিতির উদ্দেশ্য কি ?*

এই সমিতির গত অধিবেশনে যখন আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন একটা কথা উঠিয়াছিল—এই সমিতির উদ্দেশ্য কি ? যদিও সমিতির প্রচারিত অনুষ্ঠানপত্রে উদ্দেশ্যের একটু আভাষ দেওয়া আছে বটে কিন্তু তথাপি একথা অকুণ্ঠিত ভাবেই বলা যায় যে, এটুকুতে কাহারও মন উঠিতে পারে না। তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য্য যে. সামান্য অনুষ্ঠান পত্রে ইহার অধিকও প্রকাশ করা যায় না। এ জন্য ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইতি মধ্যে সমিতির সংগঠনকারীগণের আর একটু খুলিয়া বলা উচিত ছিল এবং তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই কাযটি করেন নাই বলিয়াই সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বাভাবিকই নানা পারপ্রশ্ন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

আমিও ইহার অন্যান্য সভ্যগণেরই মত নিতান্ত আমন্ত্রিত ভাবে ও পরম আগ্রহভরে এই সমিতির খাতায় নিজের নাম লিখাইয়াছি! কিন্তু তাহার পরে যখন বুঝিলাম সমিতির অনুষ্ঠাতৃগণ ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজেদের মত না চালাইয়া অন্যের পরামর্শ গ্রহণেচ্ছুক তখন এতৎ সম্বন্ধে আমি নিজে যতটুকু বুঝি তাহাই এখানে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমি এই সময় বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যাহা বলিব, তাহা আমার একটা ধারণা মাত্র এবং তাহা সর্ব্বথা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল ভাবে সর্ব্বভৌম সত্যভূমিক নাও হইতে পারে। তবে যাহা বুঝিয়াছি তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেইটুকু বিচারের জন্যই আজ আমি আপনাদের নিকট—আমার এই দীন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি।

সমিতি কোন্ বস্তু ?

আমার প্রথম কথা হইতেছে সমিতি কোন্ বস্তু এইটী নির্ণয় করা। শব্দ শাস্ত্র বলেন—"সম্" পূর্ব্বক "ই" ধাতু অধিকরণ বাচ্যে "ক্তি" প্রত্যয় করিলে

---

* কুশদহ সমিতির ৭ম অধিবেশনে বেড়গুম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায় পঠিত প্রবন্ধ

"সমিতি" পদ নিস্পন্ন হয়। 'সম্' উপসর্গটী এ স্থলে—'সমান, 'ঐক্য,' বা 'সহিত' প্রভৃতি অর্থের প্রকাশক। আর 'ই' ধাতুর অর্থ 'গতি'। সুতরাং এই শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে—যে আধারে বা আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়া লোকে সম প্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির জন্য একই লক্ষের প্রতি সমান ছন্দে, সমান কর্ম্ম-স্পন্দনে জীবনপথে অগ্রসর হয় তাহার নাম "সমিতি" বা "সমাজ"। এই সমাজ শব্দের 'অজ' ধাতুর অর্থও 'গতি'। সমিতি ও সমাজ উভয়ই একার্থ বাচক। এই সমিতি বা সমাজের ব্যক্তি বা ব্যষ্টি মাত্রেই সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য ব্যষ্টিবর্গের আশ্রিত—ইহারা অন্যোন্যাশ্রয়ী। কেহ সেবা, কেহ অর্থ, কেহ শক্তি, কেহ জ্ঞান দিয়া পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে গিয়াই এই সমিতি বা সমাজের পুষ্টি ও স্থিতি সম্পাদিত হয়।

এখন দ্বিতীয় কথা হইতেছে যে—এই সমপ্রয়োজন বা সমানার্থটী কি? ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন বা সমাবর্ত্তন নামক যে একটী ক্রিয়া নির্ব্বাহের বিধি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহার মন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে,প্রাচীন ভারতের আচার্য্যদিগকে ঐ সময়ে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাকে সাক্ষী মানিয়া বলিতে হইত, হে অগ্নি, হে বায়ু, তোমরা সাক্ষী আমি আমার কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমার নিকট আনীত এই শিক্ষার্থীর শিক্ষাকার্য্য আমি যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছি। এই শিক্ষার্থীকে সেই শিক্ষাই দিয়াছি যাহাতে ভবিষ্যতে সে সংসারে যশ, মানসিক তেজ, ব্রহ্মজ্ঞান, দৈহিক স্বাস্থ্য ও বল, প্রতিষ্ঠা বীর্য্য ও অন্নভোগ্যাদির প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারিবে।

এই মন্ত্রার্থ ধরিয়া অতি সহজেই বুঝা যায় যে,—যে যশ, যে তেজ, যে ব্রহ্মবর্চ্চস, যে বল, যে প্রতিষ্ঠা, যে বীর্য্য ও যে অন্নভোগাদির প্রাচুর্য্য লাভ করিবার জন্য প্রাচীনভারত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, যাহা আজও জগতের কাম্যবস্তু, যাহা পূর্ব্বে আমাদের দেশ ও সমাজকে তৃপ্ত করিত, আর আজ যাহার অভাব আমরা নিয়ত অনুভব করিয়া ক্রমাগতই সকল রকমে দুঃখী ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছি, তাহাই, যে কোন সমাজ বা সমিতির সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ। কাজেই এখন একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, যে চেষ্টা দ্বারা আবার আমরা আমাদের লুপ্ত যশ, তেজ, বল, প্রতিষ্ঠাদি লাভ করিতে পারি,সেই চেষ্টায় আমাদের সকলের সমবেত শক্তি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এইরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলিলেই তো আর কায মিটে না! তাই যাহা করিলে কায মিটে তাহার প্রাথমিক ভাবে অনুষ্ঠেয় কোন্‌গুলি তাহাই আমি বলিতেছি। বিশেষ অনুষ্ঠেয়গুলি তো এখন বলা চলে না। হাতে কলমে কায করিতে করিতে আমরা যেখানে যেখানে ঠেকিব ও ঠকিব সেইখানে সেইখানে তদুপযুক্ত ভাবেই আমাদের অনুষ্ঠানকে নিয়মিত করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে শুধু গোড়া পত্তনের হিসাবে কায চালাইয়া যাইতে হইবে। কর্ম্মের সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ চিরকালই আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকে বলিয়াই তাহার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোন ফলই হইবে না। তাই একটা লক্ষ্যস্থির করিয়া প্রাথমিক ভাবে আমাদের কর্ম্ম সুরু করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। নতুবা শুধু ফাঁকা প্রীতির শিথিল বাঁধন * আমাদের জীবনের স্বার্থময় প্রবাহকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। এখন কর্ম্মের বাঁধন দিয়াই আমাদের সমাজের ব্যষ্টিগুলিকে বাঁধিয়া দৃঢ় সমষ্টিতে পরিণত করিতে হইবে। এই যদি হয় তবেই শুভ নতুবা বাক্যের সমিতি বড় বেশী দিন টিকিবে বলিয়া কেহ কোন দিন ভরসা করিতে পারে না।

"কুশদহ-সমিতির" কার্য্য সৌকার্য্যার্থে কয়েকটি প্রস্তাব

১। "কুশদহ" নামক জনপদের সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ।

২। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলার এমন এক খানি মিলিত মানচিত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক যাহাতে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও নাম পাওয়া যায়। তার পর তাহাতে লাল রেখা টানিয়া কুশদহের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সীমা—নির্দ্দিষ্ট মানচিত্রাংশের ——"কুশদহের মানচিত্র" এই নাম করণ পূর্ব্বক——লিথো করাইয়া প্রত্যেক সভ্যকে এক এক খানি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

৩। কুশদহে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি গ্রাম আছে তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়া নিম্ন লিখিত বর্ণনামতে যথাক্রমে (ক), (খ), (গ) ইত্যাদিরূপে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করাও প্রয়োজন।

৪। কোন্ গ্রামে কি উপায়ে কার্য্য করিলে তাহাদের প্রকৃত ও আপততঃ বলবৎ অভাবগুলি সহজে অপসারিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামের নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ সংগ্রহ করা উচিৎ:

* প্রীতির বন্ধন কখনই 'ফাঁকা' 'শিথিল' নহে, তাহা অতি দৃঢ় সূত্র। সর্ব্বাগ্রে সেই সূত্র-বন্ধন আবশ্যক। (সম্পাদক)

(ক) গ্রামে কয় ঘর লোকের বাস, প্রত্যেক গৃহস্থের নাম, জাতি ও বর্ণ কি, তাহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা কত, সংসার চলে কেমন করিয়া, অর্থাগমের উপায় কি, যে অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহাতে সংবৎসরের মোটাভাত মোটা কাপড়ের জন্য অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় কি না ইত্যাদি।

(খ) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার গোত্র, গাঁই, মেল, কৌলিন্য (স্বভাব বা ভঙ্গ, ভঙ্গ হইলে কয় পুরুষ, বংশজ, বা শ্রোত্রিয় কাহার সন্তান প্রভৃতি জ্ঞাতব্য। কারণ বিবাহ ব্যাপার আমাদের সমাজে যেরূপ প্রাণঘাতী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই বিবরণী সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সভ্যদের মধ্যে পাল্টাঘর নির্দ্দেশ করিয়া পণপ্রথার প্রশমনের চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

(গ) গ্রামে উত্তমর্ণ বা মহাজন কয় জন। এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সমিতি আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। যাহারা ঝুড়ি কোদাল লইতে পারে তাহারা জীবন সংগ্রামে ততটা মরে না—যতটা মরে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী, তাই ইহাদের বাঁচাইবার জন্য এমন একটা উপায় করা চাই যাহাতে "সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না"। আমার মনে হয়, ৩৪ খানা গ্রাম লইয়া এক একটা Limited Credit Society (ঋণ দান ফণ্ড) প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অংশ গুলি মাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ করিয়া বিক্রয় করিলে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে। এই উপায়ে মধ্যবিত্তের (যাহার এমন ৫।৭ টা Societyতে কিছু কিছু অংশ থাকিবে) অন্ততঃ সম্বৎসরের তেল নুনের খরচাটারও সঙ্কুলান হইবে। এই Soceity গুলির অংশ দুই রকম করিতে পারিলে ভাল হয়, (১) অর্থ সংজ্ঞক (২) ধান্য সংজ্ঞক। তাহা হইলেই বাংলার পল্লীসমাজে ইহা চলিবে নতুবা চলিবে না।

(ঘ) গ্রামের খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য কয় বিঘা ধান হয়। অন্যান্য ফসলই বা কি পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং কোন গৃহ শিল্প অদ্যাপিও জীবিত আছে কি না।

(ঙ) গ্রামে পানীয় জলের অবস্থা কি রূপ, কয়টা পুষ্করিণী ও তাহার জলের তৃষ্ণা নিবারণ যোগ্যতা থাকিলেও পান-যোগ্যতা আছে কি না।

(চ) গ্রাম বর্ষান্তে প্রকৃষ্টভাবে শুষ্ক হইবার অবসর পায় কি না। অর্থাৎ জঙ্গলাদির অবস্থা ও পরিমাণ কিরূপ।

(ছ) গ্রামের রাস্তা ও পথের সংখ্যা ও তাহাদের দৈর্ঘ্যাদির পরিমাণ কত,

তাহার কোন্ গুলি District Board, Local Board or Village Union এর অধীন।

(জ) গ্রামে হাট বাজার প্রভৃতি আছে কি না— থাকিলে প্রত্যহ হয় ? না, কোনও বিশেষ বিশেষ বারে হয়। বারের নাম না থাকিলে কত দূরে হাট করিতে যাইতে হয়।

(ঝ) গ্রামে কোন্ ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ; এই ব্যাধি বৎসরের কোন্ সময়ে বিশেষ মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

(ঞ) গ্রামে ডাক্তার বৈদ্য বা ডাক্তারখানা (ব্যক্তিগত বা দাতব্য) প্রভৃতি আছে কি না। যদি না থাকে কত দূরে কোন্ গ্রাম হইতে ডাক্তার বা ঔষধ আনিতে হয়।

(ট) গ্রামে পাঠশালা বা নৈশবিদ্যালয় আছে কি না।

(ঠ) গ্রামে কোন্ কোন্ সংবাদ পত্র গৃহীত হয়।

(ড) গোচারণ ভূমি আছে কি না।

(ঢ) গ্রামে একটা "শাখা সমিতি" স্থাপন করা চলে কি না ইত্যাদি।

এই সকল বিবরণ অনুসারে কাজ করিলে আমাদের শক্তির অপব্যয় হইতে পারিবে না।

আমাদের শাস্ত্রে আছে দেব পূজার ফুল বিল্বপত্রাদি নিজ হাতেই সংগ্রহ করিতে হয়—ইহা না করিলে পূজার ফল লাভ করা যায় না। কথাটা বড়ই খাঁটী। আমারও মনে হয় এই সকল বিবরণের জন্য সরকারী দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ও নিজেদের দেশের প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখিয়া তাহার অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নিজেদেরই চেষ্টা করা উচিত। পাড়া প্রতিবেশীর অবস্থা নিজের চোখে না দেখিয়া যদি Govt. চোখ দিয়া দেখিতে হয় তবে তাহার অপেক্ষা শোচনীয় মানসিক দুর্ব্বলতা খুব কমই আছে। তবে আমাদের বিবরণী পরে Govt. বিবরণীর সহিত মিলাইয়া দেখিলে, ভাল বই মন্দ হইবে না।

৫। স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সহজ সরল কথা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে এই জনপদে প্রচার করার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

৬। গ্রামের ও জনপদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য আমাদের

প্রত্যেককে সংযমী, মিতভাষী, পরচর্চ্চা-বিমুখ, সত্যবাদী, পরোপকারী ও জীবন যাত্রায় আড়ম্বর হীন হইতে হইবে।

৭। কার্পাসের চাষের পত্তনটী ধীরে ধীরে সুরু করিতে হইবে।

৮। বাড়ীর মেয়েরা যাহাতে থঞ্চেপোশ প্রভৃতি ছাই-রাই বুনিয়া বিদেশীয় বণিকের সাহায্য করার পরিবর্ত্তে কাটনা ও চরকা কাটিয়া আমাদের আট পহুরিয়া কাপড়ের সাহায্য করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। দেশী জিনিষ ব্যবহার করাই যে একটা গৌরবের বিষয় সেইটুকু ধারণা আমাদের নিজেদের ব্যবহার দ্বারা অন্যের মনে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে এবং এই রূপে ধীরে ধীরে গৃহ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

১০। District Board ও Local Board এ নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কোন্ পথ অবলম্বন করা আইনতঃ সঙ্গত তাহা অবগত হইবার জন্য Local Self Gort, নামক পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে।

১১। সকল সম্প্রদায়ের পূজাপার্ব্বণে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতির প্রয়োজন। কেননা নানা বিচিত্র কর্ম্ম সৌধ—সমাচ্ছন্ন মানবজীবন-নগরের এই গুলিই Municipal Park. এই খানে আসিয়াই মানুষ একটু আনন্দের হাওয়া পায়।

১২। যাহাতে আমাদের দেশে যথেষ্ট গোরক্ষা হয় তাহার বিরোধশূন্য সদুপায় বাহির করিতে হইবে।

বিবিধ

হিসাব নিকাশ।—তুমি কি হিসাবী? মদ্যপান করিয়া তোমার কি কি ক্ষতি হয়, একবার উহা হিসাব করিয়া দেখ না? উহাতে—

(১) তোমার অর্থ নাশ হয়।

(২) সময়ের অপব্যবহার হয়।

(৩) স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

(৪) কারবার নষ্ট হয়।

(৫) চরিত্র কলুষিত হয়।

(৬) বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে।

(৭) বিচার বুদ্ধির লোপ হয়।

(৮) তোমার অনুভূতি নষ্ট হয়।

(৯) মানসিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়।

(১০) জীবনী শক্তির নাশ হয়।

(১১) আত্মার শক্তি নষ্ট হয়।

হায়রে, এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া একটু ক্ষণস্থায়ী সুখের লালসায় মানুষ মদ্যপান করিয়া পশুত্ব লাভ করে !!

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কার্য্য ;—এই কলিকাতা সহরে সহস্র সহস্র লোক-চক্ষুর সমক্ষে এত বড় একটি ব্যাপার হইয়া গেল, দুঃখের বিষয় অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "কই কিছু ত দেখি নাই ;" বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্‌যোগে কলিকাতা ইউনিভারসিটী হলে ১২ই চৈত্র হইতে একটি প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়া প্রায় একপক্ষ উহা স্থায়ী হইয়াছে। রাশি রাশি জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বারা যে প্রকারে প্রদর্শনীকে সজ্জিত করা হইয়াছিল তাহা সমস্ত বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে প্রধানতঃ—খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়—এবং কি প্রকারে ম্যালেরিয়া ও নানা সংক্রামক রোগের বীজানু মানব দেহে প্রবেশ করিতেছে,—সামান্য সামান্য অসাবধানতা ও অজ্ঞতা হেতু বিষম ব্যাধির আক্রমণে পতিত হইতে হয়,—শিশুর মৃত্যু—যুবকদিগের চক্ষুরোগ ও স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ—বঙ্গীয় নারী জাতির অশেষ দুর্গতির বিষয়, তদ্ভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে জগতের সঙ্গে ভারতের কিরূপ অবস্থা প্রভৃতি নানা তথ্যগুলি চিত্র দ্বারা এমন সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝান কঠিন। যমুনা নদী সংস্কার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্ত হইয়াছে, কাষ্ঠ খণ্ডে খোদিত তাহার মানচিত্র এমন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট নহেন, আমরা মনে করি, "কই কিছুই ত হইতেছে না," আসল কথা, অনুসন্ধিৎসু—জ্ঞানস্পৃহা না থাকিলে চক্ষের সাম্নে জ্ঞান লাভের শত সহস্র উপকরণ থাকিলেও আমরা চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারি।

এই উপলক্ষ্যে বঙ্গেশ্বর তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন ;—

"এই ভবনের দেয়ালে আপনারা যে সকল দর্শনীয় চিত্র প্রভৃতি রাখিয়াছেন

ঐ সকল দেখিয়া আমি কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। হিতসাধন মণ্ডলী এই যে নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন এতদ্দ্বারা বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করি। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছেন তদ্দ্বারা লোক সাধারণ উপকৃত হইবেন কিন্তু ঐ সকল আবিষ্কার জন-মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিলে তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা যায় না। যদি কতিপয় বৈজ্ঞানিক মাত্র জানিতেন যে মাছি রোগ বহন করে, তাহাতে কি উপকার হইত? এইরূপ প্রদর্শনী উহা চিত্র দ্বারা লোকের দৃষ্টিগোচর করিয়া হিত সাধন করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে এইদেশে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী পথপ্রদর্শক হইলেন বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি বর্ত্তমান বৎসর তাঁহারা যে জয়মাল্য লাভ করিবেন, উহাতেই তৃপ্ত না হইয়া এই সার্থকতাকে চিরন্তন আকার দান করিবেন।

ধুমপানের অপকারিতা,—কলিকাতার ষ্টুডেণ্টস হলে ধুমপান নিবারণী সমিতির উদ্‌যোগে এক সভা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় ডাক্তার মেনকেল একটি উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন ধুমপান অত্যন্ত অপকারী—বিশেষতঃ যুবা বয়সে। এই অভ্যাস অতি কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর, অথচ ব্যয়সাধ্য। যদি কেহ বলেন যে, এত লোক ধূমপান করিয়া বেশ সুস্থ আছে। ধুমপানরূপ বিষে অভ্যস্থ হয় তবু উহাতে মৃদুভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যাহারা উহাতে বেশীমাত্রায় আসক্ত হয় তাহাদের অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যুবাদের ধুমপান বিল এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে. এই সময়ে ডাক্তার মেনকলের এই বক্তৃতায় বিশেষ সুফল প্রসব করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ধূমপান নিবারণী সভার মত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, ডাক্তার মেনকলের মত তাহাদের উক্তি সমর্থন করিবে। আমরা আশাকরি ঐ বিল আইনে পরিণত হইবে।

"সভা সমিতির ফল"— ৯ই চৈত্রের 'সময়ে" জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ

সম্বন্ধে সময় সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'স্থানে স্থানে আমাদের সহিত মত বিভিন্ন থাকিলেও এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম, তবে কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ তাহা এ দেশের আইন বিরুদ্ধ।" আমরাও ঐ কথা বলিয়া প্রবন্ধ মধ্যে যাহা সার ও শিক্ষণীয় কথা আছে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম।

প্রবন্ধের প্রধান কথা;—

১। "য়ুরোপীয়েরা একাধিপত্য ভাল বাসে না। তাহারা বহু লোক একত্র হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক সমস্ত গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহ করে। সেই জন্য তথায় সভা সমিতির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সেই সকল সমিতির মতানুযায়ী কার্য্য কিরূপে করিতে হয় তাহাও তাহারা উত্তমরূপেই জানে। সুতরাং তাহারা সমিতির দ্বারা সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে। আমাদের দেশের লোক স্ব-মত প্রেক্ষী অর্থাৎ একগুঁয়ে। তাই এখানে সভা সমিতি দ্বারা কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

২। ইংলাণ্ডে একজন রাজা আছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংলাণ্ড সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে শাসিত হয়। সুতরাং ইংরেজদিগের কোন মহাসমিতি হইতে যাহা কর্ত্তব্য ধার্য্য হয় তাহা বিধি বদ্ধ করিতে রাজমন্ত্রী ও শাসন কর্ত্তারা বাধ্য হন, নতুবা পদত্যাগ করেন। আমাদের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ কোন সম্বন্ধে নাই। প্রতি বৎসরই কন্‌গ্রেস হইতে অনেক গুলি প্রার্থনা গবর্ণমেণ্টে নিবেদিত হয়, তাহাতে কোন সুফল হয় না।

৩। এসিয়া খণ্ডে একাধিপত্য ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য হয় নাই এবং হইতে পারে না, তথাপি বৌদ্ধ ও মুসলমান সময়ে অল্পকাল স্থায়ী যোটবন্দি হইতে দেখা যায়। হিন্দুদের যোট একবারেই নাই। সুতরাং সভা সমিতি দ্বারা হিন্দুদের কোন উপকার হইতে পারে না। সাহিত্য সম্মিলনী, হরিসভা প্রভৃতি দ্বারা কোন উপকার না হইলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

৪। আমাদের দেশে দশ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। তৎসম্বন্ধীয় ডাকের বচন অনেক আছে। যথা—(১) 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' (২) 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'—ইত্যাদি।

ইহাতে আমরা এই বুঝিলাম,—

(১) যাহারা স্বাধীনতার সমাদর বুঝে না, তাহারা দশজনে একত্রে মিলিয়া কাজ করিতে পারে না।

(২) অনভ্যস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় এবং হিতকরী, কষ্ট সাধ্য হইলেও, তাহাকে অভ্যাস করিতে হইবে।

(৩) যাহা এক কালে ছিল না, তাহা কালক্রমে হইতে পারে না, ইহা সত্য নহে। ইত্যাদি—

মহাত্মা গান্ধির অনশন ব্রত;—গান্ধির অনশনব্রত গ্রহণের কথা জগতের সংবাদপত্র পাঠক পাঠিকা মাত্রেই অবগত আছেন। তবে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমজীবিদের প্লেগের জন্য প্রথমত শতকরা ৭০ বেতন বৃদ্ধি করা হয়, পরে উহা বন্ধ হয়। এজন্য তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে বুঝিয়া কলের মালিকেরা ২০ বৃদ্ধি দিতে চাহেন, তাহাতে তাহারা স্বীকার না হওয়ায় বিষয়টা সালিসের হাতে যায়, ঐ সালিসের মধ্যে গান্ধি ছিলেন; তাঁহারা স্থির করেন ৩৫ বাড়াইয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু মালিকেরা তাহা বেশী হইল মনে করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবিরাও প্রথমে তাহাতে স্বীকার হয় নাই, শেষ উহাতেই প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া শেষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে তাহারা যখন চেষ্টা করে, তখন গান্ধি বলিলেন "সহস্র সহস্র লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, উহা আমার নিকটে অসহ্য বলিয়া বোধ হইল; আমি তখন দণ্ডায়মান হইয়া ইহাই ঘোষণা করিলাম যে, ইহাদের বেতন যাবৎ শতকরা ৩৫ বাড়ান না হইবে তাবৎ আমি উপবাসী থাকিব। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও লোকের সত্য রক্ষা করা উচিত। ভারতভ্রমণ কালে আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তি যেমন অতি সহজে প্রতিজ্ঞা করে, তেমনি সহজে উহা ভঙ্গ করিয়া থাকে। আমি ইহাও জানি যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান বলিয়া কথিত হন, তাঁহারাও আত্মা ও পরমেশ্বরের শক্তি সত্তার প্রতি অতি ক্ষীণ বিশ্বাসী।

কুম্ভ মেলা;—২৯শে মাঘ (১১ই ফেবরুয়ারি) কুম্ভমেলার বিশেষ উৎসবের দিন ছিল। ১৫ লক্ষ লোক সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিত মদন মোহন মালবী মহাশয়ের সেবা-সমিতি প্রভৃতির এক হাজার সেচ্ছা সেবক পুলিসের সাহায্য এবং যাত্রির ক্লেশ নিবারণে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্নানার্থীদিগকে সাহায্য, লাইফবেল্ট ও নৌকা দ্বারা বহু লোকের জীবন রক্ষা

করিয়াছিলেন। সহস্র নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত নামের মধ্যে অধিকাংশের অনুসন্ধান করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইত্যাদী মহৎ কাজ গুলি করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া কি আমাদের প্রাণে বিন্দু মাত্রও হিতৈষণা জাগিবে না?

জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বক্তৃতা,—কুম্ভমেলা উপলক্ষে প্রয়াগে বহুসহস্র সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে নিখিল ভারত হিন্দু সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বাল্য বিবাহকে আদিম অসভ্যোচিত বর্ব্বরের প্রথা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের যে সকল লোক এখনও "অষ্টমবর্ষে গৌরীদান" করিবার জন্য শ্লোক আবৃত্তি করেন, তাঁহারা এই জগদ্‌গুরুর মন্তব্য মনে রাখিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন;—"ভারতবর্ষের মন্দির ও মঠ সমূহ প্রায় এখন সাধুদের দ্বারা উপদ্রবিত হইতেছে। ঐ সাধুদের চরিত্র অধিকাংশস্থলেই সন্দেহজনক। এই মন্দির ও মঠ সমূহের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় দ্বারা মন্দির ও মঠ সমূহের সহিত অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, বিদ্যার্থীরা বিনা ব্যয়ে খাইতে ও থাকিতে পারিবে। সমস্ত সাধুদিগের এই সকল বিদ্যালয়ে যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে।" এইরূপে সাধুদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশচর্য্যায় কিরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মী করা যাইতে পারে, জগদ্‌গুরু তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন। (সঞ্জীবনী)

পরিষদের চাঁদা বাকী;— ৮ই চৈত্রের "এডুকেশনগেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৷৷০ হাজার, কিন্তু অনেকেই চাঁদা দেন না, তবু নাম কাটীয়া দেওয়া হয় না। সকলকেই বিনা মূল্যে পরিষৎ পত্রিকা দেওয়া হয়। চাঁদার ২১ হাজার টাকা অনাদায়ী, তাহার মধ্যে ৯ হাজার তিন বৎসরের উপর বাকী; বক্রী ১২ হাজার টাকা যাঁহাদের নিকট বাকী, তাঁহাদের বলা হইয়াছিল যে টাকায় ।০ দিয়া মিটমাট করুন। তাহাতেও তাঁহারা টাকা দেন নাই। নূতন সমিতির চাঁদাধার্য্যকারীগণ বুঝিয়া শুনিয়া চাঁদার হার ধার্য্য করুন।

নারী-প্রসঙ্গ।—বৈধব্য। ভারতে মোট নারী সংখ্যা ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯১৯, তন্মধ্যে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৬২ জন বিধবা। অর্থাৎ ৬ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন বিধবা। শতকরা ১৭'৩ বিধবা।

শিশু ও বাল্যবিবাহের তালিকা,—

১৫ বছরের নীচে	৯০, ৭৭, ৬৭৭ জন	
১০ ,, ,,	২৫, ২২, ২০৩ ,,	
৫ ,, ,,	৩, ০২. ৪০৫ জনের বিবাহ হইয়াছে।	

বালবিধবার তালিকা,—

৫ বছরের নীচে	১৭, ৭০৩ জন	
১০ ,, ,,	১, ১১, ৯৭৩ ,,	
১৫ ,, ,,	৩, ৩৫, ০১৫ ,,	

১৯১১ সালের আদমসুমারি অনুসারে কলিকাতা নগরে ১২,৮৪৮ জন পতিতা নারী, বাস করিতেছিল। ১৯১৮ সালে সংখ্যা ১৬ হাজার হইয়াছে। এই নগরে ১০ বছরের নিম্ন বয়স্কা ১০৯৬টি বালিকা ঐ বৃত্তি শিক্ষা পাইতেছে। কলিকাতায় ২০ হইতে ৫০ বর্ষ বয়স্কা যত স্ত্রীলোক আছে, তাহার ১২ জনের মধ্যে ১ জন পতিতা।

পরলোকে-দণ্ডীবর পাল

(ক্ষুদ্র-জীবনী)

গতবারে খাঁটুরা নিবাসী দণ্ডীবর পালের সাংঘাতিক মৃত্যুর সংবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার ছিল স্থানাভাবে তাহা বলা হয় নাই। দণ্ডীবর পাল একজন কুশদহবাসী বিখ্যাত ব্যক্তি কিম্বা তিনি কুশদহ-সম্পাদকের আত্মীয়, এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু তিনি সামান্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহার চরিত্রে যে একটি অসামান্য ভাব ছিল—যাহা কুশদহ-বাসী ব্যবসায়ী শ্রেণী—অথবা সকলের পক্ষেই তাহা অনুশীলনীয়। আশা করি এই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না।

দণ্ডীবর শৈশবে মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে মাতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত এবং বর্দ্ধিত হন। তাঁহার পিতা প্রতাপচন্দ্র পাল মহাশয় পুনঃ দার

গ্রহণ করেন। দণ্ডীবরের মাতামহ স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র কুণ্ড মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্রের প্রতি আদেশ করিয়া যান যে, দণ্ডীবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহ দিয়া, একখানি বসোপযোগী গৃহ এবং ব্যবসায় কার্য্যের জন্য মূলধন স্বরূপ কিছু অর্থ (সম্ভবতঃ আড়াই হাজার টাকা) দিবে। তদনুসারে তিনি তাহা প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন মাতামহীর নিজস্ব অর্থ ও অলঙ্কারাদি হইতেও আর কিছু পাইয়া ছিলেন। ফলত তিনি যৌত্রবান একটি গৃহস্থরূপে গোবরডাঙ্গাবাসী হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে, তাৎকালীন গ্রামে এমন এক একটি মদ্যপের দল ছিল যে, স্বাধীন যুবক দণ্ডীবরকে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তাহাতে আকৃষ্ট করিতে বিলম্ব ঘটিল না। কুসঙ্গে যদেচ্ছাচারী হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে তাঁহার অর্থাদি নিঃশেষ হইয়া গেল। অবশেষ গৃহ পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল। তৎপরে খাঁটুরায় গিয়া পৈতৃক ভিটায় মৃন্ময়-গৃহবাসী হইয়া আজীবন দারিদ্রতা বরণ করিয়া লইলেন। কিন্তু নানা অবস্থায় স্বজাতি ধনীগণের অধীনে সদরে এবং মফস্বলের কারবারে কর্ম্ম-কর্ত্তারূপে কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বক অধিকাংশ সময় কার্য করিয়া ছিলেন,—এমন কি এক সময় বড়বাজারের চিনি-ব্যবসায়ী শ্রেণী, আগামী চিনি বায়না করিয়া বহু লক্ষ টাকা লোকশানের সম্ভাবনায় পড়েন। তখন সকলে যুক্তি করিয়া একটি মিলিত ফার্ম্মে (যৌত কোম্পানীরূপে) ঐ সমস্ত চিনি লইয়া একযোগে ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা প্রভূত লোকশানের দায় হইতে উদ্ধার লাভ করেন। সেই ফার্ম্মের প্রধান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন দণ্ডীবর! ফলত তাঁহার জীবনে এই বিশ্বস্ততা গুণটি এমন নিখুঁতভাবে বিকশিত হইয়াছিল যে, অনেকের মধ্যে সে গুণটি অতীব দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার কার্য্যে কেহ কখনও তঞ্চকতা দেখেন নাই—অথচ তিনি একজন ধর্ম্ম-সাধক বলিয়া খ্যাত ছিলেন না।

দণ্ডীবর প্রায় আজীবন দারিদ্রেই কাটাইয়াছেন, অথচ এক দিনের জন্যও পরধনে লোভ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। বাল্যকালে মাতামহ গৃহে কোন্ মহত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি অনেক সময় বলিতেন, "অনেক বড় মানুষ দেখ্‌লাম, কত হোলো, কত গ্যালো——" অর্থাৎ পরধনে তাঁহার লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান থাকাতেই তিনি ঐরূপ কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। এমন লোভশূন্যতা ধনীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেই ত দেখা যায় না, এ যে তাঁহাতে বিধাতার নিজস্ব দান!

হে কুশদহবাসী, দত্তীবরের জীবনে যে টুকু বিধাতার দান তাহা কি আপনারা গ্রহণ করিবেন না ?

তাঁহার বংশ-ধারা পুত্রাদি নাই ; আছে একটি মাত্র দুঃখিনী বিধবা কন্যা, কিন্তু কুশদহর বক্ষে তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহার একবিন্দু জীবন-স্মৃতি !

স্থানীয় বিষয় ও সংবাদ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কুশদহবাসীর সম্মিলনীসভা—"কুশদহ-সমিতি" "নববর্ষ-সম্মিলন" জন্য কলিকাতায় একটি সাধারণ অধিবেশনের আয়োজন করিতেছেন। অধিকন্তু—ইতি মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহ সভা, (এক্জিকিউটীভ কমিটী) সমিতির যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও এই সাধারণসভায় উপস্থিত করা হইবে। সমিতির গোড়াপত্তনের লক্ষণ ও কার্য্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। যদিও অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে, সমিতি কি কাজ করিবেন—এবং কবে তাহা আরম্ভ করিবেন ! তথাপি যে সকল নিয়মে সমিতি পরিচালিত হইবে তাহাকে দৃঢ়-মূল করিয়া লওয়া খুব উচিত কার্য্য হইতেছে। আমরা আশা করি, এই সমিতিতে কুশদহবাসী মাত্রেই যোগ দিয়া ইহাকে শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করিতে কেহই ঔদাসীন্য প্রকাশ—বা কালবিলম্ব করিবেন না।

কিছু দিন হইতে গোবরডাঙ্গার পার্শ্বস্থ গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি কোনও কোনও গ্রামে কলেরা পীড়া হইতেছে ; প্রায় প্রতিবৎসর এই সময় উহা হইতে দেখা যায়, তা ছাড়া সকল গ্রামে হয় না, কোন কোন গ্রামেই হয়। কিছু সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখা যায়। কিছু আরোগ্য হইয়াও উঠে। এই বিশেষত্বের কি কোনও কারণ অনুসন্ধানে দেশের বর্ত্তমান উন্নতিশীল ডাক্তারগণ প্রবৃত্ত হইতে পারেন না ?

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বনগ্রাম নিবাসী পরলোকগত ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারজেনারল রায় বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইনি অত্যন্ত শান্ত—চিন্তাশীল গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, প্রথমে কিছু দিন পোষ্টআপিষের

চাকরী করেন। কিন্তু তাহা তাঁহার ভাল না লাগায়, সাহিত্য সেবাই জীবনের কার্য্য বুঝিয়া সেই পথে আত্ম-নিয়োগ করেন। বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি অনেকগুলি সংবাদপত্রে নিয়মিত ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তদ্ভিন্ন টেলিগ্রাফিক সংবাদ সঙ্কলন করিয়া পাঠানো তাঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। তিনি বিচক্ষণ সুলেখক ছিলেন। বিপন্নের সাহায্যার্থে তিনি অনেক সময় লেখা লেখি দ্বারাও অনেকের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার লিখিত কিছু পুস্তকাদিও আছে। ফলত ইনি আমাদের দেশস্থ একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতে পারি। বর্ত্তমানে ইহার বয়স অনূন্ ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ইহার সহধর্ম্মিনী এবং এক পুত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র, নরেশচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় আছেন। উভয় ভ্রাতাই পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেটের পদে কার্য্য করিতেছেন। আমরা ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ এবং পরিবারস্থ সকলের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

বিশেষ সাহায্য প্রাপ্তি

(২৲ টাকার অধিক—ডোনেসান্)

এবার বিশেষ সাহায্য অল্প সংখ্যকই পাওয়া গিয়াছে, তথাপি এই সঙ্কট কালে যাঁহারা দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত সগায় নারায়ণ পাল (পটলডাঙ্গা)	...	১০৲
,, খগেন্দ্রনাথ পাল (বাগবাজার)	...	৫৲
,, পতিরাম চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, (গৈপুর)	...	৫৲
,, যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (খাঁটুরা দত্তবাটী)	...	৪৲
,, নীলাচল মুখোপাধ্যায় বি-এল, (বেড়গুম)	...	৪৲
,, শরৎচন্দ্র রক্ষিত (খাঁটুরা)	...	৪৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল, (চৌ-বেড়িয়া)	...	৩৲
,, অমরেন্দ্রচন্দ্র শীকদার (সামপুকুর ষ্ট্রীট)	...	৪৲
,, কানাইলাল সেন (বলরাম দে ষ্ট্রীট)	...	৩৲

যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা কলিকাতা ১২১ নং লোয়ার সারকুলার রোড, উইলকিন্স্ প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮৷১ সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।